যুক্তির নিরিখে

সুন্নাহর প্রামাণ্যতা

(মৌখিক বর্ণনার দার্শনিক ও নৃতাত্ত্বিক নির্ভরযোগ্যতা)

রিদা যাইদান

অনুবাদ
আব্দুল্লাহ মজুমদার

অনুবাদ-সম্পাদনা
ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

দারুল কারার

بسم الله الرحمن الرحيم

موثوقية السنّة عقلاً

حجية النقل الشفوي فلسفيا وأنثروبولوجيا

যুক্তির নিরিখে সুন্নাহর প্রামাণ্যতা

[মৌখিক বর্ণনার দার্শনিক ও নৃতাত্ত্বিক নির্ভরযোগ্যতা]

বই	[illegible]
মূল	রিদা যাইদান
অনুবাদ	আব্দুল্লাহ মজুমদার
অনুবাদ-সম্পাদনা	ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রকাশনায়	দারুল কারার পাবলিকেশন্স ও কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ (CWI)

যুক্তির নিরিখে সুন্নাহর প্রামাণ্যতা

[মৌখিক বর্ণনার দার্শনিক ও নৃতাত্ত্বিক নির্ভরযোগ্যতা]

মূল

রিদা যাইদান

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ মজুমদার

অনুবাদ-সম্পাদনা

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

দারুল কারার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

যুক্তির নিরিখে সুন্নাহর প্রামাণ্যতা

[মৌখিক বর্ণনার দার্শনিক ও নৃতাত্ত্বিক নির্ভরযোগ্যতা]

মূল: রিদা যাইদান

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মজুমদার

অনুবাদ-সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩
প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ মুন্না

প্রকাশনায় :

দারুল কারার পাবলিকেশন্স

দোকান ১০-১২, মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা),
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: 01575 111170, 01720 935542
ইমেইল: darulqarar19@gmail.com

ISBN: 978-984-35-5309-6

অনলাইন পরিবেশনা :

rokomari.com | wafilife.com | ikhlasstore.com
tawheedpublicationsbd.com | mmshopbd.com | ihyaussunnah.com
Anaaba Books | Sunnah Bookshop | Darus Sunnah Shop
New Lekha Prokashani (India)

মূল্য | ২৬৫.০০ টাকা মাত্র

JUKTIR NIRIKHE SUNNAHOR PRAMANNOTA By Rida Jaidan, Translated by Abdullah Mojumdar, Published by Darul Qarar Publications, Shop-10-11, Madrasa Market, 2nd floor, Banglabazar, Dhaka-1100, Price : BDT 255, USD $ 10

লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক পরিচিতি

লেখক: রিদা যাইদান। মিশরের একজন তরুণ গবেষক ও লেখক। ইতিহাস, ভাষা, দর্শন, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় তার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। মিশরের স্থানীয় আলেমদের সান্নিধ্যে ইলম অর্জন করার পাশাপাশি মানবিক বিদ্যাসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পর তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মানবিক বিদ্যার তুলনামূলক পর্যালোচনায় পারঙ্গমতা অর্জন করেছেন। এমনই কিছু বিষয়ে কয়েকটি বই রচনা করে তিনি খ্যাতি কুড়িয়েছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু বই: আল-ইজমাউল ইনসানী, সুয়ালুল কদর, আযমাতুল ফালসাফাতিল আখলাকিয়্যাহ, নাহুয়া মানহাজ ওয়াসফী লিল-ইলম, মাউসুকিয়্যাতুস সুন্নাহ। এছাড়া ইংরেজী ভাষায় রচিত বেশ কিছু বই তিনি আরবীতে অনুবাদ করেছেন।

অনুবাদক: আব্দুল্লাহ মজুমদার, ১৯৯৮ সালে তার জন্ম। পিতা প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। ২০১৬ সালে টঙ্গীস্থ তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা থেকে আলিম (এইচএসসি সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে কলা অনুষদভুক্ত আরবী বিভাগে ভর্তি হন এবং অনার্স ও মাস্টার্সে উভয়টিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইতিমধ্যে তার অনূদিত ১৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

সম্পাদক: ১৯৬৯ সালে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন ধনুসাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী মাদ্‌রাসা-ই আলীয়া ঢাকা হতে ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তারপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স, মাস্টার্স, এম-ফিল ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি 'আল কুরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর' নামে কুরআনের বৃহৎ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, যা কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং প্রেস সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত বহু সংখ্যক বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া'র আইন ও শরী'আহ অনুষদভুক্ত আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

সম্পাদকের কথা

সকল হামদ মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমাদের জন্য তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী পাঠিয়ে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। সালাত ও সালাম সে মহান নবীর ওপর যাঁকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং যাঁর অনুসরণ করা ফরয করে দিয়েছেন আর যাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে উম্মতের জন্য হিকমত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

তারপর কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি 'যিক্‌র' নাযিল করেছেন, [সূরা আল-হিজর: ৯] আর সে 'যিক্‌র' এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ দীনকে কিয়ামত পর্যন্ত সুদীর্ঘ করেছেন, যার অনিবার্য দাবি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষিত থাকবে। কারণ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা সবই ওহী। তাই কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টিই ওহী, উভয়টিই যিক্‌র। এর প্রমাণ হচ্ছে, অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা আপনার কাছে যিক্‌র নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে যা নাযিল হয়েছে সেটা বর্ণনা করেন, আর যাতে তারা চিন্তা করে।' [সূরা আন-নাহল: ৪৪] এর মাধ্যমে এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অবশ্যই যিক্‌র এর অন্তর্ভুক্ত। আর যিক্‌র এর হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন; বিধায় যুগ যুগ ধরে তা সংরক্ষিত থাকবে। ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জানালেন যে, তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল বাণী ওহী। আর ওহীর ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, তা ওহী। আর যিক্‌র কুরআনের ভাষ্য দ্বারা সংরক্ষিত থাকা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এটা অবশ্যই বিশুদ্ধ যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় বাণী আল্লাহর সংরক্ষণের মাধ্যমে সংরক্ষিত। আমাদের জন্য এ গ্যারান্টি রয়েছে যে, তার কোনো কিছু হারিয়ে যাবে না।' [আল-ইহকাম (১/৯৮)]

তাছাড়া আমরা আরও দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সংরক্ষিত, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর

কাছে কিতাব ও হিকমত নাযিল করার কথা ঘোষণা করে তাঁর নবীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহর আপনার ওপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন, আর আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না, আর আল্লাহর দয়া তো আপনার ওপর অনেক বড়।' [সূরা আন-নিসা: ১১৩]

ইমাম শাফেয়ী ও একদল সালাফে সালেহীন বলেছেন, হিকমত হচ্ছে সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী, যাতে সবকিছু উন্মুক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হিকমত হচ্ছে সুন্নাত, যা রাসূলের পক্ষ থেকে কুরআনের জন্য বাস্তব প্রয়োগ। কুরআনের মূল কারণ, অর্থ অনুধাবন, উদ্দেশ্য আয়ত্বকরণের জন্য সুন্নাহ থেকে কুরআন কখনো অমুখাপেক্ষী হবে না।

সাহাবায়ে কিরাম সুন্নাহকে এভাবেই দেখেছেন। তারা কুরআনের মতই সুন্নাতকে অবশ্য পালনীয় বিষয় জ্ঞান করতেন। তারা কখনো আল্লাহর বাণী ও রাসূলের বাণীর মধ্যে পার্থক্য করতেন না। সাহাবায়ে কিরাম কুরআনকে যেভাবে মুখস্থ করতেন সেভাবে সুন্নাহকেও স্মৃতিতে ধারণ করতেন। সুন্নাহ সাব্যস্ত হওয়ার বিপরীতটি তারা কখনো করেছেন এমন নযীর কেউ দেখাতে পারবে না।

এভাবেই তা তাদের সুন্দর অনুসারী তাবেয়ীনে ইযামের কাছে সমভাবে সমাদৃত হতো। তারা কখনো হাদীস পেলে অন্য কারও বক্তব্যের অপেক্ষা করতেন না। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে কোনোভাবেই তারা পার্থক্য করতেন না। আকীদা-বিশ্বাস ও শরী'আহ উভয় ক্ষেত্রেই কুরআন ও সুন্নাহর ছিল অপ্রতিরোধ্য বিচরণ। এ ব্যাপারে আমি আমার 'হাদীসের প্রামাণিকতা' ও 'আকীদার চারটি মৌলিক পরিভাষা'র সুন্নাহ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

প্রথম শতাব্দীর পরে দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিভিন্ন ফের্কা যখন ইসলামের পবিত্র আঙ্গিনায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তখন ফিতনাবাজ ফির্কাসমূহের নেতাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুন্নাহকে যদি যথাযথ মর্যাদার ওপর রাখা হয় তাহলে তারা তাদের সেসব বস্তাপঁচা চিন্তা ও ফের্কাবাজী মানুষদেরকে গলাধকরণ করাতে সক্ষম হবে না। তখনি তাদের মধ্যে কুরআন মানি কিন্তু সুন্নাহ মানতে বাধ্য নই এমন প্রবণতার ক্ষীণ উদ্ভব আমরা লক্ষ্য করি। সাহাবায়ে কিরামের

মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন তারা এ লক্ষণের বিপরীতে পর্বতের ন্যায় দাঁড়িয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের অনুসারীরা কঠিনভাবে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাদের ভ্রষ্টতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সে প্রবণতা বেশি দূর এগুতো পারেনি।

কিন্তু মুসলিমদের বর্তমান দুর্বল অবস্থানের সুযোগ নিয়ে প্রাচ্যবিদ ও তাদের পদলেহী, অনুরূপভাবে পাশ্চাত্যের নীতির পূজাকারী ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে সেই সর্বনাশা বক্তব্য আবার জাগরুক হয়ে যায়। তারা আবার সুন্নাহর চারপাশে সন্দেহের ধুম্রজাল সৃষ্টিতে লেগে যায়। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে, মুসলিমরা যতক্ষণ কুরআন ও সুন্নাহকে যথাযথভাবে আকঁড়ে থাকবে ততক্ষণ তাদের মধ্যে ফিতনা প্রবিষ্ট করে তাদেরকে দীন থেকে দূরে সরানো সহজ হবে না। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহর বাণীটি তাদের জন্য গলার কাঁটা হয়ে গিয়েছে, যাতে তিনি বলেছিলেন, সুন্নাহ হচ্ছে নূহের কিস্তি, যে তাতে আরোহণ করবে সে নাজাত পাবে আর যে তাতে আরোহণ করবে না, সে ডুবে মরবে। অনুরূপ ইমাম শাফেয়ীর বচনটি তাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে ওহী হিসেবে আকীদা ও শরী'আহর জন্য প্রামাণ্য হওয়ার বিষয়টি যথাযথভাবে পূর্ববর্তী মনিষীদের কাছ থেকে এসেছে বলে ঘোষণা করেছেন।

তাই সেসব দেশের ইসলামের শত্রুরা ইসলামের অথেনটিক এ উৎসকে মিথ্যাচার ও অপবাদ আরোপের মাধ্যমে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চালাতে সামান্যতম ত্রুটি করছে না। দুর্ভাগ্যবশত তাদের সেসব বক্তব্যকে হুবহু বা তাদের মতো করে বা আরও বেশি করে রঙ-বেরঙের চটকদার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য তারা অনেক মুসলিম সন্তানদেরকে তাদের কাতারে ভেড়াতে সক্ষম হয়। তাই দেখা যাচ্ছে, তারা হাদীসের প্রথম শতাব্দীর মুখস্থ যুগকে বিতর্কিত করতে চায়, তারা অপবাদ দিয়ে বলতে চায় মুখস্থ যুগের হাদীস সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়। অথচ সেসব সময়ে মানুষের ধী-শক্তি ছিল অসাধারণ। তারা হাজার হাজার ও লাখ লাখ বচন, প্রবচন, কবিতা, গদ্য ও পদ্য বড় কোনো কষ্ট ছাড়াই মুখস্থ রাখতেন। মুখস্থ বিদ্যার মতো বড় সংরক্ষণ পদ্ধতিকে এসব ফিতনাবাজরা বিতর্কিত করার অপপ্রয়াস চালাতে কোনোরূপ কমতি করছে না।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত সুন্দর করে তাদের বক্তব্য দিয়েই মুখস্থ বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রামাণিকতাকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

আমার প্রিয় ছেলে আবদুল্লাহ মজুমদার গ্রন্থটির যথাযথ অনুবাদ করেছে। তার আগ্রহের কারণে আমি গ্রন্থটিকে সম্পাদনা করি।

গ্রন্থটি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এর মাধ্যমে হাদীসের মধ্যে যেসব আনাড়ি লোক তাদের নাপাক হাত প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে তাদেরকে ধরাশায়ী করা সম্ভব হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে।

আল্লাহর কাছে দো'আ করছি, তিনি যেন এ গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক আমার সন্তানকে ও আমাকে দীনের জন্য কবুল করেন। আর যারা এ গ্রন্থটিকে প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে তাদেরকেও যথাযথ পুরস্কৃত করেন। আমীন, সুম্মা আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
উত্তর আউচপাড়া, গাজীপুর, ২০/১১/২০২৩, রাত ১.৩০।

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। পর সমাচার,

বর্তমান যুগে এসে ইসলামকে যে সকল সংকটের মোকাবেলা করতে হচ্ছে, তার মাঝে অন্যতম একটি হলো সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকার। এই অস্বীকৃতি নানাভাবে হতে পারে। নবীজী থেকে প্রাপ্ত একক বর্ণনাকে নাকচ করা অথবা সেটাকে প্রাগৈতিহাসিক বলে গণ্য করা কিংবা নিজের বিবেক-বুদ্ধি, আধুনিক মূল্যবোধ প্রভৃতির সাথে সংঘর্ষে এনে নাকচ করে দেওয়া। প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করে প্রাচ্যবিদ নামে যারা খ্যাতি কুড়িয়েছে, তাদের মাঝে গোল্ডযিহার, শাখত, মাইকেল কুক, ইয়াম্বুল কিংবা ওয়ায়েল হাল্লাক সবাই কম-বেশি প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সুন্নাহকে দেখেছে, যেখানে সবার জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান কাছাকাছি ছিল। উপনিবেশ পরবর্তী এই বিশ্বে শক্তির পারদ পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে বহু মানুষ নির্দ্বিধায় তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানকে গ্রহণ করেছে। আর এটা শিক্ষিত সমাজের পর্যায়ে সীমিত না থেকে জনসাধারণের মাঝেও প্রবেশ করেছে। তাই আমরা দেখতে পাই বর্তমানে সাধারণ মানুষও অনেক সময় সুন্নাহর বিষয়ে সংশয় করছে। প্রসিদ্ধ অনেক আলোচক ও চিন্তকের কথায় প্রভাবিত হয়ে সুন্নাহর ব্যাপারে অনেক মানুষের অবস্থান বদলে যাচ্ছে।

বইটির লেখক রিদা যাইদান সুন্নাহর সমালোচকদের গবেষণাগুলো নিবিড়ভাবে পাঠ করেছেন। কিন্তু সাধারণত যেভাবে তাদের খণ্ডন করা হয়, সেভাবে অগ্রসর হননি। তিনি সরাসরি প্রাচ্যবাদী চিন্তাপদ্ধতির গোড়ায় আঘাত করেছেন। তাই প্রথমে তিনি প্রাচ্যবিদদের চোখে সুন্নাহ কেমন তা চিত্রিত করেছেন। তারপর অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যায় প্রভাবিত কালামবিদদের দৃষ্টিতে চিন্তার পদ্ধতি অনুযায়ী সুন্নাহর প্রকৃতি তুলে ধরেছেন। যুক্তিবিদ্যা কিছু আদর্শবাদী তথা ভাববাদী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মূলনীতিগুলোর দুর্বলতা বিশ্লেষণ করার পর লেখক আধুনিক দর্শনের দুই দিকপাল হাইডেগার এবং ভিটগেনস্টাইনের দর্শনকে বেছে নিয়েছেন। তার এই বাছাইয়ের কারণ তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান ভিন্ন। তারা জ্ঞানের 'বর্ণনামূলক পদ্ধতি'র প্রচারক, যেটা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। আধুনিক দর্শনে জ্ঞানকে যে আদর্শবাদী তথা ভাববাদী দৃষ্টিতে দেখা হয়, সেটা থেকে বেরিয়ে এসে

তিনি জ্ঞানকে 'সামাজিক এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত' বলে প্রমাণ করেছেন। যে ভিটগেনস্টাইন দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব থেকে বেরিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের সংজ্ঞায়ন করেছেন 'বিশেষ ভাষা'র ভিত স্থাপন করেছেন, জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে তার চিন্তাকে লেখক গ্রহণ করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, লেখকের জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান পশ্চিমাদের প্রচলিত জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান থেকে ভিন্ন হওয়ায় তিনি এর নাম দিয়েছেন 'অ-জ্ঞানতাত্ত্বিক'। এছাড়াও লেখক তার বইয়ের বড় অংশ জুড়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী থমাস কুনের চিন্তার সহায়তায় বিজ্ঞানের ব্যাপারে প্রচলিত কিছু প্রতিষ্ঠিত ধারণারও খণ্ডন করেছেন। এর মাধ্যমে তার লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানকে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে যে অবস্থান থেকে দেখা হয়, ইতিহাসকেও সে অবস্থান থেকে দেখানো।

আমরা জানি যে প্রথম হিজরী শত থেকে সাহাবী-তাবেয়ীদের মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে সুন্নাহ সংরক্ষিত হয়েছে। মৌখিক বর্ণনার প্রামাণ্যতা নিয়ে বইয়ে একটি অধ্যায় জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ হয়েছে। সমাজের প্রচলিত চিন্তা হলো, মৌখিক বর্ণনা সুন্নাহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ,দুর্বল পদ্ধতি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (Natural Science) মত নির্ভরযোগ্যতা নেই এমনটাই অধিকাংশের ভাবনা। লেখক মৌখিক বর্ণনার দার্শনিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রমাণ করেছেন, আর সেটা এমন কিছু পশ্চিমা গবেষণার সহায়তায় যেগুলো প্রাচ্যবিদদের স্থাপিত সংশয় এবং তাদের চিন্তার গণ্ডির সমালোচনা করে। বইটির বিশেষত্ব হল এটি হাদীস শাস্ত্রকে ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য শাস্ত্র বলে প্রতিষ্ঠা করেছে। তারপর পশ্চিমাদের গবেষণার আলোকে প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমান্বয়ে খণ্ডন করেছে।

ইতিহাস শাস্ত্রের ভিত স্থাপনের জন্য লেখক প্রথম অধ্যায়ে পশ্চিমাদের চোখে ইতিহাস শাস্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করে রেনেসাঁর যুগে কীভাবে ইতিহাস শাস্ত্রে দার্শনিক সংকট এসেছে তা তুলে ধরেছেন। কেন পশ্চিমারা তাদের ঐতিহ্যকে ত্যাগ করতে শুরু করল এবং জ্ঞানের নতুন মাপকাঠি স্থাপন করল তার বিবরণ দিয়েছেন। ইতিহাস শাস্ত্রকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে 'জ্ঞান' হওয়ার দিক থেকে নিচের স্তরে দেখার সমালোচনা প্রমাণসহ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বর্ণনার ব্যাপারে যুক্তিবিদ্যায় প্রভাবিত উসূলবিদদের উত্থাপিত সংশয়গুলো উপস্থাপন করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়টা সবচেয়ে চমকপ্রদ ও গভীর। আমজনতা কোনো কিছুকে 'সুন্নাহ' জানার পরই সেটা মেনে নিতে কী কী দার্শনিক ও যুক্তিবিদ্যার প্রতিবন্ধক পায়, সেগুলোর বিশদ খণ্ডন তিনি করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে

বিশুদ্ধ হাদীসকে নির্ভরযোগ্য মনে করে তার সামনে সমর্পণ জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে যথার্থ। এমন কাজে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ধরনের সমস্যা নেই। চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক প্রাচ্যবিদদের তৈরি করা কাঠামোর ভিতকে প্রশ্নবিদ্ধ বলেছেন। প্রাচ্যবিদরা মনে করে শাফেয়ীর আগে নবীজীর সুন্নাহ বলে কোনো কিছু ছিল না। তাদের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় শতকের আগে হাদীসগুলো সমালোচনার পর গ্রহণ করার নীতি ছিল না। লেখক তাদের এই প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দুর্বলতা তুলে ধরার পাশাপাশি এটাও ব্যক্ত করেছেন যে একজন গবেষক অমুসলিম হলেও যদি ইনসাফগার হন, তাহলে প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য তিনি গ্রহণ করবেন না। কেননা ইসলামপূর্ব যুগে ও ইসলামী যুগে জ্ঞান ও লিখনীর সংজ্ঞা কী ছিল, সেটা একজন নিরপেক্ষ গবেষক পাঠ করলে তার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়বে যে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান যেমন ভিন্ন, তেমন লিখনী ছাড়াও মৌখিক বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত।

বস্তুত এই বইটি হাদীস অস্বীকারকারীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পাশাপাশি মৌখিক বর্ণনার নৃতাত্ত্বিক ও দার্শনিক গ্রহণযোগ্যতাকে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরিভাষাগত নানান বিষয় থাকার কারণে অনুবাদটা জটিল ছিল, তবে আল্লাহর রহমতে সমাপ্ত করতে পেরেছি। অনুবাদের পর শ্রদ্ধেয় পিতা ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়ার সাথে বসে পুরো বইটা তার সামনে পড়ে শরয়ী দিকগুলো সম্পাদনা করিয়েছি, তাই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। সাথে কৃতজ্ঞতা আমার বড় ভাইয়ের প্রতি, যিনি অনূদিত বইয়ে পরিভাষাগত দিকগুলো দেখে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনে সংশোধনী এনে দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই দারুল কারার প্রকাশনীর আল-আমিন ভাইকে, যিনি বইটি ছাপানোর ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন বইটি কবুল করে নেন। সুন্নাহর ব্যাপারে যারা সংশয় উত্থাপন করে, তাদের খণ্ডনে বইটি যেন কার্যকর ভূমিকা রাখে সে জন্য আল্লাহর তৌফিক কামনা করছি।

আল্লাহর করুণার ভিখারী

আব্দুল্লাহ মজুমদার

১৯ রবিউস সানী, ১৪৪৫ হিজরী

সূচি

লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক পরিচিতি ৫

সম্পাদকের কথা ৬

অনুবাদকের কথা ১০

ভূমিকা ১৫

প্রথম অধ্যায় ১৭

১. রেনেসাঁর যুগের আগে পশ্চিমে ইতিহাসশাস্ত্র ১৭

ক. প্রাচীন গ্রীকদের কাছে মৌখিক বর্ণনা: ১৮

খ. সমালোচনার সূচনা: ২০

গ. ইতিহাসের খ্রিষ্টীয় দর্শন ২২

২. রেনেসাঁ ও লিখনীর সমালোচনার যুগে ইতিহাসশাস্ত্র ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৭

তৃতীয় অধ্যায় ৭৩

১. বুদ্ধিভিত্তিক আদর্শবাদ কি সম্ভব? ৭৪

২. আদর্শবাদ ও আপেক্ষিকতার মাঝে জ্ঞান ৯১

৩. ইতিহাসের নিরপেক্ষতা ৯৭

চতুর্থ অধ্যায় ১১২

১. ইসলামের আগে ও পরে ইমাম শাফেয়ীর সময়কাল পর্যন্ত সুন্নাহর সংজ্ঞা: ১১৫

খ. প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টি থেকে সুন্নাহর প্রদত্ত সংজ্ঞার খণ্ডন ১২২

(১) আরবদের চোখে সুন্নাহ ব্যক্তিগত, সামাজিক নয় ১২২

(২) মালেক ও পূর্ববর্তীদের অনুকরণের অগ্রাধিকার, অতঃপর শাফেয়ী ও মৌখিক ইতিহাসের অগ্রাধিকার: ১৪৪
(৩) শাফেয়ীর সাথে তার প্রতিপক্ষের মতবিরোধের বিষয় কি সুন্নাহর প্রামাণ্যতা ছিল? ১৪৯
২. ইসলামপূর্ব যুগ থেকে প্রথম শতক পর্যন্ত লিখনীর ধারণা: ১৫২
(১) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত মারফূ' আছারসমূহ ১৫৪
যে সকল আছার দিয়ে লেখার নিষেধাজ্ঞার পক্ষে দলীল প্রদান করা হয়: ১৫৪
যে সকল বর্ণনা দিয়ে বৈধতার পক্ষে দলীল প্রদান করা হয়: ১৫৬
(২) মাওকূফ ও মাক্তূ' কিছু বর্ণনা ১৫৭
প্রথমত: লিখনী নিষিদ্ধ করে এমন বর্ণনাসমূহ ১৫৭
দ্বিতীয়ত: লিখনীর ব্যাপারে ছাড় দেয় এমন বর্ণনাসমূহ ১৫৯
৩. জ্ঞানের সংজ্ঞা ১৭১
আমাদের বইসমূহ ১৮২

ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনালগ্নে হাদীসশাস্ত্র ও মুহাদ্দিসদের সাথে পরিচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সুন্নাহর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আমি বলতে গেলে তেমন কিছুই জানতাম না। যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে কোনো বক্তব্য সম্পৃক্ত করা হতো তখন আমার কাছে বিষয়টি বেশ দুর্বোধ্য ঠেকত। তারপর আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিলেন, আমি ইলমুল হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা পড়লাম। ভূমিকাটা পড়ার পেছনে আমি মোটামুটি লম্বা সময় দিলাম। সাথে আলেমদের লেকচার শুনলাম, তাদের প্রশ্নোত্তর পড়লাম। হাদীসশাস্ত্রের একটি প্রারম্ভিক তাখরীজের কাজ করার পর বুঝতে পারলাম যে, এর স্পষ্ট একটি কর্মপদ্ধতি আছে। এই শতাব্দীতে এসে সুন্নাহর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো আমি পর্যবেক্ষণ করলাম। সহীহ বুখারী ও মুসলিমকে খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়ার পর বুঝলাম যে, এই শাস্ত্রের ঘাড়ে আমার ঋণ আছে। ঋণটা হলো হাদীসশাস্ত্র যাচাইয়ের পদ্ধতির পক্ষে কিছু কথা লেখা। বিশেষ করে আমি যেহেতু এ ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের বইগুলো পড়েছি। হ্যাঁ, আমার আগে অনেক আলেম সুন্নাহর পক্ষে লড়েছেন। সুন্নাহর ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টিকারী লোকদের জবাবে অনেক চমৎকার বই তারা লিখেছেন। কিন্তু পাঠকদের কাছে আমি যে বই উপস্থাপন করতে যাচ্ছি সেটার বৈশিষ্ট্য হলো এটা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীস শাস্ত্রকে একটা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে। তারপর পশ্চিমা নানা গবেষণার সহায়তা নিয়ে প্রাচ্যবিদদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের খণ্ডন করছে। প্রাচ্যবাদের জবাবে আমি যে সকল গবেষণার উপর নির্ভর করেছি, সেগুলো হয় পশ্চিমাদের লেখা, নতুবা প্রাচ্যের লেখক হলেও সুন্নাহর ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের মতো ধ্যান-ধারণা রাখে এমন লোকের লেখা। সংক্ষেপে বলতে গেলে এ বইটি হাদীসশাস্ত্রকে নিরপেক্ষ একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করছে।

ইতিহাসশাস্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরব পশ্চিমাদের চোখে ইতিহাসশাস্ত্রের ইতিহাস। এর মাধ্যমে আমরা আলোকায়নের যুগে

ইতিহাসশাস্ত্রে সৃষ্ট দার্শনিক সমস্যাগুলো উদঘাটন করব। কেন এবং কীভাবে পশ্চিমারা তাদের ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করতে শুরু করল? কীভাবে তারা ক্রমান্বয়ে 'জ্ঞানের' মাপকাঠি নির্ণয় করল? ইতিহাসশাস্ত্র কি অন্যান্য 'জ্ঞান' থেকে মর্যাদার দিক থেকে নীচে? দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা উপস্থাপন করব ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো কালামবিদরা কীভাবে দেখেছে? তাদের আলোচনা থেকে আমরা আসলেই বেশ কিছু সংশয়মূলক বিষয় পেয়ে যাব। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হলে আমরা দেখতে পাব যে, হাদীসশাস্ত্রের প্রক্রিয়ার সামনে কিছু দার্শনিক সংশয় ও বাধা উপস্থিত।

বইটির প্রথম বৈশিষ্ট্য এর তৃতীয় অধ্যায়ে নিহিত। আম জনতা যখন শুনতে পায় 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এটা' অথবা 'বুখারী এটা বর্ণনা করেছেন' তখন তারা সেগুলো বিশ্বাস করার পথে যে সকল দার্শনিক বাধা-বিপত্তি ও সংশয় আছে সেগুলোর খণ্ডন করছে তৃতীয় অধ্যায়। সুন্নাহর নির্ভরযোগ্যতা, বিশেষত সহীহ বুখারী ও মুসলিমের নির্ভরযোগ্যতা মেনে নেওয়ার বিষয়টি যে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে সঠিক এবং এতে দার্শনিক কোনো সংকট নেই, তা প্রমাণ করা এখানে লক্ষ্য। সহীহ সনদ গ্রহণ করা জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে বৈধ বিষয়। এমনকি যদি হাদীসের মতনের নক্বদ তথা সমালোচনা নাও করা হয়।

বইয়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় চতুর্থ অধ্যায়ে। এখানে প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞানগত সমস্যাগুলোর সমালোচনা ও খণ্ডন করা হয়েছে। প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ইমাম শাফেয়ীর আগে সুন্নাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। প্রথম শতাব্দীতে হাদীস লেখা হয়েছে এমন বিষয়টা নাকচ করে। সাধারণত দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষভাগ এবং তৃতীয় শতকে হাদীস যাচাই-বাছাই করার বিষয়টি স্বীকার করে। কিন্তু এর আগে হাদীসের ক্ষেত্রে শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের প্রচেষ্টাকে নাকচ করে দেয়। আমরা এই অধ্যায়ে এমন কিছু পেশ করব যেটা নৃতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করবে যে, প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সেটা অবাস্তব নয়। অমুসলিম একজন গবেষকের জন্য জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে প্রাচ্যবিদদের ঐ সকল বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

-রিদা যাইদান

প্রথম অধ্যায়

হাদীসশাস্ত্রের সমালোচনায় পশ্চিমাদের ভূমিকাকে ‘কর্তৃত্ব’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। পশ্চিমারা বিশ্বের ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি রাখে, সেটাকে তারা ভিন্ন একটা দৃষ্টিভঙ্গির উপর চাপিয়ে দিতে চায়। এক্ষেত্রে তারা ‘জ্ঞান’ ও ‘সত্যবাদিতা’র অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করে।

-জোনাথন ব্রাউন (আমেরিকান গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ)

১. রেনেসাঁর যুগের আগে পশ্চিমে ইতিহাসশাস্ত্র

প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আছে। হোক সে ইতিহাস লিখিত, অঙ্কিত বা মৌখিক।[১] মানবজাতির যেকোনো গোষ্ঠীর কাছে ‘ইতিহাস’ এমন একটি ধারণা যা তার আত্মপরিচয় অনুধাবনে ভূমিকা রাখে।[২] কারণ প্রতিটি প্রাচীন জাতির পূর্বসুরী, বংশ ও পবিত্র বিষয়াবলি আছে। এই তিনটি বিষয় কল্পকথা আকারে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মৌখিকভাবে ছড়িয়ে যায়। এভাবে নতুন প্রজন্ম প্রথম প্রজন্মের মতো জীবনধারণ করতে সমর্থ হয়।[৩]

১. ‘প্রত্নতত্ত্ব নামক জ্ঞানের বিকাশ লাভের পর জ্ঞানের উৎসে যে বৈচিত্র্য এসেছে, এমন পরিস্থিতিতে ‘প্রাগৈতিহাসিক’ পরিভাষা ব্যবহার করা ভুল। আমাদের বরং ব্যবহার করা উচিত ‘লিখিত ইতিহাসের পূর্বকাল’। কারণ ‘প্রাগৈতিহাসিক’ কথাটা আমাদের কাছে মানুষের ইতিহাসের এমন একটা সময়ের বিবরণ দেয়, যে সময়কালের অজানা বিষয়ের পর্দা সরিয়ে দিয়েছে প্রত্নতত্ত্ব; আমরা অন্যান্য উৎস থেকে যেটা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হইনি।’
কাসেম আব্দুহ কাসেম, তাত্বাউরু মানহাজিল বাহস ফিদ্দিরাসাতিত তারিখিয়্যাহ, আইন লিদ্দিরাসাতি ওয়াল-বুহুসিল ইন্সানিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি. পৃ. ৩২।

২. কাসেম আব্দুহ কাসেম, তাত্বাউরু মানহাজিল বাহস ফিদ্দিরাসাতিত তারিখিয়্যাহ, আইন লিদ্দিরাসাতি ওয়াল-বুহুসিল ইন্সানিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি. পৃ. ১১৪।

৩. ইমাম ত্বাবারী তার তাফসীরে (২২/৭৮) আল্লাহর বাণী উদ্ধৃত করেন,

প্রাচীন যুদ্ধ বা সমাজব্যবস্থার ইতিহাস নিছক এমন বর্ণনার মাঝে সীমিত ছিল না, যেখানে বাস্তবতার বিবরণ তুলে ধরা হতো, বরং এতে মিশ্রিত ছিল মানুষের (সাধারণত পৌত্তলিক ধারণা) উৎপত্তি, পরিণতি, স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক এবং নৈতিক ধারণাসমূহ। আর এ সবকিছু শৈল্পিক পন্থায় উপস্থাপন করা হতো, যেন তা অন্যদের প্রভাবিত করে।

ক. প্রাচীন গ্রীকদের কাছে মৌখিক বর্ণনা:

গ্রীকদের চোখে হোমারের 'ইলিয়াড' এবং 'ওডেসা' খ্রিষ্টের জন্মের এক হাজার পূর্বের ইতিহাসের সূত্র। এই দুটি মহাকাব্য বীর এবং জমিদারির যুগে গ্রীক সমাজের চিত্র তুলে ধরে। সে সময় গ্রীকদের রাজারা দাবি করত, তারা স্রষ্টার বংশধর। শাসনকার্য পরিচালনা করার সময় এটা বিশ্বাস রাখত যে, তাদের ক্ষমতা মূলত পবিত্র অধিকার, যে ক্ষমতা ও শৌর্যবীর্যের বলে তারা গ্রীক জাতির অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠ।[৪] কিন্তু হোমারের মূল ভূমিকা ছিল বীরদের গৌরবগাঁথা তুলে ধরে তাদেরকে অমর করে রাখা। 'প্রথম যুগে ইতিহাস রচনা ছিল মূলত আত্মজীবনী ও যুদ্ধের বিবরণী।'[৫]

হোমার যদিও ইতিহাস বর্ণনা করছিলেন, তবুও তিনি মূলত কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা বাছাই করে সেগুলোকে নির্দিষ্ট শৈল্পিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤]

"তারা বলে, দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা শুধু ধারণাই করে।" [সূরা আল-জাছিয়া: ২৪]

তারপর বলেন, 'তারা বলেছে আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। এর অর্থ আমরা মরি, আমাদের বংশধররা বাঁচে। তাদের মৃত্যুর পর বংশধরদের জীবনীকে তারা তাদের জীবনী বলে আখ্যা দিয়েছে। কারণ বংশধররা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বংশধরদের জীবন যেন তাদেরই জীবন।'

৪. কয়েকজন লেখক, ফালসাফাতুত তারীখ: জাদালুল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ওয়াল-আউদ আদ-দায়েম, ইবনুন্নাদীম ওয়া-দারুর রাওয়াফেদ, ২০১২, পৃ. ৬৬।

৫. মুহাম্মাদ সাকর খাফ্ফাজা, তারীখুল আদাবিল ইউনানী, মাকতাবাতুন্নাহদ্বাহ মিসর, ১৯৫৬, পৃ. ১৮।

করছিলেন। নিজের বর্ণনাভঙ্গিতে তিনি ঐশী, নৈতিক, সামাজিক—সকল উৎস মিশ্রিত করে ফেলেছিলেন। কোনো এক সামাজিক ঘটনা দেবতাদের ক্রুদ্ধ করে ফেলে, ফলে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। কবি হোমার এই ঘটনা উপস্থাপন করে নৈতিকতার উৎস তুলে ধরেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, 'প্রাচীন যুগের মানুষের ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা রূপকথাসুলভ বিবরণে ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন বর্ণনাভঙ্গি তৈরিতে তার কোনো স্পষ্ট ভূমিকা ছিল না। কারণ প্রাচীন যুগের মানুষের ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্যই ছিল এমন যে, তাতে মানুষের কর্ম ও অতি-প্রাকৃত শক্তির ইচ্ছার মাঝে মিশ্রণ থাকবে।' রূপকথা বলতে এখানে উদ্দেশ্য 'নিছক কল্পনা থেকে উদ্ভূত বিষয়সমূহ নয়। বরং বাস্তব নানা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে সেগুলোকে শৈল্পিক ঢঙে উপস্থাপন করা, যেন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক এমনসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় যেগুলোকে রূপকথার মাধ্যমে সমাজে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। কল্পকথার মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি পূর্ববর্তীদের এমন সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যেগুলো লিখিত ইতিহাসের বহুপূর্বের ঘটে যাওয়া ঘটনা।'[৬] বর্ণিত ঘটনাবলির ঐতিহাসিক উৎস আছে, কিন্তু এগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে কল্পনা ও বাড়াবাড়ির সংস্পর্শে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এসবে তথ্যের বিকৃতি ঘটে থাকে। গ্রীকসহ অন্যান্য প্রাচীন জাতির কাছে মৌখিক বর্ণনা ছিল বর্ণিত ঘটনাবলি ধারণ করার উপকরণ। 'এভাবে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়েছে, লেখার কোনো প্রয়োজন পড়েনি।'[৭] পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা দেখা যায় সেটা হলো, সে সময় এমন কিছু দক্ষ হাফেয ছিল যারা দীর্ঘ পদ্য মুখস্থ করত। 'যদিও আমাদের জন্য সেসব মৌখিক বর্ণনা বুঝতে পারা অনেকটাই কঠিন। কারণ আধুনিক যুগে এসে দীর্ঘ লম্বা কবিতা মুখস্থ করার সক্ষমতা মানুষজন প্রায় হারাতে বসেছে। **প্রাচীন যুগে অনেক মানুষের মাঝে এই সক্ষমতা এমনভাবে ছিল যেটার পক্ষে আমাদের কাছে অসংখ্য প্রমাণ না থাকলে বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে যেত।'**[৮] কিন্তু রূপকথার বর্ণনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়।

---

৬. কাসেম আব্দুহ কাসেম, তাত্বাউরু মানাহিজিল বাহস ফিদ্দিরাসাতিত তারিখিয়্যাহ, পৃ. ১০২।

৭. জর্জ সার্টন, তারীখুল ইলম: আল-ইলমুল কাদীম ফিল-আসরিয যাহাবী লিল-ইউনান, ১ম খণ্ড, অনুবাদ: আব্দুল হামীদ লুৎফী, পৃ. ২৮৮।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

কারণ এই বর্ণনাগুলো মূল্যবোধ ধারণ করে এবং মানুষকে কাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। আর সময়ের পরিক্রমায় ছোট-বড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বিশেষ করে সমাজের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের হাত ধরে।

খ. সমালোচনার সূচনা:

অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, ইতিহাসের সূচনা হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সে সময় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার এক অনবদ্য উত্থান পরিলক্ষিত হয়। আর সেটা ছিল পুরোপুরি ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত একটি প্রকল্প, যার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বজগৎ এবং মানুষের ব্যাখ্যা প্রদান। অর্থাৎ ইতিহাসবিদরা মনে করেন, প্রথমবারের মতো ইতিহাস রচিত হয় মানবীয় প্রয়োজন থেকে, ঐশী কোনো প্রভাবে নয়। আর এই ইতিহাসের রচয়িতা ছিলেন হেরোডোটাস। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়, হোক সেটা হেরোডোটাস বা সে সময়কার দর্শনের ব্যাপারে। 'কারণ হেরোডোটাসের ইতিহাসে 'ধর্মীয় আলোচনা' গভীরভাবে প্রবিষ্ট। হেরোডোটাস যদিও যুদ্ধসমূহকে মানবীয় কারণে ও প্রভাবে হয়েছে বলে থাকেন, তদুপরি তার বইয়ে ঐশী প্রত্যাদেশ, ভবিষ্যদ্বাণী এবং বিশ্বাসের ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়।'[৯] অর্থাৎ সে সময়ের দর্শনে 'ধর্ম'ও উপস্থিত।[১০]

কিন্তু তার অর্থ কি হোমার আর হেরোডোটাসের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই? কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, তারা দুজন একই সময়ের। তারা হেরোডোটাসকে প্রথম ইতিহাসবিদ হিসেবে অবস্থান দিতে চান না। কিন্তু বাস্তবে নতুন সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতির কারণে উভয়ের মাঝে পদ্ধতিগত পার্থক্য বিদ্যমান।[১১] আমরা দেখতে পাই হেরোডোটাস স্পষ্টভাবে বাস্তবতা ও কুসংস্কারের মাঝে পার্থক্য করেন (তার ইতিহাসে বহু কল্পকথা

৯. জেনিফার টি. রবার্টস, হিরোদোত: মুকাদ্দিমাতুন সাগীরাতুন জিদ্দান, মুআস্সাসাতু হিন্দাওয়ী, অনুবাদ: খালেদ গরীব আলী, পৃ. ১৪।

১০. আত-তাইয়্যিব বু ইযযাত, আল-ফালসাফাতুল ইউনানিয়্যা মা-ক্বাবলাস সুক্বাত্বিয়্যাহ, মারকাযু নামা লিল-বুহূস ওয়াদ্দিরাসাত, ২০১৩ খ্রি.।

১১. সেই পরিস্থিতি জানার জন্য দেখুন, M. Bentley (ed.), Companion to Historiography. Routledge, London and New York, ১৯৯৭, pp. ২২-২৫.

থাকা সত্ত্বেও)। তিনি শ্রুত ইতিহাস থেকে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেন। গ্রীক ও পারস্যের পারস্পরিক যুদ্ধে জড়ানোর কারণ ব্যাখ্যা করেন। সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রে কম হওয়ার পরও গ্রীকদের বিজয়ের কারণ তুলে ধরেন এবং এক্ষেত্রে তিনি মানবীয় বিভিন্ন যুক্তি-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করেন।[১২] আমরা হোমারের দুটি মহাকাব্য এবং হেরোডোটাসের ইতিহাসের মাঝে বর্ণনাভঙ্গির পার্থক্য দেখতে পাই। হেরোডোটাসের ইতিহাস জনগণের সামনে পাঠ করার জন্য রচিত হয়নি। তাই স্বভাবতই একজন উপস্থাপক তার বর্ণনার মাধ্যমে যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রোতাদেরকে আহ্বান করবেন, সেটার উপর তার বর্ণনাভঙ্গির প্রভাব পড়বে। কেননা 'পদ্য দেবতাদের ভাষা, গদ্য মানুষের ভাষা'[১৩]। হেরোডোটাসের ইতিহাসের মূল্য হলো সেটার মাধ্যমে 'গ্রীক ও বর্বরদের সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ কার্যাবলি অমরত্ব অর্জন করে'[১৪]। হেরোডোটাসের সময়ে এসে এমন মৌখিক বর্ণনার সমালোচনা করা সম্ভব যেটাকে হোমার কবিতার মাধ্যমে এক মহাকাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন আর কোনো এক ঘটনার ঐতিহাসিক বর্ণনা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সেক্ষেত্রে এই বর্ণনার চাইতে আরো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনার উপর নির্ভর করা হবে, যদিও তা ভিন্ন সমাজের হয়ে থাকে। কারণ হেরোডোটাস ছোটকাল থেকে একটা সংস্কৃতিকে ধারণ করে আছেন। ভ্রমণের মাধ্যমে তার সাংস্কৃতিক জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত করেছেন। তিনি মিশর, ব্যাবিলন, সিরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সরাসরি তথ্য আহরণের সুযোগ তিনি অর্জন করেন। হেরোডোটাস 'তথ্য সংকলনের ক্ষেত্রে এমন কিছু পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করেছিলেন যেখানে বর্ণনাকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কেন্দ্রীয় ও মুখ্য ভূমিকা ছিল।'[১৫] 'হেরোডোটাস এমন সব ঘটনা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন যেটা তার দুই প্রজন্ম আগে ঘটেছে।'[১৬] বস্তুত পশ্চিমা ইতিহাসের রূপকথা এবং ইতিহাসের মাঝে পার্থক্য করার প্রথম ধাপ এটাই। 'হোমারের

---

১২. জেনিফার টি. রবার্টস, হিরোদোত, পৃ. ১২।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

১৪. হেরোডোটাস, তারীখু হিরোদোত, আল-মাজমাউস সাকাফী- আবু যাবী, অনুবাদ: আব্দুল ইলাহ আল-মাল্লাহ, পৃ. ২৯।

১৫. ফাতহী লেসির, তারীখুয যামানুর রাহিন, দারু মুহাম্মাদ আলী-লিন্নাশর, সাফাকেস, ২০১২, পৃ. ১৪।

১৬. M. Bentley (ed.), 1997, p. 22.

রচনাবলি জ্ঞান-নির্ভর গবেষণা বলে গণ্য করা হয় না, বরং রূপকথা হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ সেখানে দেবতারা মানুষদের বিভিন্ন কাজে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করে, যেটা প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাসের নানান চিত্র থেকে ভিন্ন নয়। অনুরূপভাবে হেরোডোটাসের কাজেও রকমারি কুসংস্কারের দেখা মিলে খুব বাজেভাবে। এতদসত্ত্বেও গ্রীকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো, হেরোডোটাসের লিখনীর মাধ্যমে **ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।**'[১৭]

গ. ইতিহাসের খ্রিষ্টীয় দর্শন

ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের লিখনীর সাথে প্রাচীন পৌত্তলিকদের যেকোনো প্রকারের সংযোগ নাকচ করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থগুলো অনুযায়ী, মানুষ ও সৃষ্টির সূচনা হয়েছে স্রষ্টা থেকে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে স্রষ্টা বার্তাবাহকদের পাঠিয়েছেন এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তি দিয়েছেন। তবে প্রাচীন জাতিসমূহের মাঝে ইতিহাস সংক্রান্ত ধারণায় যে বিষয়টা পাওয়া যায় সেটা হলো ইতিহাসের মূল্যবোধ-নির্ভর নৈতিক ধারণা, হোক সেই জাতিগুলো তাওহীদের অনুসারী কিংবা পৌত্তলিক। ধর্মীয় ঘটনা সবসময় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হতো এবং সেগুলো মূল্যবোধে পূর্ণ ছিল, কেবল জানানোর লক্ষ্যে করা হতো না। (উদাহরণস্বরূপ) আল্লাহ যে আদম 'আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন, এটাকে নিছক ঘটনা বলে বিবেচনা করা যাবে না। বরং এর মাঝে মানুষের জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি চলে আসবে। তাই 'মধ্যযুগ ইতিহাস আর ধর্মতত্ত্বের মাঝে আলাদা করেনি। বরং এমন কিছুকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করেছে। যাতে করে চিন্তার ক্ষেত্রে এতটুকু পরিমাণ সংহতি থাকে, যা দিয়ে বিকৃত চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। ইতিহাসে এভাবেই গীর্জার পোপদের চিন্তাধারা প্রতিফলিত ছিল মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত, যে সময়কালকে নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসের যুগ।'[১৮] 'মধ্যযুগের অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ইতিহাস বর্ণনা করত নৈতিক অর্থ ও

---

১৭. আব্দুল ওয়াহেদ যিন্নুন ত্বাহা, উসূলুল বাহসিত তারীখী, দারু মাদারিল ইসলামী, ২০০৪, পৃ. ৬৯-৭০।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

আদর্শিক যুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে।'[১৯] স্বাভাবিকভাবেই খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ 'পুরাতন নিয়ম' ও 'নতুন নিয়ম' থেকে তার যাত্রা শুরু করে। সে সময় একজন ইতিহাসবিদের জন্য বাইবেল থেকে চয়ন করা এবং সেখানকার বিভিন্ন ঘটনার দিকে ইশারা-ইঙ্গিত করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। ইতিহাস রচনায় ক্ষেত্রে বাইবেলের ঘটনাবলি ও বর্ণনাভঙ্গির বড় প্রভাব ছিল। কিন্তু একজন খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ এমন গ্রীক সূত্রও পান যেখানে ইতিহাসের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাসের সমালোচনা এবং ইতিহাস রচনার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন জানতে পারেন। 'জ্ঞানের এই দুটি উৎস একটি অন্যটির সাথে মিশে যায়।'[২০]

উপর্যুক্ত আলোচনা দক্ষ ইতিহাস রচনাকে নাকচ করে না। ইতিহাসের ক্ষেত্রে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ এবং অলৌকিক ঘটনাবলিতে বিশ্বাস থাকলেও অতীতের ঘটনাবলি দক্ষতার সাথে বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক নেই (এর প্রমাণ হেরোডোটাস নিজে)। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম তখন নিছক ধর্ম ছিল না, বরং পরিণত হয়েছিল 'জীবনের একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে, যা কয়েক শতক ধরে পশ্চিমাদেরকে পরিচালনা করেছে। এটা একটা ধর্মীয় মেটাফিজিক্স থেকে বদলে গিয়ে এপিস্টেমোলজির রূপ নিয়েছে, যা ইউরোপে সমগ্র মধ্যযুগ প্রভাব ফেলেছে। অন্য সকল মানবিক বিদ্যা খ্রিষ্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থের বক্তব্য এবং যাজকদের বিভিন্ন ব্যাখ্যার অনুগামী থেকেছে। ফলে ইতিহাস রচনা ঐশী ব্যাখ্যার অনুবর্তী ছিল।'[২১] ইতিহাসের এই ঐশী প্রাতিষ্ঠানিক (ধর্মীয় ব্যাখ্যা নয় যেটা প্রাচীন জাতিসমূহও ধারণ করে) ব্যাখ্যা মধ্যযুগে ইতিহাস রচনার কাজকে কার্যত বাধাগ্রস্ত করেছে। কেননা 'ইতিহাসের ঐশী অর্থ ধারণের ফলে সেকুলার ধারণাসমূহ এবং তথ্যের সূক্ষ্মতাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। আর এটা ছিল বড় ধরনের

১৯. Lloyd S. Kramer and Sarah Maza (eds.), A Companion to Western Historical Thought (Oxford: Wiley-Blackwell), 2002, p. 87.

২০. বেরিল স্মালি (Beryl Smalley), আল-মুয়াররিখুন ফিল-উসুরিল উসতা, দারুল মায়ারিফ, অনুবাদ: কাসেম আব্দুহ কাসেম, পৃ. ৩৫-৩৬।

২১. আব্দুল হালীম মাহরুবাশা, ফালসাফাতুত তারীখ: মাদখাল ইলান-নামাযিজিত তাফসীরিয়্যাহ লিত-তারীখিল ইসলামী, মারকাযু নামা লিল-বুহুস ওয়াদ-দিরাসাত, ২০১৬ খ্রি. পৃ. ৪৭।

বিসর্জন।'[২২] গীর্জার যাজকদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো এমন অবনতি দেখেছে যার প্রতিফলন ইতিহাসের ধারণার উপর পড়েছে। এর কারণ ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক জ্ঞানের অভাব এবং বাইবেলে বিদ্যমান ঐতিহাসিক স্ববিরোধিতার খণ্ডন করার জন্য ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানে গভীরতার অনুপস্থিতি। ইতিহাসের জন্য প্রয়োজন 'ভাষাগত কয়েকটি দক্ষতার অনুশীলন, প্রসঙ্গের ব্যাপারে প্রশস্ত জ্ঞান, উক্ত বিষয়ের ভেতর অন্যান্য ব্যাখ্যার ব্যাপারে গভীর জ্ঞান এবং প্রাথমিক যে সকল উৎস তুলনা এবং

গবেষণার সুযোগ দেয়, সেগুলোকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারা।'[২৩]

জনৈক প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সে সময়টাতে ইতিহাসের কোনো মাপকাঠি ছিল না, ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অনুধাবনের কোনো প্রচেষ্টা ছিল না আবার সমালোচনা করার ক্ষুদ্রতম মানসিকতাও ছিল না। বরং শর্তহীনভাবে সব গ্রহণযোগ্য ছিল। ধর্মীয় কর্তৃত্ব কোনো বাধা ছাড়াই প্রভাব বিস্তার করত। ... মধ্যযুগে মানুষদের যা বলা হতো, তাই তারা বিশ্বাস করত। বাস্তব-অবাস্তবের মাঝে পার্থক্য করার উদ্দেশ্যে গবেষণা চালানোর কোনো চেষ্টা তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়নি।'[২৪] মধ্যযুগে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এমন দুর্বলতা থাকার পরও ইনসাফ করলে বলতেই হবে যে, সে সময় ইতিহাস রচনার পদ্ধতিতে এমন পশ্চাৎপদতা তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের অবস্থার ফল। রোমান সভ্যতার পতন এবং জার্মানদের অভিযানের ফলে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি দেখা দেয়। জ্ঞানচর্চার পতন ঘটে এ অর্থে যে জ্ঞান তার মৌলিকত্ব হারিয়ে বসে। কিছু কিছু অঞ্চলে শিক্ষা কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।[২৫] এছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিকূল হওয়ায় এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে তথ্য স্থানান্তর করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে

---

২২. হ্যারি এলমার বার্নেস (Harry Elmer Barnes), তারীখুল কিতাবাতিত তারীখিয়্যাহ, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যা লিল-কুত্তাব, অনুবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বুরজ, পৃ. ৭৪।

২৩. অ্যালুন মুন্সলো, দিরাসাত তাফকিকিয়্যা ফিত-তারীখ, আল-মারকাযুল কাওমী লিত-তর্জমা, অনুবাদ: কাসেম আব্দুহ কাসেম, ২০১৫, পৃ. ৬৭।

২৪. হ্যারি এলমার, তারীখুল কিতাবাতিত তারীখিয়্যাহ, পৃ. ৮৪।

২৫. কাসেম আব্দুহ কাসেম, তাতাউরু মানাহিজিল বাহস ফিদ দিরাসাতিত তারিখিয়্যাহ, পৃ. ১৬৭।

একজন ইতিহাসবিদের জন্য ইতিহাস পূর্ণরূপে জানা দুঃসাধ্য হয়। দীর্ঘ যাত্রা করার মতো উদ্দীপনাও তাদের মাঝে দেখা যায়নি।

মধ্যযুগে ইতিহাস লেখার বেশ কিছু ধরন ছিল। তন্মধ্যে একটা ছিল 'বাৎসরিক বিবরণী'। সেটা ছিল নথিপত্রের মতো যেখানে এক বছরের পর আরেক বছরের ঘটনাগুলো লেখা হতো। যেমন- অমুক বছরে অনেক শস্য হয়েছে, তমুক বছরে একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মারা গেছেন। নগরীর সরকারগুলো তাদের কর্মচারীদের নামের তালিকা, আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা, সন্ধির চুক্তিপত্র, পাশের নগরীর সাথে সংঘটিত যুদ্ধ প্রভৃতি সংরক্ষণ করত। ইতিহাসের এই বিবরণীগুলোতে অনেক বছরের ঘটনা থাকত। একজন লেখক সেগুলো একত্র করে উপস্থাপন করতেন। তথ্যগুলো একজন বর্ণনাকারী বা ইতিহাসবিদের জন্য ছিল উৎসের মতো, যেগুলোকে সে সাহিত্যিক ঢঙে উপস্থাপন করত। ইতিহাস ছিল নাটকের মতো সাহিত্যিক উপকরণ, যা পড়া বা শোনা হতো। মধ্যযুগে ইতিহাস ও বাৎসরিক বিবরণীর মাঝে পার্থক্য করার বিষয়টি দেখা যায়। সাহিত্যিক উৎকর্ষের মাধ্যমে উপস্থাপন করার বিষয়টিকে কোনো প্রকার গুরুত্ব না দিয়ে বাৎসরিক বিবরণীগুলো সময়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ঘটনাগুলো তুলে ধরত। অন্যদিকে ইতিহাসবিদ ছিলেন বক্তার মতো, তিনি ভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিক আলোচনাকে গুরুত্ব দিতেন। এছাড়া তার উপর একটা নৈতিক দায়িত্বও ছিল।[২৬] অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রকৃত অতীত এবং সাহিত্যিক বর্ণনার মাঝে পার্থক্য অনুধাবনযোগ্য ছিল। মধ্যযুগের ইতিহাসবিদরা ইতিহাস রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা বিষয় হিসেবে জীবনী লিখত। এছাড়াও রাজাদের জীবনী তারা লিখত, যেগুলো ছিল তাদের জন্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে। এটা সত্য যে, লেখকদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং বর্ণনার পদ্ধতি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ছিল। কিন্তু তারা সবাই একটা কাঠামো দাঁড় করাতেন যেখানে নানা ঘটনাকে স্থান দেওয়া যেত। কেননা এই ইতিহাসের মাধ্যমে শাসককে নিজের পছন্দসই চিত্রে শ্রোতা বা পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করা জীবনী-লেখকের দায়িত্ব ছিল।[২৭]

---

২৬. বেরিল স্মাতী, আল-মুরাক্বিখুন ফিল-উসুরিল উসত্বা, পৃ. ২১।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

২. রেনেসাঁ ও লিখনীর সমালোচনার যুগে ইতিহাসশাস্ত্র

'রেনেসাঁ' পরিভাষা ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্প ও সমাজে গভীর পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে। এই পরিবর্তনটি পশ্চাৎমুখী ছিল। অর্থাৎ এটা গ্রীক 'মানবতাবাদী' পৌত্তলিক সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে; যাতে করে গীর্জার কর্তৃত্ব এবং দর্শনে বিদ্যমান স্থবিরতা থেকে বেরিয়ে আসা যায়। এ সকল 'মানবতাবাদী' লোকেরা 'ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গীর্জার যাবতীয় শিক্ষাকে শ্রদ্ধা করত'।[২৮] তারা কমপক্ষে এটা চায় না যে, ধর্মের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। কিন্তু তাদের আলোচনা স্বভাবতই গীর্জায় বিদ্যমান চিন্তার পদ্ধতিতে কম্পন ধরিয়ে দেয়। কারণ তারা পার্থিব বিভিন্ন টেক্সটের উপর যে সকল সমালোচনার নীতি প্রয়োগ করেছিল, সেগুলোই আবার ধর্মীয় টেক্সটের উপর প্রয়োগ করেছিল। সময়ের পরিক্রমায় পবিত্র গ্রন্থসমূহের টেক্সটে যে সংশয়পূর্ণ বিষয় সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে, সেগুলো থেকে তারা ধর্মগ্রন্থকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। এমন ব্যাখ্যা প্রদান করতে চেয়েছিল যা প্রকৃত অর্থের দিকে ফিরিয়ে আনবে। এর মাধ্যমে তাদের দাবি ছিল এই যে, তারা যীশু এবং তার একনিষ্ঠ শিষ্যদের প্রকৃত শিক্ষার দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং অসত্য কল্পকাহিনী ধর্মগ্রন্থ থেকে সরিয়ে ফেলছে।[২৯] তাদের এ পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা মধ্যযুগে ধর্মতত্ত্ববিদেরা যে সকল নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছিল সেগুলোকে অতিক্রম করতে চেয়েছিল।

---

২৮. লরেন্স প্রিন্সিপে বলেন, 'বর্তমান সময়ে কারো কারো মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে সেটা হলো, মানবতাবাদী লোকেরা সবসময় অধার্মিক সেকুলার এবং ধর্ম-বিরোধী ছিল। হ্যাঁ, এটা সত্য যে কিছু মানবতাবাদী গীর্জার বিভিন্ন ভুলভ্রান্তির সমালোচনা করেছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষাকে তাচ্ছিল্য করেছে। কিন্তু তারা কোনোভাবেই খ্রিষ্টধর্ম বা কোনো ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেনি। বাস্তবে বহু মানুষ ভাষার সংস্কারের সাথে গীর্জার সংস্কারও চেয়েছিল। তারা প্রাচীন যুগে ফিরে যেতে চেয়েছিল, খ্রিষ্টীয় প্রথম কয়েক শতকের গীর্জা ব্যবস্থায় তারা প্রত্যাবর্তন করতে আগ্রহী ছিল।' লরেন্স এম. প্রিন্সিপে (Lawrance M. Principe), আস-সাউরাতুল ইলমিয়্যা: মুকাদ্দিমাতুন কাসীরাতুন জিদ্দান, মুআস্সাসাতু হিন্দাওয়ী, অনুবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইসমাঈল, পৃ. ১৯।

২৯. নূরুদ্দীন হাতুম, তারীখু আসরিন নাহ্দাতিল উরূব্বিয়্যাহ, দারুল ফিকর, দিমাস্ক, ১৯৬৮, পৃ. ১৬১।

সে সময়কালের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম 'রেনেসাঁ' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন ফরাসি ইতিহাসবিদ জন মিশেলে। তিনি প্রচারণা চালান যে, রেনেসাঁ হলো অগ্রগতি, গণতন্ত্র, বুদ্ধিবৃত্তি, বাস্তবতা, শিল্পকলা, সৌন্দর্য এবং সব ধরনের স্বৈরাচার থেকে মুক্তির যুগ, বিশেষ করে গীর্জার স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব থেকে।[৩০] এই চিন্তাধারার সমস্যা বা সংকট হলো 'এটা পঞ্চদশ শতক থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত যা ঘটেছে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ দেওয়ার পরিবর্তে ঊনবিংশ শতকে এসে ইউরোপীয় সমাজকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে।' সেটার প্রকাশ ঘটেছে 'গীর্জার বিরুদ্ধে সংশয়, শিল্প-সাহিত্যের শক্তিমত্তা, সকল সভ্যতার উপর ইউরোপীয় সভ্যতার বিজয় প্রভৃতির মাধ্যমে। এই মূলনীতিগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ইতিহাসের এই সময়টিতে ইউরোপ জোরপূর্বক দুই আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় নিজেদের কর্তৃত্ব ফলানোর চেষ্টা চালায়। কিছু মানুষ আলোকায়নের যুগের ব্যাপারে এমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে যেন সেটা বিশ্বের উপর ইউরোপীয় কর্তৃত্ব ও প্রভাবের বৈধতা প্রদান করে।'[৩১]

মিশেলের পর থেকে ইতিহাসবিদরা আজ পর্যন্ত এই পরিভাষা ব্যবহার করে আসছে। তবে বর্তমান সময়ের অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এই সরল ও আংশিক বিবরণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। তারা মনে করেন, রেনেসাঁ মধ্যযুগেরই বিস্তৃত রূপ। তবে বেশ কিছু কারণে সে সময়টাতে ধাপে ধাপে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। সেখানে যুগপৎভাবে বিচ্ছিন্নতা ও নিরবচ্ছিন্নতা ছিল। ক্রেন ব্রেন্টন বলেন, 'এখানে আমরা সর্বপ্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হই সেটা হলো আধুনিক ও বর্তমানের মাঝে পৃথকীকরণের সমস্যা। এটা খুবই বড় সমস্যা। কারণ বাস্তব জীবনের লক্ষ লক্ষ নির্দিষ্ট ঘটনাকে আমরা এমন ব্যাপক পরিভাষা দিয়ে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যেগুলো একটি অন্যটির সাথে এতটা সরলভাবে সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত নয়। এটা আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে সরলতার দিকে ইঙ্গিত করে। মধ্যযুগ স্থান-কালের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে থেমে যায়নি, যার পর থেকে আধুনিক যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। আধুনিকতার এক সূর্যোদয় এসে বুড়িয়ে

---

৩০. ব্রিলিপে, আস-সাউরাতুল ইলমিয়্যা, পৃ. ১৫।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

যাওয়া মধ্যযুগের রাতকে মুছে দেয়নি। এটা সত্য যে মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগের মাঝে পার্থক্য করতে পারাটা বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ইতিহাসবিদদের ভাবনার বিষয় ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে স্পষ্ট নিদর্শনগুলো জানত, সেগুলো আমাদের সময়ে এসে অজানা হয়ে পড়ে।'[৩২]

ড. নূরুদ্দীন হাতূম বলেন, 'বর্তমান সময়ে এসে কেউ মধ্যযুগ আর রেনেসাঁকে পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুটি যুগ হিসেবে বিবেচনা করে না। নিঃসন্দেহে একটা অন্যটা থেকে ভিন্ন, কিন্তু 'জটিল কিছু শক্তি-ক্ষমতার সমন্বয়ে গঠিত ভারসাম্য যেন একই প্রকারের অন্য ভারসাম্যের প্রতিফলন ঘটাতে পারে'। আর এই দুই ভারসাম্যের মাঝে সাধারণ কিছু উপাদান আছে, তবে সেটা থাকার মাঝে তারতম্য আছে।'[৩৩]

কিন্তু আমাদের বর্তমান বিষয় এবং উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে আমরা ধরে নিব যে, রেনেসাঁ 'অতীতের এক নতুন ধারণা' প্রবেশ করিয়েছে। ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারণার জায়গা থেকে দেখলে রেনেসাঁ নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করে:-

প্রথমত, রেনেসাঁ আবিষ্কার করেছে যে, ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি। মধ্যযুগে যে সকল ধর্মীয় ব্যাখ্যা ছিল, সেগুলোকে দূর করে দিয়েছে। এ যুগের ইতিহাসবিদ 'এমন ব্যক্তি যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাসশাস্ত্রে যাজকদের হস্তক্ষেপ ছিল বড় ধরনের দুর্ঘটনা। কারণ তারা অতীতের মাঝে এমন সব ধর্মীয় ও ঐশ্বরিক উপকরণের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যেগুলো কোনো মন্তব্য বা আলোচনা গ্রহণ করে না।'[৩৪]

দ্বিতীয়ত, রেনেসাঁ খ্রিষ্টধর্মের নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাহিরে গিয়ে নাগরিক সমাজকে আবিষ্কার করেছে। 'প্রাচীন বিশ্বের ব্যাপারে রেনেসাঁর সময়কালীন চিন্তাবিদরা এটা জানতে পেরেছে যে, আধুনিক নগরে জীবন নিছক মানবীয় বিষয়, এখানে ঐশ্বরিক কোনো প্রভাবের হস্তক্ষেপ নেই।'[৩৫]

---

৩২. জেন ব্রেন্টন, তাশকীলুল আকলিল হাদীস, মাকতাবাতুল উসরা, অনুবাদ: শাওকি জালাল, পৃ. ২৪।

৩৩. হাতূম, তারীখু আসরিন নাহদাতিল উরুব্বিয়্যাহ, পৃ. ৭৫।

৩৪. আল-হাদী আত-তাইমুমী, আল-মাদারিস আত-তারীখিয়্যা আল-হাদীসাহ, দারুত তানওয়ীর ওয়া দারু মুহাম্মাদ আলী লিন-নাশর, ২০১৩ খ্রি. পৃ. ৪৭।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

তৃতীয়ত, রেনেসাঁ আধুনিক ইতিহাসের ধারণা সৃষ্টি করেছে, যা মধ্যযুগের ইতিহাসে লিখনীসমূহের বিপরীত। মধ্যযুগে ইতিহাস লেখা হতো পৃথক একাকী আসরে। ইতিহাসবিদ নাটকীয় ভঙ্গিতে সেটাকে বর্ণনা করতেন। এই বৈশিষ্ট্যের অর্থ হলো রেনেসাঁ 'ইতিহাসের ব্যাপারে খ্রিষ্টধর্মের সংকীর্ণ ধারণার বিপরীত প্রতিক্রিয়া। সে সময়ের ইতিহাসের একটাই অর্থ ছিল, আর তা হলো মানবতার জন্য আত্মার বিসর্জন।'[৩৬] আর এই ধারণাটির উৎপত্তি ঐ জায়গা থেকে যে, প্রথম যুগ হচ্ছে সর্বোত্তম। কিন্তু রেনেসাঁর সময়ে এসে একজন ইতিহাসবিদ 'স্বর্ণালী যুগ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, যে যুগের পর মানুষজন পশ্চাৎমুখী হয়েছে। সে মনে করে ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে মানুষ ছিল জংলী প্রাণীর মতো। কিন্তু ধীরে ধীরে পশুত্ব থেকে বেরিয়ে মানুষজন উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছে।'[৩৭]

চতুর্থত, ইতিহাস ও মূল্যবোধ পৃথককরণ। 'মানবতাবাদীরা গ্রীক টেক্সট পড়ার মাধ্যমে নিজেদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি সাধন করেছে। তারা ষোড়শ শতকে এসে প্রাচ্যের ভাষাগুলো জানতে পেরেছে। সে সময়ে নতুন টেক্সট আবিষ্কার করা কোনোভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল বিদ্যমান টেক্সটসমূহ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ করা। বাইবেলের ব্যাখ্যার সাথে নতুন বিভিন্ন টেক্সটকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করাটা লক্ষ্য ছিল না, বরং লক্ষ্য হয়ে গিয়েছিল বাইবেলকেই (ভিন্নভাবে) বোঝা।'[৩৮]

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা রেনেসাঁ যুগে মূল্যবোধের উৎস ছিল না। অর্থাৎ গ্রেকো-রোমান সভ্যতা 'মানবতাবাদী' যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে অন্ধ অনুকরণের মতো আবশ্যকীয় বিষয় ছিল না। তাদের কাছে এটা এমন কোনো সূত্র যা উৎস নয় যেটা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বরং এটা তথ্যের একটা উৎস মাত্র। তাদের উদ্দেশ্য প্রাচীন বিশ্বকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা নয়,

৩৬. আলবান জি. উইডগেরি (Alban G. Widgery), আত-তারীখ ওয়া-কাইফা ইউফাস্‌সিরুনাহু, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যি লিল-কিতাব, অনুবাদ: আব্দুল আযীয তাওফীক জাওয়েদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪।

৩৭. আত-তাইমূমী, আল-মাদারিস আত-তারীখিয়্যাহ, পৃ. ৪৮।

৩৮. এমিল ব্রেহি, তারীখুল ফালসাফাহ ফিল-আসরিল ওয়াসীত্ব ওয়ান-নাহদ্বাহ, দারুত-ত্বলীয়াহ, ১৯৮৮, অনুবাদ: জর্জ ত্বারাবিশি, পৃ. ২৬৯।

বরং প্রাচীন বিশ্বের সাথে সংলাপে যাওয়া। কারণ তাদের দৃষ্টিতে প্রাচীন বিশ্ব স্বাধীন চিন্তা ও প্রজ্ঞার প্রতীক। এই প্রজ্ঞা আর স্বাধীন চিন্তা মানুষের দিকে খুব বেশি আশাবাদ বা নৈরাশ্য কোনো দৃষ্টিতেই তাকাবে না।'[৩৯] অন্যভাবে বললে এই সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তত্ত্বীয় ছিল, আধ্যাত্মিক না। জর্জ মিনোর ভাষায়, 'আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসগত চাহিদার উপর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন, কাজের উপর জ্ঞান, সিদ্ধান্তের উপর সংশয় প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। পূর্বের প্রজন্মসমূহে বিদ্যমান বিশ্বাসের যে সীমারেখা আছে, সেটাকে সীমিত করে দিয়েছে অসীম সাংস্কৃতিক প্রবৃত্তি। মানব-মন মানবীয় জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।'[৪০] কিন্তু এই সংলাপ খ্রিষ্টান ভাষ্যের জন্য হুমকি। তাই আমরা দেখতে পাই, মিশেল দে মন্তের মতো একজন প্রসিদ্ধ লেখক (মৃ. ১৫৯২ খ্রি.) খ্রিষ্টীয় ও পৌত্তলিক নৈতিকতার মাঝে তুলনা করে খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্বে আপত্তি তোলে। আর ইতিহাস লেখার প্রসঙ্গ আসলে সেখানে 'ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রভাব এই (মানবতাবাদী) আন্দোলনের মৌলিক দিকসমূহের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলন বলতে বোঝায় প্রাচীন টেক্সটের অনুসন্ধান (বিশেষত গ্রীক টেক্সট)। তারপর বিদ্যমান টেক্সটসমূহ তুলনা, সমালোচনা ও সংশোধন। বইয়ের টেক্সট সমালোচনা ঐতিহাসিক নথিগুলোর বিশ্লেষণের মূল্য সম্পর্কে প্রাথমিক অনুভূতি প্রদান করে।'[৪১] ইতিহাসশাস্ত্রের এমন বৃহৎ পদক্ষেপের পরও এটা নিছক সাহিত্যের মাঝে সীমিত ছিল, আধুনিক পরিভাষায় 'জ্ঞান' বলতে যা বোঝায় তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'মানবতাবাদী আন্দোলনের যুগে অনেক সময় ইতিহাস ও বাস্তবতাকে বিকৃত করা হয়েছে; যাতে অলঙ্কারশাস্ত্র ও বক্তৃতার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।'[৪২]

রেনেসাঁ ভাষাগত বিশ্লেষণ এবং প্রাচীন ভাষাসমূহ নিয়ে মুগ্ধ ছিল। সুতরাং এই বিশ্লেষণ খ্রিষ্টধর্মের উপর প্রয়োগ করা অবাক করার মত কিছু নয়।

---

৩৯. আত-তাইমুমী, আল-মাদারিস আত-তারীখিয়্যাহ, পৃ. ৪১।

৪০. জর্জ মিনো, আল-কানীসাহ ওয়াল-ইলম: তারীখুস সিরা' বাইনাল আকলিদীনী ওয়াল-আকল আল-ইলমী, আল-মুআস্সাসাতুল আরাবিয়্যা লিত-তাহদীসিল ফিকরী, অনুবাদ: মোরিস জালাল, পৃ. ৩৬৩।

৪১. হ্যারি এলমার, তারীখুল কিতাবাতিত তারীখিয়্যাহ, পৃ. ১৪৬।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

অগাস্টিন খ্রিষ্টধর্ম এবং ইতিহাসের তত্ত্ব যেভাবে প্রদান করেছিলেন, রেনেসাঁ সেটা থেকে বেরিয়ে পড়ে। অগাস্টিন ছিলেন মধ্যযুগে ইতিহাসের উপর ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক। তিনি সর্বপ্রথম খ্রিষ্টধর্মকে 'জ্ঞানের তত্ত্ব' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই তত্ত্ব ইউরোপীয় রেনেসাঁর যুগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রেনেসাঁর যুগ ছিল খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ। ভাষাগত বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক সমালোচনার মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের মূল পুনরায় উদঘাটন করতে শুরু করে। বিষয়টির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উদাহরণ দিয়েছেন মানবতাবাদী আন্দোলন এবং আলোকায়নের যুগের অন্যতম দুই কর্ণধার, ইতালির ইতিহাসবিদ লরেঞ্জো ভালা (১৪৫৭) এবং হল্যাণ্ডের খ্রিষ্টান দার্শনিক দেসিদেরিয়োস ইরাসমস (১৫৬৩)। প্রথম জন 'তার বইপত্র ও প্রবন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক টেক্সটের সমালোচনা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। যদিও 'ডোনেশন অফ কন্সট্যান্টিন' (Donation of Constantine) নামক নথির সমালোচনা ছিল তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সমালোচনামূলক কাজ, যার জন্য তিনি নিহত হতে গিয়েছিলেন। তবে এটার কারণে তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন; যেহেতু এর কিছু মারাত্মক ফলাফল ছিল। পোপরা নিজেদের ঐতিহাসিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত নথির উপর নির্ভর করত। ঐ নথির বক্তব্য ছিল এই যে, রাজা বড় কন্সট্যান্টিন ইতালির জমিগুলো তৎকালীন পোপকে দান করে দিয়ে যান, যেহেতু তিনি হলেন সেন্ট পিটারের সময়ে রাজা এবং তিনি যীশুখ্রিষ্ট থেকে এটা লাভ করেন। লরেঞ্জো ভালা অকাট্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, গীর্জার লোকজন এই নথিটি বানিয়েছে। তারপর রাজা কন্সট্যান্টিনের নামে জাল স্বাক্ষর বসিয়েছে। ভালার এই গবেষণা তৎকালীন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জ্ঞানের অঙ্গনে বড় ধরনের শোরগোল সৃষ্টি করে। ভালাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়।'[৪৩]

অন্যদিকে দেসিদেরিয়োস ইরাসমস 'নতুন নিয়মের প্রাচীন গ্রীক টেক্সটগুলোতে অন্বেষণ চালিয়ে সবগুলো পরস্পর তুলনার মাধ্যমে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও নির্ভরযোগ্য রূপ বের করে আনেন এবং উক্ত রূপ লেখার সময় যে ভুল-ত্রুটি হয়েছিল সেগুলো থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি ভাষাগত বোঝার

---

৪৩. জামীল মুসা আন-নাজ্জার, দিরাসাত ফি-ফালসাফাতিত তারীক আন-নাকদিয়্যা, মাকতাবাতু মাদবুলী, ২০১১, পৃ. ১২৩।

ভুল থেকে উদ্ভূত ত্রুটিও দূর করেন। এছাড়া পরবর্তী বিভিন্ন জমানার লোকজন যা কিছু সংযুক্ত করে সেগুলোও বাদ দিয়ে দেন। তিনি যখন নতুন নিয়মের মূল গ্রীক টেক্সট বের করলেন, তখন আবিষ্কার করলেন যে ত্রিত্ববাদ চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সময় জুড়ে ল্যাটিন ইঞ্জিলে যে বক্তব্য দিয়ে প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল সেটা পরবর্তী সংযোজন এবং মূল গ্রীক টেক্সটে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।'[৪৪]

এদের পর এলেন বাইবেলের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সমালোচক দার্শনিক স্পিনোজা। তিনি মুসা 'আলাইহিস সালামের নামে প্রসিদ্ধ পঞ্চপুস্তকের ব্যাপারে সংশয় উত্থাপন করে সেগুলোকে নাকচ করে দেন। তিনি দাবি করেন, এগুলোর লেখক মুসা 'আলাইহিস সালামের অনেক যুগ পরে একজন ব্যক্তি। তার ভিত্তি ছিল বেশ কিছু টেক্সট এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন। লিখনীর সমালোচনা করার সময় তিনি একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, সেটা হলো: মুসা 'আলাইহিস সালামের একনিষ্ঠ শিষ্যরা কি এই পুস্তক 'নবী' হিসেবে লিখেন যে, তাদের বক্তব্য ওহী বলে বিবেচিত হবে? নাকি তারা কেবল প্রচারক হিসেবে বক্তব্যগুলো প্রদান করেন?

স্পিনোজার উপসংহার হলো, মুসা 'আলাইহিস সালামের একনিষ্ঠ এই শিষ্যদের বর্ণনাভঙ্গি নবীদের বর্ণনাভঙ্গি থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। তারা ওহী বা ঐশী দায়িত্ব থেকে লেখেনি। বরং ব্যক্তিগত মতামতের জায়গা থেকে তাদের রচনা। স্পিনোজার মত হলো এই শিষ্যরা লিখনীর কোনো নির্দেশই পাননি, তারা শুধু ধর্ম প্রচারের নির্দেশনা পান। এছাড়া তিনি প্রচলিত খ্রিষ্টান বিশ্বাসের ব্যাপারে অনেক সংশয় তুলে ধরেন। অবশেষে তিনি জোর দিয়ে প্রমাণ করেন যে, মূল গ্রন্থের অনেক বিকৃতি হয়েছে।[৪৫]

তারপর অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে সমালোচনামূলক গবেষণা প্রকাশ পেতে থাকে। 'নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলোর উপর যে সকল গবেষণা হয়, সেগুলোর ফলাফল এসে দাঁড়ায় যে, ইঞ্জিলের লেখক লুক ও মথি উভয়ে যীশুকে যে শুধু দেখেননি তা

---

৪৪. Jonathan A. C. Brown, Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World, Oneworld Publications, 2009, p. 201.

৪৫. দেখুন, নাঈমা ইদরীস, 'আযমাতুল মাসীহিয়্যাহ বাইনান-নাক্বদিত তারীখী ওয়াত-তাতাউর আল-ইলমী'-র তৃতীয় অধ্যায়, এটা মেন্তুরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হওয়া একটা ডক্টরেট থিসিস। ইন্টারনেটে প্রকাশিত।

নয়, বরং তারা যীশুর জীবনী লিখেছেন মার্কের সুসমাচার থেকে। (মার্কের সুসমাচারকে গণ্য করা হয় সবচেয়ে প্রাচীন সুসমাচার। অথচ গীর্জাগুলো মনে করত মথির সুসমাচারের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ হলো মার্কের সুসমাচার)'[৪৬] অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে এসে ভাষাগত এমন গবেষণার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এ ধরনের সমালোচনার ক্ষেত্রে 'সংশয়-সন্দেহ' অন্যতম ভিত্তিতে পরিণত হয়। 'সন্দেহ'ই হয়ে যায় প্রকৃত বা মূল অবস্থা। তারপর নথির মৌলিকত্ব এবং লেখকের দিকে সেটার সম্বন্ধের সত্যতা যাচাইয়ের প্রসঙ্গ আসে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে রেনেসাঁর আগে ইতিহাস সংক্রান্ত ধারণা ছিল মূল্যবোধে পরিপূর্ণ। আর সেটা ছিল উদ্দেশ্যবাদ ও নৈতিকতায় পুষ্ট বিশ্বজগৎ সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার একটা অংশ মাত্র। ইউরোপীয়দের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বজগৎ রেনেসাঁর আগে ঐশ্বরিক ছিল। ইতিহাসের গ্রন্থ ছিল এমন একটা গ্রন্থ, যেটা আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশের প্রতিফলন ঘটায়। প্রকৃতিতে যেকোনো নতুন আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্রষ্টার নিখুঁত সৃষ্টির প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু উক্ত ঐশীবাণীর কাছে পৌঁছানোর একমাত্র মাধ্যম হলো গীর্জা। গীর্জার কর্তৃত্ব ও জনমানুষের কাছে যাজকদের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে মানুষের মনে ধর্মীয় প্রভাবও দুর্বল হয়ে যায়। সংশয়বাদী মানসিকতা বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগ এবং আলোকায়নের যুগের মাঝে সীমারেখা টেনে দেওয়ার মতো নানামুখী পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার ফলাফল ছিল এই যে, 'সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে জ্ঞানের প্রচলিত মাপকাঠিগুলো দুর্বল হয়ে যায়। আকীদা-বিশ্বাসের নিশ্চয়তা দেয় এমন কোনো সার্বজনীন আবশ্যকীয় মাপকাঠি থাকে না, হোক সেটা জ্ঞানগত, নৈতিক বা ধর্মীয়।'[৪৭] 'প্রাচীন সকল মাপকাঠি ঝরে পড়ার এ সময়টাতে দেকার্তের লিখনীর বিকাশ ছিল আপেক্ষিকতা দমন করার একটি প্রচেষ্টা।'[৪৮] কিন্তু দেকার্ত যা করেন, সেটা বরং সংশয়-সন্দেহ ও আপেক্ষিকতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। জেনিফার হিক্টের ভাষায়, 'তার

---

৪৬. Jonathan A. C. Brown, 2009, p. 201.

৪৭. Charles Guignon, Heidegger and the Problem of Knowledge, Indiana: Hackett Publishing, 1983, p.21.

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

(৩) সন্দীপন প্রকাশন

মেডিটেশনেস বই সংশয়ের ইতিহাসকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।”[৪৯] আমরা এখন সে প্রসঙ্গেই যাব।

৩. পরীক্ষণকে জ্ঞানের মাপকাঠি হিসেবে প্রতিষ্ঠা

ক) ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠা: কোপার্নিকাসের হাত ধরে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণায় আমূল পরিবর্তন আসার পর গ্যালিলিও এসে পরীক্ষণ পদ্ধতিতে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করেন। এটা তার সংলাপগুলো থেকে স্পষ্ট। ঘনীভূত বা জমাটবদ্ধ হওয়া নিয়ে পিজা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের মাঝে সংলাপ চলাকালীন গ্যালিলিওর এক বন্ধু মত দেন যে, বরফকে পানির জমাটবদ্ধ রূপ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, যেহেতু এটা কঠিন পদার্থ আর পানি তরল পদার্থ। কিন্তু গ্যালিলিও বলেন, বরফ যেহেতু পানির উপরপৃষ্ঠে ভেসে ওঠে, নিশ্চয় সেটা পানির চাইতে হালকা এবং এর ঘনত্বও কম। তার বন্ধু বলেন, বিষয়টা এমন না। বরফ ভেসে ওঠে কারণ এর প্রস্থ এবং পৃষ্ঠদেশ আছে যেটার কারণে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া যায় না। গ্যালিলিও এটা মানতে অস্বীকৃতি জানান এবং তার যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, বরফকে যদি তুমি চেপে পানির নিচে নিয়ে ছেড়ে দাও, এর প্রস্থ এবং পৃষ্ঠদেশ আবার উপরে ভেসে ওঠার ক্ষেত্রে কোনো বাধা দিবে না।

একই পদার্থ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করার মাধ্যমেই কি সেগুলো পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা সেটা নিয়ে তাদের মাঝে আরো তর্ক-বিতর্ক হয়। সংলাপের শেষে গ্যালিলিও তার প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দেন যেন সে পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করবে যে একই পদার্থ থেকে সৃষ্ট ভিন্ন আকৃতির বস্তু পানিতে শুরু থেকেই পুরোপুরি ডুবলেও পানির পৃষ্ঠদেশে সেটার ভেসে ওঠা কিংবা পানিতে ডুবে যাওয়া প্রত্যেকটার আকৃতির উপর নির্ভর করবে। সবার সামনে দিনের বেলা পরীক্ষণ সংঘটিত হয়, যেখানে গ্যালিলিও তার প্রতিপক্ষের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। মধ্যযুগীয় (স্কলাস্টিক) দর্শনে এমন পরীক্ষণ নির্ভরতা এতটা প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল না। অধিকন্তু প্রাকৃতিক দর্শনের সাথে গণিতের এমন সমন্বয় কখনো ঘটেনি। গ্যালিলিও এর এই পরীক্ষণের ঘটনা জ্ঞানের মাপকাঠি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিছু উপাদানকে

৪৯. জেনিফার মাইকেল হিট, তারীখুশ শাক, আল-মারকাযুল কাওমি লিত-তর্জমা, ২০১৪, অনুবাদ: ইমাদ শীহা, পৃ. ৫৩৮।

গুরুত্ব দিতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে গ্যালিলিও পরীক্ষণ করতে আগ্রহী হয় এবং এটাকে জ্ঞানের মূল মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করে, যদিও সেটা ধর্মগ্রন্থের টেক্সটের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। গ্যালিলিও ধর্মগ্রন্থের ভাষ্যকে সরাসরি বিজ্ঞানের সামনে রাখেন। ১৬১৪ সালে ডেনমার্কের ডাচেস ক্রিস্টিনার উদ্দেশে লিখিত পত্রে তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি আকাশের জ্যোতিষ্কসমূহের মাঝে সূর্য কেন্দ্রীয় অবস্থানে আছে, ঐ জ্যোতিষ্কগুলো নিজের কক্ষপথে ঘোরে, স্থান ত্যাগ করে না। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, পৃথিবী নিজকে কেন্দ্র করে ঘোরে, আবার সূর্যকে কেন্দ্র করে তার কক্ষপথে ঘোরে।' ধর্মগ্রন্থের ভাষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া নিয়ে ক্রিস্টিনা যে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, সেটার ব্যাপারে গ্যালিলিও মন্তব্য করেন, 'যখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়, তখন আমাদের জন্য লিখিত ভাষ্যের বদলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরীক্ষণ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণের উৎস থেকে জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে, যেগুলো ঐ প্রাকৃতিক ঘটনার যথার্থতা নিশ্চিত করে।' আর তার বিচারের ঘটনা তো খুবই প্রসিদ্ধ, কেননা সেটাকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সংঘর্ষের উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়।[৫০]

আরো ব্যাপকভাবে বললে, হুসার্লের মত অনুযায়ী বলা যায় যে গ্যালিলিও কল্পনা বা আদর্শিক জগতের বদলে বাস্তব জগৎকে বেছে নিয়েছিলেন। 'অর্থাৎ যেটা পরীক্ষিত এবং পরীক্ষণের উপযুক্ত। ... এটা বেশ দ্রুত তার অনুসারীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে; তার পরবর্তী শতকের পদার্থবিদদের মাঝেও।'[৫১] পরবর্তী শতকগুলোতে বিজ্ঞানের জয়জয়কার দেখা গেলে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সকল শাস্ত্রের প্যারাডাইম হিসেবে বৃহৎ পরিসরে এটি গ্রহণযোগ্যতা পায়।' পরীক্ষণ 'সকল তত্ত্বের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে একটা নিরপেক্ষ বিচারালয় প্রদান করে।'[৫২] অনেক বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতেই এটা গ্রহণযোগ্যতার শর্ত বলে বিবেচিত হয়। যেমন- প্রসিদ্ধ Nature পত্রিকার সম্পাদক হেনরি গী (Henry Gee) বলেন, ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলো 'যেহেতু পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব না, সেহেতু সেগুলো

৫০. রিদা যাইদান, নাহুয়া মানহাজিন ওয়াসফিয়্যিন লিল-ইলম, মারকায বায়াইন, পৃ. ৬৯।
৫১. প্যাট্রিক হিলি, সুয়ারুল মা'রিফাহ, আল-মুনাযযামাতুল আরাবিয়্যা লিত-তারজামা, ২০০৮, অনুবাদ: নূরুদ্দীন শাইখ আবীদ, পৃ. ৫১।
৫২. Aviezer Tucker, ed., A Companion to the Philosophy of History and Historiography, Oxford/Boston: Wiley – Blackwell, 2009, p. 45.

জ্ঞানসম্মত না।'[৫৩] এর থেকেও ভয়াবহ বিষয় হলো পরীক্ষণকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করার এই ধ্যান-ধারণা আমাদের আধুনিক সমাজ-সংস্কৃতিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিষয়। সবাই মনে করে, 'যা কিছু পরীক্ষণের উপযোগী, তাই জ্ঞান।'

খ) জ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা:

দেকার্ত (১৬৫০ খ্রি.) এমন এক যুগে আসেন, যখন 'ধর্মতত্ত্বের অবশিষ্ট কিছু বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানের জাগরণ মিশে গিয়েছিল।'[৫৪] বিজ্ঞানের অগ্রগতির সূচনালগ্ন চলছিল। গীর্জার প্রভাব প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। দেকার্ত তার যুগে প্রচলিত 'জ্ঞান'-এর ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ তিনি 'বীজগণিত ও জ্যামিতিক বিশ্লেষণ দ্বারা খুব প্রভাবিত ছিলেন। সে সময়টাতে এ শাস্ত্রগুলো অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছিল; যার প্রভাব সবার উপর পড়েছিল। দেকার্ত গণিতশাস্ত্রের চলমান অবস্থার ব্যাপারে অজ্ঞ কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, বরং তিনি সে যুগের অন্যতম গণিতবিদ ছিলেন। তিনি যখন গণিতশাস্ত্রকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন, তখন সেটা জেনে বুঝেই দেন। গণিতের (বিশেষ করে জ্যামিতির) যে বিষয়টা তাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিল (যেমনটি তিনি নিজের বইয়ে উল্লেখ করেছিলেন) সেটা হলো গণিতের পদ্ধতিগত ও চিন্তাধারার স্থায়িত্ব এবং গণিতের যুক্তি-প্রমাণের শক্তিমত্তা ও স্পষ্টতা। তিনি এটাও বলেন যে, যখন তিনি জানতে পারলেন এই শাস্ত্রের ভিত এত শক্তিশালী ও দৃঢ়, কিন্তু এর উপর বিশাল দালান নির্মিত হয়নি, তখন তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, দর্শন এবং অন্যান্য জ্ঞান এই শাস্ত্রের মত দৃঢ় ভিত্তির অধিকারী হবে। তাহলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস ও স্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণের ফলাফল অর্জন করতে পারব, বিশেষত যেখানে প্রকৌশল তথা জ্যামিতি আমাদেরকে এর একটা উৎকৃষ্ট নমুনা প্রদান করেছে।'[৫৫] এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেকার্ত সংশয়ের মোকাবেলা করে জ্ঞানের একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। কিন্তু

৫৩. প্রাগুক্ত।

৫৪. আব্দুল্লাহ ইব্রাহীম, আল-মারকাযিয়্যাতুল গারবিয়্যা: ইশকালিয়্যাতুত তাকাউন ওয়াত -তামারকুয হাউলায যাত, আল-মারকাযুস সাকাফী আল-'আরাবী, ১৯৯৭, পৃ. ৭১।

৫৫. রিচার্ড শাখত, রুউয়াদুল ফালসাফা আল-হাদীসাহ, মাকতাবাতুল উসরা, অনুবাদ: আহমদ হামদী মাহমুদ, পৃ. ১৮।

সেটা গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যেটা কিনা তার চোখে দৃঢ় বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। 'দৃঢ় বিশ্বাসের আলামত হলো অর্থগত স্পষ্টতা ও ধারাবাহিকতা, যেমনটা আমরা গণিতে দেখতে পাই। গণিত সুশৃঙ্খল নিয়ম অনুসরণ করে সহজ স্পষ্ট বিষয় থেকে যাত্রা করে কঠিন দুর্বোধ্য বিষয়ে পৌঁছে যায়।' সকল শাস্ত্রে এই আলামত একই হবে। আর এই পদ্ধতিই 'একমাত্র বৈধ পদ্ধতি। কারণ আক্বল (বিবেক-বুদ্ধি) একটা, আর সকল শাস্ত্রে আকলের যাত্রা একইভাবে হবে। এভাবে সংগঠিত হবে একটি জ্ঞান যেটা 'সামগ্রিক জ্ঞান' হিসেবে বিবেচ্য। বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির বিভিন্নতায় শাস্ত্রসমূহ একটি অন্যটির উপর বিশেষত্ব অর্জন করে না। বরং এক আকলের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ যখন একক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তখনই শাস্ত্রগুলো বিশেষত্ব অর্জন করে।'[৫৬] আর এই পদ্ধতিটি হলো তত্ত্বীয় সংশয়বাদ। কারণ 'আমাদের আক্বল এমন সব সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ যেগুলো আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তি ও পরিপক্কতা লাভের আগে ছোটকাল থেকে পেয়ে আসছি কিংবা শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখে আসছি। বিভিন্ন শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাব সেগুলো বহু মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও সহায়তায় বেশ বড় আকার ধারণ করেছে। জোড়াতালি দেওয়া কাপড় কিংবা মেরামত করা বাড়ির রূপ নিয়েছে। এখন আমরা যদি বিভিন্ন শাস্ত্রে সুনিশ্চিত কিছু সাব্যস্ত করতে চাই, তাহলে আমাদের জন্য নতুনভাবে যাত্রা শুরু করাটা জরুরী। আমাদের আকলে যত জ্ঞান এখন পর্যন্ত ঢুকেছে, সব ছুঁড়ে ফেলে দিব। সকল শাস্ত্রের পথ ও পদ্ধতির ব্যাপারে আমরা সংশয় পেশ করব। আমাদের অবস্থা একটা দালানের মতো, যেটার ভূমি খনন করতে করতে আমরা মূল ভিত পেয়ে যাব, যার উপর দালানটা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে মূলে ফিরে যেতে চাই সেটা হলো পরিশুদ্ধ খাঁটি আক্বল। সকল মানুষের আক্বল একই। এটা একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে আমরা মানুষ হই, মূক প্রাণীর তুলনায় ভিন্ন হই। এটা সকল মানুষের মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। মানুষের মাঝে যত মতভেদ, সবকিছুর উৎস হলো আক্বল ব্যবহারে বিভিন্ন পদ্ধতির পার্থক্য ও ভিন্নতা।'[৫৭]

---

৫৬. ইউসুফ কারাম, তারীখুল ফালসাফাতিল হাদীসাহ, মুআসসাসাতু হিন্দাওয়ী, পৃ. ৭১-৭২।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

তত্ত্বীয় সংশয়বাদ আমাদের জ্ঞানের জন্য পরীক্ষাতুল্য। আকলে যত রকমের সংশয় উত্থাপিত হতে পারে, সব এর অন্তর্ভুক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ইন্দ্রিয় অনেক সময় আমাদের ধোঁকা দেয়। আমরা স্বপ্নে অনেক দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করি, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন থাকে। আর যে বিষয়টা আমাদেরকে একবার হলেও ধোঁকা দিয়েছে, সেটাকে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। দেকার্ত লক্ষ্য করেন যে জন্ডিসের রোগীর চোখ তাকে ধোঁকা দেয়। সে সবকিছু হলুদ দেখে। সূর্যের দিকে তাকালে সূর্যকে আমরা ছোট দেখতে পাই। অথচ সূর্য এই পৃথিবী থেকে বহু গুণে বড়। এছাড়া দেকার্ত উল্লেখ করেন, 'কিছু মানুষের হাত বা পা কাটা হয়েছিল তারপরও তারা বলেছিল যে, কেটে ফেলা হাত-পায়ের জায়গায় তারা আজও ব্যথা অনুভব করে। তাই তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, তার শরীরে কোনো অঙ্গে ব্যথা অনুভব করলেও তিনি নিশ্চিতভাবে বলবেন না সেই অঙ্গে কোনো সমস্যা হয়েছে।'[৫৮] এভাবে যেকোনো জ্ঞানের ব্যাপারে সংশয় উত্থাপন করা যাবে, এমনকি গণিতের ক্ষেত্রেও। কারণ দেকার্তের মতে কোনো এক নিকৃষ্ট শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আমরা এগুলোকে সত্য মনে করে বসে আছি।

দেকার্তের দৃষ্টি থেকে এটা মোকাবেলা করার উপায় কী? দেকার্ত মনে করেন একটা সত্য আছে যেটা নিয়ে কোনো সংশয়ের সুযোগ নেই। আর সেটা হলো আপন অস্তিত্ব। এটাকে তিনি তার প্রসিদ্ধ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল।' যেহেতু আমি সংশয় করতে পারছি, তার মানে আমি অবশ্যই অস্তিত্বশীল। কারণ সংশয়ের কাজটা আমার অস্তিত্বকে জানান দিচ্ছে। আমি সবকিছুতে সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারি না। কারণ আমি প্রতারিত হতে হলে আমার তো আগে নিজের অস্তিত্ব লাগবে। দেকার্ত এই কথাটা (আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি) দৃঢ় বিশ্বাসের একটা মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করেন। তিনি যে ফলাফলে উপনীত হন সেটা হলো, দৃঢ় বিশ্বাস আনা যায় এমন বিষয় যত কিছু সাব্যস্ত করে, তা সব আমরা পূর্ণ স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। সুতরাং যে বিষয়টা তার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুকে স্পষ্ট দেখার সুযোগ দেয়, সেটাই দৃঢ় বিশ্বাস রাখার বস্তু। আর স্পষ্ট বিষয় হলো সচেতন

৫৮. মাহদী ফাদলুল্লাহ, ফালসাফাতু দেকার্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

মনের অধিকারী ব্যক্তির মনে যা পরিষ্কারভাবে উদ্ভাসিত হয়; যেমনিভাবে চোখের সামনে যেকোনো কিছু স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এ সবকিছু চোখের উপর বেশ ভালোভাবে প্রভাব ফেলে। একটা স্পষ্ট বিষয় অন্যান্য বিষয় থেকে আলাদা। স্পষ্টতার আপেক্ষিকতা এবং সেটার উপর মেটাফিজিক্যাল আপত্তির সুযোগ খণ্ডনের জন্য দেকার্ত একটা মৌলিক অনুমানের আশ্রয় নেন, যার উপর তার দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। আর সেটা হলো স্রষ্টা আমাদেরকে এই অনুমান করা থেকে রক্ষা করেন। অর্থাৎ তার অনুমান ছিল, স্রষ্টা প্রতারণা করেন না। স্রষ্টার অস্তিত্বের বিষয়টা দেকার্তের মতে অবশ্যম্ভাবী এবং সহজাত বিষয়। কারণ স্রষ্টা বলতে বোঝায় শর্তহীন পূর্ণতা সম্পর্কিত ধারণা। আর এই পূর্ণতার নিশ্চয় শর্তহীন কারণ থাকবে। এটা একটা অনুমান-নির্ভর চিন্তা যেটা সহজাত প্রকৃতিতে বিদ্যমান আলোর উপর প্রতিষ্ঠিত। আর বাস্তবে স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে দেকার্ত নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। আমার অস্তিত্ব আমার স্রষ্টার অস্তিত্বকে আবশ্যক করে। আমি যখন মনে করি 'বহির্জগৎ সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা বাস্তবিকেই বহির্জগতের প্রকৃত রূপের সাথে সামঞ্জস্যশীল', তখন আমার চিন্তাটা একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দেয়। অর্থাৎ বাস্তবিকেই আমার চিন্তার সাথে মিলপূর্ণ হয় এমন বহির্জগৎ আছে, এটা কাল্পনিক নয়। এখানে দেকার্তের যুক্তি-প্রমাণের মূল্যায়ন করা আমাদের জন্য জরুরী নয়, আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার চিন্তার পথ ও পন্থা। তিনি শুরু করেছিলেন সামগ্রিক সংশয় দিয়ে, তারপর নিজ সত্তাকে জ্ঞানের একটা 'যৌক্তিক' মাপকাঠি হিসেবে দাঁড় করান, সেটা থেকে স্রষ্টার বাস্তব অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেন, আর স্রষ্টার অস্তিত্বের কারণে আমাদের চিন্তার সত্যতার ব্যাপারে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসের স্বীকৃতি দেন, বিশেষ করে গণিতের ক্ষেত্রে।

দেকার্ত কখনো প্রচলিত ধর্মীয় বৃহৎ ধারণাগুলোর ব্যাপারে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে সংশয় পোষণ করেননি, যেমনটা স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বের উপর নিজের দর্শন স্থাপন করেছেন। (তিনি দৈনন্দিন স্বতঃসিদ্ধ বিষয়গুলোও অস্বীকার করেননি, যেমন আমাদের অস্তিত্ব বা আশেপাশে বিভিন্ন জিনিসের প্রকৃতি, তাহলে তার সংশয়টা তত্ত্বীয় পর্যায়ে সীমিত)। বরং 'দেকার্তের দর্শনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাবক ছিল ধর্ম। যদিও আমরা এটা

না বলি যে, তার দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ধর্মীয় উৎসের অনুগামী।'[৫৯] দেকার্তের সময়ে ধর্ম থেকে আক্বল পুরোপুরি পৃথক হয়ে যায়নি। ধর্মীয় উৎসের সাথে আক্বলের একটা সংযোগ ছিল। 'দেকার্তকে একটা পর্যায়ের সূচনা গণ্য করার চাইতে একটা পর্যায়ের সমাপ্তি হিসেবে গণ্য করা অধিক যুক্তিযুক্ত। তিনি যতটা না আক্বলের দার্শনিক, তার চাইতে বেশি বিশ্বাসের দার্শনিক।'[৬০] কিন্তু দেকার্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে বিচার করার ক্ষেত্রে আক্বল-নির্ভর যে পদ্ধতি পেশ করলেন, সেটা ধর্মের সাথে আক্বলের বিচ্ছিন্নতা গড়ে দিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের উপর যা কিছু দেকার্তে প্রয়োগ করেন, সেগুলো পরবর্তী লোকজন ধর্মের উপর প্রয়োগ করে, যেমনটা আমরা দেখেছি। আর এই দর্শন অনুযায়ী দেকার্ত ইতিহাসশাস্ত্রকে একটা 'জ্ঞান' হিসেবে যৎসামান্যই বিবেচনা করবেন এমনটা স্বাভাবিক, দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করে থাকে এমন জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা তো দূরের বিষয়। কারণ তিনি 'গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিভিত্তিক সূক্ষ্ম জ্ঞান আর মানবীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে আলাদা করে দেখেন। তার মতে ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় জানলে মানুষের স্মৃতিশক্তিকে অপ্রয়োজনীয় ভার বইতে হয়।'[৬১] তাই তিনি বলেন, 'যে গল্পগুলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত বলে গণ্য, সেগুলোর ঘটনাবলি যদি বিকৃত না করা হয় কিংবা পড়ার উপযোগী করার জন্য যদি সেগুলোকে বাড়িয়ে বলা না হয়, তবুও সেগুলোতে প্রায় সবসময় সবচেয়ে নিকৃষ্ট অংশকে বাদ দেওয়া হয়। ফলে ঘটনার বাকি অংশ যেমন থাকা উচিত তেমন থাকে না। যারা এ সকল নমুনা দেখে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে চায়, তারা উপন্যাসের নায়কদের মত ভুলের মাঝে পতিত হবে এবং এমন সব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, যেগুলো তাদের সাধ্যের বাইরে।'[৬২]

---

৫৯. আব্দুল্লাহ ইব্রাহীম, আল-মারকাযিয়্যাতুল গারবিয়্যা, পৃ. ৭২।

৬০. হাসান হানাফী, মুকাদ্দিমাতুন ফি ইলমিল ইস্তিগরাব, আদ-দারুল ফান্নিয়্যা, ১৯৯১, পৃ. ২৫১।

৬১. আত্বিয়্যাত আবুস-সউদ, ফালসাফাতুত তারীখ ইন্দা ফীকু, মানশাআতুল মা'আরেফ বিল-ইস্কান্দারিয়্যা, ১৯৯৭, পৃ. ২৯।

৬২. দেকার্ত, হাদীসুত তরীকা, আল-মুনাযযামাতুল আরাবিয়্যা লিত-তর্জমা, অনুবাদ: উমার আল-শারেনী, পৃ. ৫৫-৫৬।

আর এটা খুব সম্ভব যে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি উদারতা আপন ঐতিহ্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলবে, হোক সেটা আপন ঐতিহ্যের শাখাগত বা মৌলিক বিষয়। দেকার্ত বলেন, 'অন্য যুগের মানুষদের সাথে কথা বলাটা ভ্রমণের মতো। বিভিন্ন জাতির চরিত্র সম্পর্কে কিছু বিষয় জানা উত্তম, যাতে আমরা আমাদের জাতির চরিত্রের ব্যাপারে সঠিক বিচার করতে পারি। আর যাতে আমরা বিশ্বাস না করি যে, আমাদের অভ্যাসের সাথে যা কিছু মিলে না তার সবই আক্কল-বিরুদ্ধ ও তুচ্ছ। কেননা যে মানুষটা (অন্য কোনো জাতির) কিছুই দেখেনি, সে অনেক সময় এমন ধারণা করে বসে।'[৬৩] ইতিহাসের ব্যাপারে দেকার্তের এই ধারণার খণ্ডন করেন দেকার্তের এক একনিষ্ঠ অনুরাগী জাম্বাতিস্তা ভিকো (১৭৪৪ খ্রি.)। তিনি দেকার্তসহ অন্য সংস্কারকদের সমালোচনা করেন, যারা ইতিহাস ও ভাষার মতো মানবিক বিদ্যাসমূহ উপেক্ষা করেছেন এবং গাণিতিক ও জ্যামিতিক পদ্ধতি এমন শাস্ত্রে প্রয়োগের চেষ্টা চালিয়েছেন, যে শাস্ত্রগুলো এ সবকিছুর উপযুক্ত নয়।[৬৪]

মোদ্দাকথা হলো, যেকোনো ইতিহাস বা ঐতিহ্যকে সঠিক বলে গণ্য করার পথে আমাদের সামনে দুটি বাধার সৃষ্টি হয়, সেগুলো হলো:

১) সংশয়ই মূল। দেকার্তের ব্যক্তি-নির্ভর জ্ঞানতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা পদ্ধতিগত একটা প্রতিবন্ধক।

২) জ্ঞান হলো পরীক্ষণ-নির্ভর জ্ঞান। 'জ্ঞান' বলে স্বীকৃতি প্রদানের একমাত্র মাপকাঠি পরীক্ষণ।

৪. ইতিহাসের নিরপেক্ষতার আলোচনা

ঊনবিংশ শতকে বিবিধ সংস্থা ও বিশেষ সাময়িকী প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্য ও ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে ইতিহাসশাস্ত্রের জন্ম হয়। ধর্ম থেকে পৃথক হওয়াটা ছিল আলোকায়নের যুগের মৌলিক একটা প্রভাব। 'ভলতেয়ার বা হিউম যেভাবে ইতিহাসের স্বতন্ত্র দর্শন কল্পনা করেছেন, সেভাবে একজন মানুষের জন্য ইতিহাসের দর্শন কল্পনা করা

---

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৬৪. আতিয়্যাত আবুস-সউদ, ফালসাফাতুত তারীখ ইন্দা ভীকু, পৃ. ২৩-২৪।

সম্ভব। আর এ দর্শন খ্রিষ্টধর্মের যেকোনো প্রভাব থেকে মুক্ত।'[৬৫] এই দর্শন দৃষ্টবাদী চিন্তার মাধ্যমে আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন মানুষের উপর প্রয়োগ করার মাধ্যমে ইতিহাসশাস্ত্র দৃষ্টবাদী চিন্তায় প্রভাবিত হয়।'[৬৬] দৃষ্টবাদী চিন্তা মূলত পরীক্ষণ-নির্ভর চিন্তাপদ্ধতির স্থিত রূপ। জন লক প্রথমে এটা উপস্থাপন করেন, তারপর ডেভিড হিউম। এরপর মানবজীবনে প্রায়োগিক সফলতা ও তথ্যপ্রযুক্তির উপস্থিতি এই ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই চিন্তার মূল কথা হলো মানুষের মন একটা সাদা পৃষ্ঠার মতো। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ এই সাদা পৃষ্ঠাকে ধীরে ধীরে জ্ঞানে পূর্ণ করে। সুতরাং পরীক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনই হলো জ্ঞান। অর্থাৎ চিন্তা হবে বাস্তবতার অনুগামী। এটা দেকার্তের চিন্তার বিরোধী, যিনি মনে করতেন জ্ঞান তা-ই যা চিন্তার সাথে মিলে। কারণ মানুষের মনে স্বতঃসিদ্ধ অনেক কিছু আছে যেগুলো তার কাছে দৃঢ় বিশ্বাসের বিষয়, যেগুলোকে মূল ধরে মানুষের চিন্তার যাত্রা শুরু হয়। ইতিহাসের দর্শনে অভিজ্ঞতা-নির্ভর তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে 'দৃষ্টবাদী ইতিহাসবিদ বিশ্বাস করেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। অর্থাৎ যেটা গণিত ও পরীক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। প্রায়োগিক সকল সমস্যাকে নিছক টেকনিক্যাল সমস্যায় সীমিত করে দেওয়া সম্ভব। ইতিহাসও এমনই একটা শাস্ত্র।'[৬৭] আর তাই তো দৃষ্টবাদী দর্শন চায় ইতিহাসকে এমন শাস্ত্রে পরিণত করতে, যেটা অন্যান্য সাধারণ পরীক্ষণ-নির্ভর শাস্ত্র থেকে ভিন্ন না। 'ইতিহাসশাস্ত্রে শর্তহীন নিরপেক্ষতা' প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু কঠোর নিয়ম-কানুন আরোপ করতে চায়। তন্মধ্যে মৌলিক কয়েকটি হলো:[৬৮]

- ঐতিহাসিক ঘটনা অভিজ্ঞতার মত, যেটাকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে পারদর্শী একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে যাচাই করে। তাই একজন দৃষ্টবাদী

---

৬৫. এতিন গুলসন, রুহুল ফালসাফাতিল মাসীহিয়্যা ফিল-আসরিল ওয়াসীত্ব, মাকতাবাতু মাদবুলী, অনুবাদ: ইমাম আব্দুল ফাত্তাহ ইমাম, পৃ. ৪৪২।

৬৬. আত-তাইমূমী, আল-মাদারিসুত তারীখিয়্যা আল-হাদীসাহ, পৃ. ৮৩।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৬৮. বিস্তারিত শর্তাবলি জানতে দেখুন আবজী মুহাম্মাদের 'আন-নাক্বদুত তারীখী: খুতুওয়াতুহুল মানহাজিয়্যা ওয়াল-কাযায়া আত-তারীখিয়্যা আল-মুহাইকিলা লাহু', আলামুল ফিকর ম্যাগাজিন, সংখ্যা: ১৬৯।

ইতিহাসবিদ নথিপত্র ব্যবহার করবে এবং চারটি ধাপে সমালোচনামূলক কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে ঘটনার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করবে। সেগুলো হলো: তথ্যসূত্র সংকলন, সমালোচনা, ঘটনাবলি সংরক্ষণ এবং নির্দিষ্ট ন্যারেটিভ বা বয়ানের অধীনে ঘটনাবলি বিন্যস্তকরণ।

- দৃষ্টবাদী ইতিহাসবিদ নিজেকে ঘটনাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যেকোনো প্রকার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় পরিচয়ের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিজের আবেগ-অনুভূতিকে একপাশে রাখতে হবে। মূল্যবোধ-নির্ভর কোনো মন্তব্য প্রদান করবে না। দৃষ্টবাদী ইতিহাসবিদকে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত প্রভাব ইতিহাসে ফেলতে দেওয়া যাবে না, ভাষাগত প্রভাব এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টা অগ্রাধিকার পাবে। দৃষ্টবাদী মনোভাবের দাবি হলো, ইতিহাসবিদ অলঙ্কারশাস্ত্র বা রূপক কোনো কিছু ব্যবহার করা এড়িয়ে যাবে; কারণ এর ফলে ইতিহাসে নিরপেক্ষতা থাকবে না। যা ফরাসি দার্শনিক রলাঁ বার্তের ভাষায় 'লিখনীর শূন্য স্তর'-এ থাকবে না।
- দৃষ্টবাদী ইতিহাসবিদ লিখিত নথিকে অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখবে। 'মৌখিক বর্ণনা তথা হৃদয়ে ধারণকৃত আর্কাইভ থেকে সাহায্য নেয়া থেকে বিরত থাকবে।'[৬৯]

দৃষ্টবাদী ইতিহাসবিদ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে এমন এক নির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করবে যেখানে তার মাথা থাকবে সাদা পৃষ্ঠার মতো, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভিন্ন বিবরণ তার মাথাকে ধীরে ধীরে পূর্ণ করবে। কোনো বর্ণনা বা বিবরণের ব্যাপারে সে কোনো ব্যাখ্যা দিবে না। ইতিহাস যেহেতু অতীত হয়ে গিয়েছে, সেহেতু এটার ক্ষেত্রে সরাসরি দৃষ্টিপাত হবে না, বরং পরোক্ষ দৃষ্টিপাত হবে; তবুও ইতিহাসশাস্ত্র তার কিছু দৃষ্টবাদী নিয়ম-নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'অতীতে সংঘটিত বেশ কিছু ঘটনার প্রকৃত চিত্র ফিরিয়ে আনতে'[৭০] সক্ষম যেমনটি বলেছেন দৃষ্টবাদী ইতিহাসের জনক লিওপল্ড ভন রাংকে (১৮৮৬ খ্রি.)। রাংকে বেশ জোর দিয়ে বলেন, 'ঐতিহাসিক গবেষণা অবশ্যই কিছু প্রাথমিক সূত্রের উপর নির্ভর করবে। ইতিহাসবিদ যে সময়কাল পাঠ করছেন, ঐ সূত্রগুলো সে সময়টাকে ফুটিয়ে তুলবে।

৬৯. আত-তাইমুমী, আল-মাদারিসুত তারীখিয়্যা আল-হাদীসাহ, পৃ. ৯২।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

ইতিহাসবিদ ঐ সকল উৎস থেকে কাঁচামাল নিয়ে সমালোচনা ও যাচাই-বাছাই করবেন, যাতে করে অতীতে যেমনটা ঘটেছিল তেমন করে উদঘাটন করার সক্ষমতা অর্জন করেন। ... একজন দক্ষ ইতিহাসবিদের উচিত তার অনুভূতি, ভাবনা ও মন্তব্যকে একপাশে সরিয়ে রাখা। ইতিবাচক বা নেতিবাচক মূল্যায়ন করা থেকে বিরত থাকা। তার ইতিহাস রচনায় বর্তমান বিষয়াবলি বা ভবিষ্যতের আশঙ্কার কথা যেন তিনি ঢুকিয়ে না ফেলেন।"[৭১] ইতিহাসের এমন ধ্যান-ধারণা স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানকে চিত্রিত করে, বাস্তবতা ও চিন্তার মাঝে সমন্বয় ঘটায়। এই চিন্তা-ভাবনার উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট জ্ঞান হলো 'বীরোচিত বিজ্ঞান' (Heroic Science) যেমনটা কিছু ইতিহাসবিদ বলে থাকেন। এখানে নিরপেক্ষতা তার চূড়ায় পৌঁছে। অথবা এটা কোনো প্রকার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি বা পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত থাকে। দার্শনিক থমাস ন্যাগেলের ভাষায় 'স্থানের উর্ধ্বে থেকে প্রত্যক্ষ করা।'

ইতিহাসের এমন তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরপেক্ষতার ব্যাপারে অনেকে সংশয় পোষণ করেছেন। সর্বপ্রথম সংশয় উত্থাপন করেন কার্ল বেকার (১৯৪৫ খ্রি.)। তিনি এমন দৃষ্টিভঙ্গিকে অবাস্তব এবং বাড়াবাড়ি হিসেবে গণ্য করেন, যেটা ইতিহাসের স্বাভাবিক গবেষণা পদ্ধতির সাথে মিলে না। দৃষ্টবাদী দর্শনের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। তিনি মনে করেন, দৃষ্টবাদী ইতিহাসবিদরা যে ঐতিহাসিক সত্যের খোঁজ করছে, সেটা একটা মরীচিকার মতো, যার নাম ইতিহাসবিদরা 'ঐতিহাসিক সত্য' দিতে চাইছে; তারপর আবার দাবি করছে যে এটা আত্মপ্রকাশে সক্ষম। রাংকের বিবরণকে তিনি 'সুন্দর স্বপ্ন' বলে অভিহিত করেন, যেটা বাস্তবে ঘটা সম্ভব না। ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় ইতিহাসবিদের বিশ্বাস যে, সে নিরপেক্ষতার ধাপে পৌঁছে গিয়েছে।[৭২] কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী স্নায়ু যুদ্ধ আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী এই প্রজন্মের উত্থানের পেছনে ঐতিহাসিকভাবে ভূমিকা রেখেছে, যে প্রজন্ম জ্ঞানগত সত্যতার ব্যাপারে সংশয় পোষণ করে।[৭৩]

---

৭১. কাইস মাদী ফারূক, আল-মা'রিফাতুত তারিখিয়্যা ফিল-গার্ব: মুকারাবাত ফালসাফিয়্যা ওয়া-ইলমিয়্যা ওয়া-আদাবিয়্যা, আল-মারকাযুর আরাবী লিল-আবহাস ওয়া-দিরাসাতিস সিয়াসাত, ২০১৩, পৃ. ১৯।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

এটা অবশ্য আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় রেনেসাঁর সময়ে ধর্মের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টির পটভূমির ব্যাপারে। পঞ্চাশের দশক থেকে ইতিহাসের দর্শনে এই দ্বৈততার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়: দৃষ্টবাদিতা ও আপেক্ষিকতা। আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, ইতিহাসের প্রতিটি যৌগিক বিষয় মূলত ইতিহাসের ঘটনাবলি থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাছাইকরণের প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট কাঠামো। এই কাঠামো অতীতে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার বাস্তব কোনো অংশ নয়। বরং বর্তমান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং পূর্বে ধারণকৃত মতের আলোকে একজন ইতিহাসবিদ এটা সৃষ্টি করেন। তাই ইতিহাস হলো বর্তমানের ইতিহাসবিদ এবং অতীতের সত্য হিসেবে যা দাবি করা হয়— এই দুইয়ের মধ্যকার সংলাপ। এই চিরন্তন সংলাপ ইতিহাসকে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে না, এমনটা দৃষ্টবাদীরা দাবি করে। তাদের সংশয় একটা নতুন তত্ত্বের অধীনে বিস্তার লাভ করেছে যার নাম হয়েছে 'ইতিহাসের গঠন তত্ত্ব' (Construction Theory of History), যে তত্ত্ব নিরপেক্ষ দৃষ্টবাদী তত্ত্বের বিপরীত; তত্ত্বটির নাম 'ইতিহাসের আবিষ্কার তত্ত্ব' (Discovery Theory of History)। ইতিহাসের গঠন তত্ত্বের বক্তব্য হলো অতীত ইতিহাসবিদদের রচনা, ইতিহাস গ্রন্থের বাহিরে এর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ অতীতের মধ্যে বাকি আছে কিছু স্মরণিকা, লিখনী ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। আমরা যার নাম দিয়েছি অতীতের ঘটনাবলি, সেটা মূলত অতীতের ঘটনাবলি থেকে বর্তমানে অবশিষ্ট কিছু আলামতের উপর ভিত্তি করে আমরা অতীত নাম দিয়েছি, কেননা সেটাকে আমরা আবিষ্কার করতে পারব না বা কেমন ছিল তা জানতে পারব না। কিন্তু তার মানে কি ইতিহাস রচনার কাজকে অগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা? না, ইতিহাস রচনাকারীরা মনে করেন, ইতিহাসের গঠন তত্ত্বের অনুসারীদের ধারণা ইতিহাসের যেকোনো যুক্তির সত্যতা নির্ভর করে অন্যান্য যুক্তি এবং মৌলিক উৎসসমূহের সাথে এর সামঞ্জস্যতা বা সাযুজ্যতার উপর। দৃষ্টবাদীরা যে দাবি করেন, ইতিহাস সত্য হওয়ার জন্য ইতিহাসবিদের প্রমাণ ও অনুপস্থিত ঐতিহাসিক বাস্তবতার মাঝে সামঞ্জস্য হওয়া লাগবে, এটা সঠিক নয়। গঠনতত্ত্বের অনুসারীদের মতে ইতিহাসবিদের ভূমিকা হলো জ্ঞানের একটা সুসংহত রূপ প্রদান করা, অতীতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় এমন বাস্তবতা উল্লেখ করা নয়। কারণ আমরা অতীত (স্মরণশক্তির মাধ্যমে) সম্পর্কে যা জানি সেটা ঐ অতীত না যা বাস্তবে ঘটেছিল। বরং এটা হলো এমন বিবরণ

যেটাকে আমাদের স্মরণশক্তি আমাদের চিন্তার সক্ষমতার মাত্রা অনুযায়ী তৈরি করে দিয়েছে। কারণ ঐতিহাসিক ঘটনা যেমনটা ঘটেছে, ঠিক হুবহু সেভাবে স্মরণ করতে আমাদের স্মৃতিশক্তি সমর্থ নয়। বরং বাস্তবে যা ঘটেছিল তার একটা অবশিষ্ট চিত্রের উপর ভিত্তি করে অতীত তৈরি করতে সক্ষম। সুতরাং একজন মানুষ যতই স্মরণের চেষ্টা করুক, সে প্রকৃতপক্ষে ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং স্মরণশক্তির উপর নির্ভরশীল ঘটনার মাঝে সামঞ্জস্য করতে (যেটা হিউম এবং দৃষ্টবাদীরা বলে থাকে) পারবে না। কারণ অনুভবযোগ্য বর্তমানে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। আর নিঃসন্দেহে এখানে চিত্রিত করার মৌলিক মাধ্যম হলো ভাষা।[৭৪] বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যশীল উপাদান হিসেবে ভাষার এই কেন্দ্রীয় অবস্থানই উত্তরাধুনিকতা ও বিনির্মাণ তত্ত্বের মূলভিত্তি। মিশেল ফুকো (১৯৮৪ খ্রি.) একটা মৌলিক প্রশ্ন করেন: ইতিহাসের (ব্যাপকভাবে জ্ঞানের) উপর ভাষার প্রভাব কি, যেখানে ভাষা বিশৃঙ্খলভাবে সৃষ্ট একটা সামাজিক জালের মতো? অর্থাৎ যেখানে ভাষা বাস্তবতার বিবরণ যথাযথভাবে দেয় না?[৭৫] আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানের দার্শনিক থমাস কুন (১৯৯৬ খ্রি.) বিজ্ঞানের এমন একটা সামাজিক সংজ্ঞা দিয়েছেন যার মাধ্যমে ইতিহাসশাস্ত্রসহ বহু শাস্ত্রকে 'জ্ঞান' হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টা সংশয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। ইতিহাস ও জ্ঞানের উপর উত্তরাধুনিকতার উপর্যুপরি আক্রমণের পর বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে: জ্ঞানের আক্ষরিক পরিচয়ের আপেক্ষিকতাকে কীভাবে অতিক্রম করা যায়? আরো সাধারণভাবে বলতে গেলে জ্ঞানের আপেক্ষিকতাকে কীভাবে এড়ানো যায়? ইতিহাসের দর্শনের উপর রচিত আধুনিক বইগুলো 'নতুন কিছু ব্যাখা প্রদানের চেষ্টা করে যেগুলো উত্তরাধুনিকতার দাবির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় এবং থমাস কুনের প্রদত্ত জ্ঞানের নতুন সংজ্ঞার সাথে মিলে।'[৭৬] তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা জ্ঞান ও ইতিহাসের (বিশেষ করে হাদীসশাস্ত্রের) একটা পরিচিতি প্রদানের চেষ্টা করব, যেটা আপেক্ষিকতার ধারণাকে অতিক্রম করবে।

---

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-৩৩।

৭৫. মুসলো, দিরাসাহ তাফকিকিয়্যা লিত-তারীখ, পৃ. ১৭০।

৭৬. কাইস মাদী, আল-মা'রিফাতুত তারীখিয়্যা ফিল-গার্ব, পৃ. ৯৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

> আমরা দেখতে পাই কালামবিদ ও উসূলবিদ আলেমরা সবাই একমত যে, খবরে আহাদ দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দেয় না। সুতরাং এর মাধ্যমে আকীদা সাব্যস্ত করা যায় না। মুহাক্কিক আলেমরা মনে করেন এটা আবশ্যক বিষয়, যেটার কোনো কিছু নিয়ে কারো মতভেদ করা ঠিক নয়। আর যারা বলে 'খবরে আহাদ জ্ঞানের ফায়দা দেয়' তাদের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তারা (আলেমগণ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভাবনার অর্থে জ্ঞান অথবা আমল করার আবশ্যকতার জ্ঞান।
>
> \- মাহমুদ শালতূত

ইতিহাসশাস্ত্রে মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো জ্ঞানের বিষয়, যা জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণের সাথে জড়িত। বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ইলমুল কালাম এবং ইসলামী ফিকহের উসূলের কার্যক্রমে এটা স্পষ্ট। বর্ণনা সম্পর্কে প্রতিটা আলোচনায় আমরা দেখতে পাই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও অর্জিত জ্ঞান। তারপর খবরে আহাদের নির্ভরযোগ্যতা এবং এটা জ্ঞানের ফায়দা দিতে কতটা সক্ষম সেটা নিয়ে প্রসিদ্ধ মতভেদ দৃশ্যমান হয়। আমরা এই পরিচ্ছেদে যেটা করেছি সেটা হলো, মুসলিম কালামবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছি এবং এই তত্ত্বীয় দিকের উপর ভিত্তি করে তারা বর্ণনাকে যে ভাগে বিভক্ত করেছে তা তুলে ধরেছি।

ফিকহ এবং উসূলুল ফিকহের সম্পর্ক, ইতিহাস ও ইতিহাসের দর্শনের সম্পর্কের মতো। স্বাভাবিকভাবেই ফিকহ এর আগমন উসূলের আগে হয়েছে। শুরুতে তাবেয়ীরা সাহাবীদের পথে হেঁটেছিল। আল্লাহর কিতাব ও নবীজীর সুন্নাহর পাশাপাশি ইজতিহাদের ভিত প্রতিষ্ঠায় তারা সাহাবীদের ফতোয়াকে গ্রহণ করেছিল। তাই তাদের এমন কোনো মূলনীতির প্রয়োজন

পড়েনি, যেটার উপর ভিত্তি করে শরয়ী উৎস থেকে ফিকহী বিধি-বিধান উদঘাটন করার প্রয়োজন পড়বে। কারণ শরয়ী উৎসগুলো আরবী, আর তারাও আরব। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত হওয়ার ফলে আরব-অনারবের মাঝে যখন মিশ্রণ হলো, তখন আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হয়ে গেল। শরয়ী বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে ধারণার উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা বেড়ে গেল। আহলুল হাদীস ও আহলুর রায়ের মাঝে দ্বন্দ্ব জোরদার হলো। মুজতাহিদরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সে সময়টা দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের এক সুসংহত পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দিল।[৭৭] এমন সময়ে এসে দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষার্ধে ইমাম শাফেয়ীর হাতে উসূলুল ফিকহের ভিত স্থাপিত হলো। ইমাম শাফেয়ীর 'আর-রিসালাহ' এবং তার ফিকহী গ্রন্থগুলো ফিকহের ক্ষেত্রে সালাফের পন্থার অনুসরণের নমুনা। মদীনার ফিকহ, ইরাকের ফিকহ, আরবের লোকজন, আরবী ভাষা, আছারের[৭৮] জ্ঞান— সবকিছুর সমন্বয় ঘটার কারণে ইমাম শাফেয়ী সকল ফিকহী উপাদান থেকে উসূলের একটা তত্ত্বীয় রূপরেখা দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। যেমন- হাদীসের বর্ণনাসমূহের ক্ষেত্রে নবীজীর সুন্নাহ নিঃসন্দেহে উত্তম প্রজন্মগুলোতে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতো (যেমনটা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে নৃতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ দিব)। সুন্নাহ জানার উৎস ছিল আমল এবং সঠিক সনদ। কিন্তু প্রথম প্রথম খারেজী-জাহমীসহ বিভিন্ন কালামী ফের্কার উত্থান ঘটার পর যখন কেউ কেউ পুরোপুরি আছার প্রত্যাখ্যান করা আর কেউ কেউ আছার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মাপকাঠি নিয়ে মতভেদ করা শুরু করল, তখন আহলুল হাদীসের পন্থা অনুযায়ী হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি প্রদান করা জরুরী হয়ে পড়ল। আর সেজন্য ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার পাশাপাশি বিশেষভাবে খবরে আহাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করে বই রচনা করেন। ইমাম শাফেয়ীই ছিলেন ইলমুল হাদীসের পক্ষে লড়াই করা সর্বপ্রথম ব্যক্তি।[৭৯]

---

৭৭. মাহমুদ মুহাম্মাদ আলী মুহাম্মাদ, আল-'আলাকাতু বাইনাল মানত্বিকি ওয়াল-ফিকহি ইন্দা মুফাক্কিরিল ইসলাম, আইন লিদ্দিরাসাত ওয়াল-বুহুসিল ইন্সানিয়্যা ওয়াল-ইজতিমাইয়্যাহ, ২০০০, পৃ. ১৮।

৭৮. আছার বলতে বুঝায় সাহাবী ও তাবেঈদের বিভিন্ন বর্ণনা।

৭৯. এর অর্থ এটি নয় যে আগে বিষয়টি বিতর্কিত ছিল। বরং আহাদ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি ইতোপূর্বে একটি মীমাংসিত বিষয় ছিল। কিন্তু যখন

আবু হিলাল আসকারী বলেন, মুতাযিলা মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসেল ইবন আত্বা (মৃ. ১৩১ হি.) হলেন 'প্রথম ব্যক্তি যিনি মন্তব্য করেন, হক্ব বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানা যায়। যথা- এক. কুরআন, যে বর্ণনার ব্যাপারে সবাই একমত, দুই. আকলী দলীল এবং তিন. ইজমা।'[৮০] কাযী আব্দুল জব্বার বর্ণনা করেন, আত্বা বলেন, 'যে বর্ণনার বর্ণনাকারীরা সবাই একত্রে বসে বানানো অসম্ভব, সেটা প্রমাণ হিসেবে গণ্য। কিন্তু যেটার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর বা বর্ণনাকারীদের জন্য বানিয়ে বলা সম্ভব, সেটা প্রত্যাখ্যাত।'[৮১] মুসলিম কালামবিদদের দ্বারা 'গ্রহণযোগ্য বর্ণনার' মাপকাঠি নির্ণয়ের সবচেয়ে প্রাচীন মন্তব্য এটাই। এই মন্তব্য অনুযায়ী বর্ণনাসমূহকে মুতাওয়াতির এবং আহাদ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, সর্বপ্রথম এই বিভাজন করা হয় অমুসলিমদের সামনে নবুওয়ত এবং মুজিযা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে।[৮২] কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর (২০৪ হি.) সময়ে কিছু কালামবিদ এগুলোকে নবীজীর হাদীসের উপর প্রয়োগের চেষ্টা করে। যদিও এর দ্বারা তৎকালীন কালামবিদদের লক্ষ্য (সরাসরি) সুন্নাহ অস্বীকার করা ছিল না। বরং তারা হাদীস যাচাইয়ের ঐতিহাসিক পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছিল, যেমনটা চতুর্থ অধ্যায়ে আসবে।

ক) ইমাম শাফেয়ী হাদীস-নির্ভর পদ্ধতির উপর উত্থাপিত আপত্তিগুলোর খণ্ডনে ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক নানা যুক্তির সহায়তা নেন।

ঐতিহাসিক যুক্তি ছিল এই যে, মুসলিমরা শরীয়তের এমন বহু বিধি-বিধান জানে, যেগুলো সাহাবীরা সরাসরি নবীজী থেকে দেখে শেখেনি, বরং শুনে বিশ্বাস করে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এর পক্ষে তিনি অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেন। তন্মধ্যে আছে, কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা। সাহাবীরা একজনের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে (নতুন) কাবার দিকে ফিরে যান।

বিরোধিতা আরম্ভ হলো তখন ইমাম শাফেয়ী সেটার পক্ষে কলম ধরেন। এর মাধ্যমে তিনি সালাফদের মতকেই শক্তিশালী করেন।

৮০. আল-আওয়ায়েল, দারুল বশীর (২/১৯১)।

৮১. ফাদলুর ই'তিযাল ওয়া-ত্বাবাকাতুল মু'তাযিলা, পৃ. ২৩৪।

৮২. অর্থাৎ অমুসলিমরা নবুয়ত-মুজিযার মত বিষয়গুলো বিশ্বাস করত না; তাদের খণ্ডন করার জন্য বহু সংখ্যক মানুষের বর্ণনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের সত্যতা নির্ণয় করার কাজে এমন বিভাজন করে কিছু কালামবিদ।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে নবম হিজরী শতকে হজ্জের দায়িত্বে প্রেরণ করেন। সে বছর বহু জাতি-গোষ্ঠীর লোকজন হজ্জে আসে। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেন তাদের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।" "রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র একজনকে পাঠান, কেননা তার মাধ্যমেই প্রেরিত ব্যক্তির কাছে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" যে সাহাবী এমন বর্ণনা শুনতে পান, তিনি কখনো এটা বলেননি, "আপনি মাত্র একজন। আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে যেটা বলেননি, সেটা আপনি আমাদের কাছে চাইতে পারেন না।"[৮৩]

তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের বিভিন্ন কাজ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। "তারা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একজনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদকে দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করতেন, সেটা মেনে নিতেন, সেটার মাধ্যমে ফতোয়া দিতেন। উপরের থেকে এমন একজনের বর্ণনা তারা গ্রহণ করতেন, আবার তাদের নিচেও একজনের বর্ণনাকে গ্রহণ করে নেওয়া হত। কারো জন্য যদি এটা বলা বৈধ হয় যে, প্রাচীন-বর্তমান সব সময় মুসলিমরা খবরে ওয়াহেদকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা এবং সেটাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়ার বিষয়ে একমত ছিলেন— তাহলে আমার জন্য এমনটা বলা বৈধ হতো। কিন্তু আমি বলব, আমার জানা মতে মুসলিম ফকীহরা খবরে ওয়াহেদকে প্রমাণ হিসেবে মেনে নিতে কোনো মতভেদ করেননি।"[৮৪] ঐতিহাসিক যুক্তিতে আরো অন্তর্ভুক্ত হয় খবরে ওয়াহেদের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে ইমাম শাফেয়ী প্রদত্ত সকল নকলী দলীল।

ইমাম শাফেয়ী উত্থাপিত আকলী (বুদ্ধিভিত্তিক) দলীল হলো, আল্লাহ মুসলিমদের জন্য তার নবীর অনুসরণ আবশ্যক করেছেন। এতে অন্তর্ভুক্ত হবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা এবং তৎপরবর্তী যত মানুষ তাকে দেখেনি তারা সবাই। এদিকে তার সুন্নাহ জানার একমাত্র উপায় হলো হাদীসের বর্ণনাসমূহ। সেগুলো গ্রহণ না করলে আমাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ সম্ভব না। আর যেহেতু

---

৮৩. আর-রিসালাহ, তাহকীক: আহমাদ শাকির, পৃ. ৪১৫।

৮৪. পৃ. ৪৫৩।

ফলাফল (অনুসরণের অসাম্ভব্যতা) বাতিল, সেহেতু কারণ (বর্ণনাসমূহ প্রত্যাখ্যান করা)ও বাতিল হবে। এক্ষেত্রে সঠিক বিকল্প হবে বিশুদ্ধ বর্ণনা যাচাইয়ের সঠিক মাপকাঠি প্রণয়ন করা। সেই মাপকাঠিগুলো কী কী?

প্রথমেই ইমাম শাফেয়ী তার দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন, 'জ্ঞানের কয়েকটা রকম আছে। একটা হলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক ব্যাপ্ত করে জানা। আরেকটা হলো বাহ্যিক দিক জানা। উভয় দিক ব্যাপ্ত করে জানার নমুনা হলো আল্লাহর বাণী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন সুন্নাহ যা বহু মানুষ বহু মানুষ থেকে বর্ণনা করেছে। এই দুই পন্থার মাধ্যমেই হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলা হয়। এটা কারো জন্য না জানা বা সংশয়ে পড়া সম্ভব নয়। আর বিশেষ ব্যক্তিদের থেকে বিশেষ ব্যক্তিদের বর্ণনা শুধু আলেমরা জানেন। এর দায়িত্ব অন্যদের দেওয়া হয়নি। এটা সব আলেমের মাঝে বা কিছু আলেমের মাঝে থাকবে। নির্ভরযোগ্য বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে সেই বর্ণনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাবে। যেমন- আমরা দুইজন সাক্ষীর মাধ্যমে কাউকে হত্যার বিধান দিই। এটা বাহ্যত সত্য, যদিও দুই সাক্ষীর ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে।'[৮৫] খবরে ওয়াহেদের ব্যাপারে শাফেয়ী আরো কিছু শর্ত প্রদান করেন (যেগুলো তৎকালীন আহলুল হাদীসের মাঝে কার্যত প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত হত) যাতে করে একটা বর্ণনা সঠিক হয় এবং সেটা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যায়। সে রকম কিছু শর্ত হলো:

১. বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হবে, কথাবার্তার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ হতে হবে।

২. বর্ণিত বিষয়টা বর্ণনাকারীকে বুঝতে হবে। হাদীসকে অর্থ দিয়ে বর্ণনা করলে জানতে হবে হাদীসের অর্থ বদলে যায় এমন শব্দাবলির বিবরণ। যদি না জানে কীসের মাধ্যমে অর্থ বদলে যায়, তাহলে হাদীস যেমন শুনেছে তেমনিভাবে হুবহু বর্ণনা করবে।

৩. স্মৃতি থেকে বর্ণনা করলে অবশ্যই মুখস্থ হতে হবে, আর নিজের লিখিত গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করলে সেই গ্রন্থ মুখস্থে থাকতে হবে।

---

৮৫. পৃ. ৪৭৬।

৪. হাফেযদের সাথে একই বিষয় বর্ণনা করলে তাদের বর্ণনার থেকে তার বর্ণনা ভিন্ন হওয়া যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কিছু বর্ণনা করবে না যেটা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা অন্যভাবে বর্ণনা করে।

৫. মুদাল্লিস হবে না, অর্থাৎ যার সাক্ষাৎ পেয়েছে তার থেকে এমন কিছু বর্ণনা করবে না যা সে শোনেনি।

৬. সকল বর্ণনাকারীর মাঝে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে।

৭. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা হতে হবে।[৮৬]

আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমাম শাফেয়ী ঐ সকল বর্ণনার জন্য কোনো শর্তারোপ করেননি যেগুলো বহু মানুষ বহু মানুষ থেকে বর্ণনা করে। কিন্তু সেগুলোর তিনি শুধু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন- যোহর চার রাকাত বা মদ হারাম। আর ইমাম শাফেয়ীর কাছে জ্ঞানের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয় দৃঢ় বিশ্বাস আনার মতো বিষয় এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এমন বিষয়, যেমন: খবরে ওয়াহেদ। (এ অংশটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবে বইয়ের শেষভাগে, যেখানে আরবদের দৃষ্টিতে জ্ঞানের সংজ্ঞা বর্ণনা করব।)

খ) শাফেয়ীর পর থেকে উসূলবিদরা খবরকে মুতাওয়াতির ও আহাদে বিভক্ত করে চলেন। তারা মনে করেন 'মুতাওয়াতির' হলো ইমাম শাফেয়ী যেটার নাম দিয়েছেন 'বহু মানুষ থেকে বহু মানুষের বর্ণনা'। আর 'খবরে আহাদ' হলো যেটাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'বিশেষ ব্যক্তিদের থেকে বিশেষ ব্যক্তিদের বর্ণনা'। এরপর উসূলবিদরা মুতাওয়াতিরের অনেক সংজ্ঞা দিয়েছেন যেগুলো মুতাওয়াতিরের শর্তাবলিকে ধারণ করে। আমরা তার মধ্যে একটা সংজ্ঞা উল্লেখ করছি। সেটা হলো: 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে একদল লোকের বর্ণনা, যাদের জন্য স্বাভাবিকভাবে মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়া কঠিন।'[৮৭] অতিরিক্ত কিছু শর্তের ব্যাপারে মতভেদ

---

৮৬. নু'মান জুগাইম, মাদখাল ইলাা মাযহাবিশ শাফেয়ী, আল-জামেয়াতু ইসলামিয়্যাহ বি-মালিযিয়া, পৃ. ৯৪।

৮৭. শারহু তানকীহিল ফুসূল ফী ইখতিসারিল মাহসূল ফিল-উসূল, তাহকীক: ত্বাহা আব্দুর রউফ সাদ, পৃ. ৩৩৭।

করলেও মোটামুটি সবাই একমত যে, মুতাওয়াতির দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দেয়। 'দূরবর্তী বিভিন্ন স্থান যেমন- মক্কা, মিশর, বাগদাদ, হিন্দ ও চীন এবং বিগত জাতিসমূহ যেমন- নূহ, ইব্রাহীম, হুদ, সালেহসহ বহু জাতির অস্তিত্ব আমাদের কাছে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা জানিনি, আক্কলের মাধ্যমেও না। আমরা এটা জেনেছি বহু সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে; সুতরাং বোঝা গেল মুতাওয়াতির জ্ঞানের ফায়দা দেয়।'[৮৮] উসূলের বইগুলো অনেক প্রাচীন অদ্ভুত মতামত উল্লেখ করেছে (যেমন- শ্রমণ, ব্রহ্ম) এমন কিছু সম্প্রদায়ের, যারা মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে জ্ঞানের ফায়দা পাওয়ার বিষয়টা অস্বীকার করেছে। অথবা 'তারা বর্তমান যুগে দূরে অবস্থিত বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাপারে বহু সংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণ করলেও অতীত হয়ে যাওয়া জাতিসমূহের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে গ্রহণ করেনি'[৮৯] এবং দুটোকে ভিন্নভাবে দেখেছে। তারা প্রথমটা স্বীকার করেছে আর দ্বিতীয়টা অস্বীকার করেছে। উসূলবিদরা তাদের খণ্ডন করেছে এবং বলেছে যে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক প্রত্যাখ্যাত। এই আপত্তিগুলোর জবাব উসূলবিদরা কীভাবে দিয়েছেন সেটা আমাদেরকে কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

সংক্ষেপে বললে মুতাওয়াতির বর্ণনার ব্যাপারে উসূলবিদদের জবাবগুলো ছিল এই সংশয়গুলোর বিপরীতে অবস্থিত জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্তগুলো উপস্থাপন করা। এমন কিছু প্রসিদ্ধ সংশয় হলো:

(১) যুক্তিবিদ্যায় দৃঢ় বিশ্বাসের স্তর এবং মুতাওয়াতিরে দৃঢ় বিশ্বাসের স্তর ভিন্ন। যুক্তিবিদ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস মুতাওয়াতিরের দৃঢ় বিশ্বাস থেকে শক্তিশালী। যে কারণে মুতাওয়াতিরের থেকে সৃষ্ট দৃঢ় বিশ্বাসে আপেক্ষিকভাবে সংশয় সৃষ্টি হয়। মুতাওয়াতির থেকে সৃষ্ট জ্ঞানের ব্যাপারে পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমেদী বলেন, 'মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে যদি আবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জিত হতো, তাহলে বহু সংখ্যক

---

৮৮. শারহু মুখতাসারির রাওদ্বাহ, তাহকীক: তুর্কী, ২/৭৫।

৮৯. সফিউদ্দীন আল-হিন্দী, নিহায়াতুল উসূল ফী দিরায়াতিল উসূল, তাহকীক: সালেহ ইবন সুলাইমান ও সাদ ইবন সালেম, ৭/২৭১৬।

বর্ণনাকারীর মাধ্যমে আমরা যে কয়েকজন রাজার অস্তিত্ব জেনেছি সেটার ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান; আর অস্বীকৃতি ও সাব্যস্তকরণের ভিন্নতা, দুই বিপরীত বিষয় একত্র হওয়ার অসম্ভাব্যতা এবং একই দেহ উভয় স্থানে থাকার অসম্ভাব্যতার ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান— এই দুই জ্ঞানের মাঝে স্তরের ক্ষেত্রে ভিন্নতা হতো না। কারণ আবশ্যকীয় বিষয়গুলো ভিন্ন হয় না।'[৯০]

যিনি আপত্তি তুলেছেন, তিনি 'শক্তিশালী নিশ্চয়তার অস্তিত্ব নাকচ করেন না, যেটা অধিকাংশের মতে দৃঢ় বিশ্বাসের চাইতে আলাদা করা কঠিন। কিন্তু কথা হলো দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে নাকি হয়নি সেটা নিয়ে। দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্জিত হয়নি, সেটার পক্ষে প্রমাণ হলো আমরা যদি 'এক হচ্ছে দুইয়ের অর্ধেক' এ কথাটা আমাদের আক্কলের সামনে পেশ করি, আবার আমাদের আক্কলের সামনে বহু সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে চিকিৎসক গ্যালেন, অমুক-তমুকের অস্তিত্ব পেশ করি; তাহলে দেখতে পাব প্রথমটার ব্যাপারে যে দৃঢ় প্রত্যয় পাওয়া যাবে, দ্বিতীয়টার ব্যাপারে তেমন দৃঢ় বিশ্বাস আসবে না। এই পার্থক্য প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয়টার বিশ্বাসে 'সম্ভাব্যতার' স্থান আছে। আর এই সম্ভাব্যতার অস্তিত্ব থাকায় এটা দৃঢ় বিশ্বাসের গণ্ডির বাহিরে চলে গিয়েছে।'[৯১] উসূলবিদরা মেনে নেননি যে, 'যদি এটা আবশ্যকীয় জ্ঞানের নিশ্চয়তা দিত, তাহলে এটার সাথে অন্যান্য আবশ্যকীয় জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদানকারী বিষয়ের পার্থক্য হতো না। কারণ আবশ্যকীয় জ্ঞানের বিষয়গুলো নিশ্চিতভাবে বলার ক্ষেত্রে স্তরভেদ থাকে। আর যদি মেনে নেয়া হয়, তবুও কাম্য বিষয়টা আবশ্যক হয়ে যায় না। কারণ তারতম্য থাকলে সেটা আর আবশ্যকীয় জ্ঞান দেয় না, কিন্তু তারতম্য থাকলে জ্ঞানের ফায়দা দেয় না এমনটা নয়; যেটা নিয়ে এখানে মতভেদ চলমান।'[৯২]

---

৯০. আল-আমেদী, আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম, তাহকীক: আব্দুর রায্যাক আফীফী (২/১৬)।

৯১. আর-রাযী, আল-মাহসূল, তাহকীক: ত্বাহা জাবের আলওয়ানী (৪/২২৯)।

৯২. আল-আসফাহানী, বায়ানুল মুখতাসার শারহু মুখতাসারি ইবনিল হাজিব, তাহকীক: মুহাম্মাদ মাযহার বাকা (১/৬৪৪)।

কিন্তু বাস্তবে বহু উসূলবিদ আছেন যারা আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর মাঝে তারতম্য স্বীকার করেন না। তাই যিনি তারতম্য নাকচ করেন তাঁর জবাব হলো 'কিছু প্রতিজ্ঞা খুব বেশি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ধারা বেশি কল্পনায় আসে। সুতরাং আকল অন্যান্য প্রতিজ্ঞার তুলনায় কিছু প্রতিজ্ঞায় খুব বেশি অভ্যস্ত হয়ে যায়।'[৯৩] অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ যৌক্তিক বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পাওয়া যায়, একইভাবে মুতাওয়াতির বর্ণনার ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। তারতম্য নির্ভর করে ব্যবহারের কম-বেশির উপরে। যুক্তিবিদ্যার প্রতিজ্ঞাগুলো মুতাওয়াতির বর্ণনার চাইতে বেশি ব্যবহৃত হয়। যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে আবশ্যকীয় জ্ঞানের নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত প্রতিজ্ঞাসমূহের ব্যাপারে যা বলা হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাই বলা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো মুতাওয়াতির বর্ণনার চাইতে বেশি দৃঢ় বিশ্বাস আমাদেরকে দেয়, কেননা সেগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়।

এই আপত্তির খণ্ডনে এটাও বলা যায় যে, মুতাওয়াতিরের সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানকে এই আপত্তিকারী স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য করেছে; বাস্তবে তা নয়। আপত্তি তখনই সঠিক হবে 'যখন আমরা দাবি করব যে মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে তা নয়; বরং আমরা তো শুধু স্বাভাবিক জ্ঞানের ফায়দা দেওয়ার কথা বলছি।'[৯৪]

(২) সংখ্যা কত হলে একটা বর্ণনা মুতাওয়াতির হবে? যারকাশী বলেন, মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য সংখ্যার শর্ত হলো 'বর্ণনাকারীর পরিমাণ এত হবে যে সবার জন্য একত্র হয়ে মিথ্যা রচনা করা অসম্ভব হবে। আলামত, ঘটনা ও বর্ণনাকারীদের ভিন্নতা অনুসারে সেটা হবে। কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় এটাকে বেঁধে ফেলা যাবে না। বরং এতটুকু শর্ত যথেষ্ট। কেউ কেউ বলেন, তাদের সার্বিক অবস্থা এমন হবে যে তাদের মত লোকজনের দ্বারা একত্রে মিথ্যা বলা বা ভুল বলা সম্ভব না। এটা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু মতভেদ হলো, এখানে কোনো সংখ্যা শর্ত কিনা? অধিকাংশের মত হলো সংখ্যার সীমাবদ্ধতা নেই। জ্ঞান অর্জিত হওয়াটাই এখানে নির্ণায়ক। এই পরিমাণ লোকজন যখন জানাবে এবং

৯৩. তকীউদ্দীন সুবকী, আল-ইবহাজ ফী শারহিল মিনহাজ (২/২৬৮)।
৯৪. আমেদী, আল-ইহকাম (২/১৮)।

এদের বর্ণনা যখন জ্ঞানের ফায়দা দিবে তখন আমরা বুঝব এটা মুতাওয়াতির, নতুবা নয়।'[৯৫]

(৩) একটা প্রজন্মের জন্য ভুল করা সম্ভব। অর্থাৎ যে প্রজন্ম তাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে মূল বক্তব্য প্রদানকারীকে দেখেছে। 'কারণ হয়তো তাদের কাছে বিষয়টা ঘোলাটে লেগেছিল। অনেক সময় ইন্দ্রিয় বিভ্রান্ত করে। আল্লাহ তা'আলা যায়েদের পূর্ণ আকৃতিতে কাউকে সৃষ্টি করতে পারেন। সে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মুতাওয়াতিরের নির্ভরযোগ্যতাও থাকে না। কারণ তারা হয়তো যায়েদের মতো কাউকে দেখে যায়েদ মনে করেছিল।' এছাড়া চোখের দেখায় ভুল 'খুবই প্রসিদ্ধ বিষয়। মানুষ কখনো স্থির বিষয়কে নড়তে দেখে, আবার নড়াচড়া করা জিনিসকে স্থির দেখে। সুতরাং বোঝা গেল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েও সংশয়-বিভ্রান্তি স্বাভাবিক।' যদি বলা হয়, 'এটা খুব কম ঘটে।' তাহলে বলা হবে, 'কম হলেও সম্ভাব্যতা বাতিল হয় না।'[৯৬]

উক্ত মৌলিক সংশয়কে রাযী উল্লেখ করেছেন গবেষণার প্রয়োজনে। মুতাওয়াতির বর্ণনা জ্ঞানের ফায়দা দেয়— এই কথার খণ্ডনে না। যদিও তিনি এমন কিছু সংশয়ের জবাব দেওয়া সম্ভব কিনা সেটার ব্যাপারে নিজেই সন্দেহ পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'এই সকল আপত্তির অকাট্য জবাব তখনই দেওয়া সম্ভব হবে, যখন সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা-ভাবনা চালানো হবে।'[৯৭] ক্বারাফী এটার জবাব দিয়ে বলেন, 'এটা যে আমার ছেলে, সেই জ্ঞানটা আমার অর্জিত হয়েছে। আমি তাকে আগে দেখেছি। এখন বুদ্ধিভিত্তিক সম্ভাবনা উপস্থাপন করে সংশয় তুললেও স্বাভাবিক অর্জিত জ্ঞানকে নাকচ করবে না।' তিনি আরো বলেন, 'স্বাভাবিক জ্ঞানকে বিভিন্ন বুদ্ধিভিত্তিক সম্ভাবনা নাকচ করে না।'[৯৮] সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েও বিভ্রান্তি থাকতে পারে, এমন ধারণা 'মিথ্যায় একত্র হওয়ার অসম্ভাব্যতার' শর্তকে ভুল বোঝার ফলাফল। এই 'অসম্ভাব্যতা' বাস্তবিক, যুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল অসম্ভাব্যতা নয়।

৯৫. আল-বাহরুল মুহীত্ব ফী উসূলিল ফিকহ, দারুল কুতুবী (৬/৯৬)।
৯৬. রাযী, আল-মাহসূল (৪/২৪৫)।
৯৭. প্রাগুক্ত (২৫৭)।
৯৮. ক্বারাফী, নাফায়েসুল উসুল (৬/২৮৩৬)।

(৪) **রাজনৈতিক কারণে এক বিপুল সম্প্রদায় মিথ্যার উপর একমত হতে পারে, সেটা শাসকের প্ররোচনায় বা হুমকিতে। জুয়াইনী এই যুক্তির খণ্ডন করেন ঐতিহাসিক আদত তথা অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে। তিনি বলেন, 'উরফের (প্রথার) কারণে তাদের মিথ্যা সময়ের পরিক্রমায় প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং খুব দ্রুত সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে।'[৯৯] অন্যদিকে আমেদী এমন বর্ণনাকে জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করতে নারাজ। কারণ এর বর্ণনাকারীরা 'মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে, সুতরাং এদের বর্ণনা দিয়ে জ্ঞান প্রাপ্তি অসম্ভব, কেননা একটা শর্ত অনুপস্থিত আর সেটা হলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে খবর প্রদান।'[১০০] এখান থেকে স্পষ্ট হলো উসূলবিদরা মুতাওয়াতির বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে গাণিতিক বা নিছক বুদ্ধিভিত্তিক (আকলী) জ্ঞানের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে স্বাভাবিক ও জরুরী জ্ঞানের উপর নির্ভর করেছিল।**

উল্লেখ্য বিষয় হলো, শ্রমণ সম্প্রদায়ের উত্থাপিত সংশয়ের খণ্ডনে জুয়াইনীর স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। তিনি 'বর্ণনা' বলতে বুঝেন বহু মানুষের সম্মিলিত বর্ণনা (আভিধানিক অর্থ)। অর্থাৎ কালামবিদ্যার জ্ঞানতাত্ত্বিক নানা শর্ত ছাড়াই। জুয়াইনী বলেন, 'শ্রমণদের থেকে কেউ কেউ বর্ণনা করেন যে তাদের ভাষ্য হলো, বর্ণনা কখনো এমন স্থানে গিয়ে সমাপ্ত হয় না যেটা সত্য সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। তাদের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া যায় যে, বর্ণনাকারীর সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন সেটা ততক্ষণ সত্য হবে না যতক্ষণ তাতে অন্য আলামত যুক্ত না হয়, যেমন প্রতিবন্ধকের অনুপস্থিতি।'[১০১]

গ. জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্তাবলির ভিত্তিতে মুতাওয়াতির বর্ণনা যদি জ্ঞানের ফায়দা দেয় এবং এ ব্যাপারে কালামবিদরা একমত থাকে, তাহলে সেটা জ্ঞানের কোন প্রকার? এটা কি অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান নাকি অভিজ্ঞতালব্ধ

---

৯৯. আল-বুরহান ফী উসূলিল ফিকহ, তাহকীক: সালাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উয়াইদ্বাহ (১/২২৪)।

১০০. আমেদী, আল-ইহকাম (২/২৮)।

১০১. আল-বুরহান (১/২২০)।

জ্ঞান? আমেদী বলেন, 'অধিকাংশ ফকীহ এবং কালামবিদ আশ'আরী ও মুতাযিলা একমত যে, মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানটা অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞান। অন্যদিকে কা'বী এবং মুতাযিলাদের আলেম আবুল হুসাইন আল-বসরী ও শাফেয়ীর অনুসারী দাক্কাক মনে করেন, এটা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।'[১০২] অধিকাংশের মত শক্তিশালী 'কেননা যদি মুতাওয়াতিরের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা লাগত, তাহলে অনুসন্ধান করার যোগ্যতা যাদের নেই, তাদের জন্য সেটা অর্জন করা সম্ভব হতো না। যেমন- বালক এবং আম জনতা। কিন্তু নিঃসন্দেহে তাদের মাঝে এই জ্ঞান থাকে।'[১০৩]

নিরপেক্ষ বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে চিন্তা না করে এর বাহিরে গিয়ে যারা চিন্তা করে, তারা মক্কা, শাফেয়ীসহ মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত বহু কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে। আর আত্মগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 'প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি মক্কা, বাগদাদসহ দূরবর্তী বহু স্থানের ব্যাপারে মুতাওয়াতির বর্ণনার ভিত্তিতে বিশ্বাস করে। যদিও সে পূর্ব থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন শাস্ত্রের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী চিন্তা বা অনুসন্ধান না চালায়; যদি এই জ্ঞানটা অভিজ্ঞতালব্ধ হত, তাহলে তো এমনটা ঘটত না।'[১০৪]

মুতাওয়াতির যে 'অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের' ফায়দা দেয়, সেটার পক্ষে থাকা স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির যুক্তি হলো— 'দলীল প্রদানের অর্থ হলো কোনো জ্ঞান জানার মাধ্যমে অন্য জ্ঞানে পৌঁছানো। কোনো কিছুর অস্তিত্ব যখন এই ধারাবাহিকতার উপর নির্ভর করবে, তখন সেটা 'অর্জিত জ্ঞান' বলে গণ্য হবে। মুতাওয়াতির বর্ণনার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানও অভিজ্ঞতালব্ধ। কেননা আমরা এটা জেনেছি যখন বুঝেছি বর্ণনাকারী নিজের মত প্রদান করেননি, বরং এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মত প্রদান করেছে যা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। আবার তাকে মিথ্যার দিকে ধাবিত করবে এমন কোনো প্রভাবক ছিল না; সুতরাং এটা মিথ্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর যেহেতু মিথ্যা হবে না, সেহেতু সত্য হবে। উপর্যুক্ত কোনো পদক্ষেপে ঘাটতি থাকলে বর্ণনার

১০২. আমেদী, আল-ইহকাম (২/১৮)।
১০৩. প্রাগুক্ত (২/১৮)।
১০৪. প্রাগুক্ত (২/২০)।

সত্যতা আমরা জানতে পারতাম না। আর এভাবে জানার পদ্ধতিকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হিসেবে মেনে না নিলে সেটা অর্থহীন কথা হবে।'[১০৫] অর্থাৎ মুতাওয়াতির 'দলীল প্রদানের উপর নির্ভর করে।'[১০৬] জুয়াইনী আবারও এই মতটাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি কা'বীর মতটি প্রযোজ্য হবে কোনো একটা রাজনৈতিক অঞ্চল সাব্যস্ত করা বা নাকচ করার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালানোর ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর আধিক্যের সময়। লোকটা তত্ত্বীয় অনুসন্ধান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা চালানোর ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা ও ফলাফলকে গুরুত্বে নেয়নি। সে যা উল্লেখ করেছে তাই সত্য।'[১০৭] এ বক্তব্য অনুযায়ী যিনি মুতাওয়াতির জ্ঞানকে তত্ত্বীয় মনে করেন তিনি নাকচ করেন না যে, আম জনতা মুতাওয়াতির বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়কে দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করে। কিন্তু তিনি বলেন যে, বর্ণনার ব্যাপারে তাদের অনুসন্ধানটা 'ভূমিকা ও মাধ্যম ব্যবহার করে নয়, বরং স্বাভাবিক কারণসমূহ বাস্তবায়িত হয় কিনা সেটা বুঝতে পারা।'[১০৮] অর্থাৎ **এটা যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে চোখ বুলানোর মত, জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্তাবলি বিবেচনার মত নয়।** আর আমেদী এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি।[১০৯] মোটাদাগে সমস্যাটা হলো **প্রায়োগিক দিক থেকে এখানে কোনো দলীল পেশ করা হয়নি, কিন্তু মুতাওয়াতিরের শর্ত বাস্তবায়ন করতে হলে কিছুটা অনুসন্ধান চালাতে হয়। কারণ শর্তগুলো জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বভাবতই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করার মত বিষয়।**

গাযালী চেষ্টা করেছেন জমহুরের সাথে মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে জ্ঞানকে 'অভিজ্ঞতালব্ধ' বলে এমন পক্ষের সমন্বয় করা। তিনি মুতাওয়াতিরের জ্ঞানকে যারা অভিজ্ঞতালব্ধ মনে করেন তাদের মতের সাথে তিনি তার উস্তায জুয়াইনীর মত আচরণ করেছেন। তবে আমি মনে করি তিনি ভিন্ন একটা মত দিয়েছেন। যদিও কিছু কিছু উসূলবিদ –ফখর রাযী– মনে করেন

---

১০৫. প্রাগুক্ত।

১০৬. আল-বাহরুল মুহীত্ব ফী উসূলিল ফিকহ (৬/১০৫)।

১০৭. আল-বুরহান (২২১)।

১০৮. ইবনুত তিলমেসানী, শারহুল মা'আলিম ফি উসূলিল ফিকহ, আলামুল কুতুব, বৈরূত (২/১৫৩)।

১০৯. আমেদী, আল-ইহকাম (২/২২)।

তিনি মুতাওয়াতিরের জ্ঞানকে 'অভিজ্ঞতালব্ধ' বলার পক্ষে। গাযালী জমহুরের মতই মনে করেন যে, মুতাওয়াতির বর্ণনা অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের ফায়দা দেয়। তার দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতাপূর্ব স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হলো 'এমন বিষয় যেটা করতে আমরা বাধ্য হই। আমরা আবশ্যকীয়ভাবে বুঝে নিই যে, আমরা এটা মানতে বাধ্য।'[১১০] কিন্তু যেহেতু মুতাওয়াতির স্বাভাবিক অসম্ভাব্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত সেহেতু মুতাওয়াতির বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে অবশ্যই আমাদের একটা মাধ্যম লাগবে। আমরা নিজ চোখে ইমাম শাফেয়ীকে দেখিনি। কিন্তু তার কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমাদের মাধ্যমটা বড় অর্থে 'পরীক্ষণের' অন্তর্গত। আমি প্রথমে নিজ কানে প্রথম বর্ণনাকারীর থেকে তার সম্পর্কে একটা খবর শুনি, তারপর দ্বিতীয় বর্ণনাকারী থেকে আরেকটা খবর শুনি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে এটা 'অভিজ্ঞতার' পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু মুতাওয়াতিরের ক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা কেবল আমাদের প্রজন্মের লোকজনের সাথে হয়ে থাকে। আর পরোক্ষভাবে যে প্রজন্মের লোকজনের মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত ঘটনাটা দেখেছে, তাদের সাথে হয়ে থাকে। গাযালী যেটা যোগ করেন সেটা হলো, মুতাওয়াতিরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে যদিও সেটা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের ফায়দা দেয়, তবুও সেটা দলীল প্রদানের দিক থেকে দূরবর্তী। সুতরাং এখানে একটা ভূমিকা প্রয়োজন যেটা থেকে আমরা প্রাথমিক জ্ঞান উদঘাটন করব, যদিও এই ভূমিকাটা কঠিন হওয়ায় আমরা অনুধাবন করতে না পারি। গাযালী বলেন, 'অভিজ্ঞতা কখনো দৃঢ় বিশ্বাসের ফয়সালা দেয়, কখনো আধিক্যের মতের উপর ফয়সালা দেয়। দর্শনীয় বিষয়ের সাথে অবশ্যই কোনো না কোনো উহ্য কিয়াসী শক্তি থাকে। সেটা হলো যদি বিষয়টা ঐকমত্যপূর্ণ হয় কিংবা আপতিত ও অনাবশ্যক হয়ে থাকে; তাহলে মতভেদ ছাড়া এতগুলো ক্ষেত্রে চলমান থাকত না। যেহেতু এই আবশ্যকতা পাওয়া যায়নি, সেহেতু মানবাত্মা এটাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং বিরল হিসেবে গণ্য করেছে। আর এর জন্য একটা অস্থায়ী কারণ ও প্রতিবন্ধক খুঁজে নিয়েছে। এই অনুভূতি যদি বারবার আসতে থাকে এবং সংখ্যায় এটাকে সুসংহত করা না যায়, যেমনিভাবে মুতাওয়াতিরের বর্ণনাকারীদের সংখ্যাকে সুসংহত করা যায় না, তাহলে প্রত্যেকটা ঘটনা একজন সংবাদদাতা সাক্ষীতুল্য। এর সাথে যদি যুক্ত হয় কিয়াস, তাহলে মানবাত্মা বিশ্বাস করতে

১১০. মুস্তাসফা, তাহকীক: মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আব্দুশ শাফী (পৃ. ১০৭)।

বাধ্য হয়।'[১১১] খেয়াল করুন, গাযালী এখানে **উহ্য ভূমিকার** দিকে লক্ষ্য করেছেন। মুতাওয়াতির হলে সেক্ষেত্রে দুটি ভূমিকা তিনি উহ্য রেখেছেন, 'প্রথমটা হলো, বর্ণনাকারীদের অবস্থা ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা এবং সংখ্যাধিক্যের ফলে মিথ্যার উপর তাদের একত্র হওয়া সম্ভব নয়। তারা সত্যের উপর একমত হবেই। দ্বিতীয়টা হলো, তারা সবাই এই ঘটনা বর্ণনার ব্যাপারে একমত।'[১১২] তবে বাস্তবে অধিকাংশ মন্তব্যকারী মুতাওয়াতিরের ক্ষেত্রে গাযালীর এই তত্ত্বে 'অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের' অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করেননি। আব্দুল করীম নামলাহ বলেন, 'এর উত্তরে বলা যাবে যে এটা দুর্বল। কারণ এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, সেটা ফিতরায়[১১৩] শুরু থেকে বিদ্যমান। এর জন্য খুব বেশি চিন্তা-ফিকিরের প্রয়োজন নেই। এমন জিনিসকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বলা ঠিক হবে না। কারণ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সেটাই, যেটার জন্য অনুসন্ধান করার যোগ্যতা লাগে। আর এটা তেমন নয়।'[১১৪]

ঘ- খবরে আহাদ: যেহেতু মুতাওয়াতির দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দেয়, সেহেতু স্বাভাবিকভাবে কালামবিদরা খবরে আহাদের ক্ষেত্রে বিপরীতটাই বলবে। বাকিল্লানী বলেন, বর্ণনা দুই প্রকারের: 'এমন মুতাওয়াতির যেটা জ্ঞানকে আবশ্যক করে এবং ওজর বাতিল করে। আর এমন আহাদ যেটা আবশ্যকীয়ভাবে হোক কিংবা দলীলের উপর ভিত্তি করে, কোনোভাবেই জ্ঞানকে আবশ্যক করে না।'[১১৫] তিনি বলেন, 'যে সকল খবরের মাধ্যমে জ্ঞান আবশ্যক হয় না সেগুলোকে ফকীহ এবং কালামবিদরা খবরে ওয়াহেদ নাম দিয়েছে। হোক সেটা একজনের বর্ণনা কিংবা একজনের চাইতে বেশি। এই খবর জ্ঞানকে আবশ্যক করে না, যেমনটা আমরা শুরুতে বলেছি। তবে আমলকে আবশ্যক করে।'[১১৬] ফকীহদের কাজের ব্যাপারে বাকিল্লানীর

---

১১১. মি'ইয়ারুল ইলম ফি ফান্নিল মান্তিক, তাহকীক: সুলাইমান দুনইয়া, ১৯০।
১১২. আল-মুস্তাসফা (১০৬)।
১১৩. অর্থাৎ মানব প্রকৃতিতে।
১১৪. আল-মুহায্যাব ফী ইলমি উসূলিল ফিকহিল মুক্বারান, মাকতাবাতুর রুশদ (২/৬৫৫)।
১১৫. আত-তাক্বরীব ওয়াল-ইরশাদ, তাহকীক: আব্দুল হামীদ ইবন আলী আবু যুনাইদ (৫২৭)।
১১৬. তামহীদুল আওয়ায়েল ওয়া-তালখীসুদ্দালায়েল (পৃ. ৪৪১-৪৪২)।

সংকলন সঠিক নাকি ভুল সেটার চাইতে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো কালামবিদদের ব্যাপারে তার মন্তব্য।

মুতাওয়াতির এবং আহাদ যে দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দেয়, সেটার বিপরীতে আরেকটা তত্ত্ব আছে সেটা হলো খবর আহাদ থেকে পৃথক বিভিন্ন আলামতকে বিবেচনায় নেয়া; যেহেতু মুতাওয়াতিরের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিবেচ্য বিষয়ের সাথে আহাদও মিলে যায়। জুয়াইনী উল্লেখ করেন নায্‌যামের সূত্রে, যার বক্তব্য হলো, 'খবরে আহাদও আবশ্যকীয় জ্ঞানের ফায়দা দিতে পারে।'[১১৭] আর অবশ্যই এটা প্রাসঙ্গিক আলামতের সাহায্যে। জুয়াইনী তার উসূলী চিন্তায় প্রাসঙ্গিক আলামতের ভূমিকাকে মুখ্য হিসেবে দেখেন।[১১৮] তিনি এই মূলনীতিকে সঠিক বলে গণ্য করেন এ কারণে যে, 'বর্ণনাকারীদের সত্যতার জ্ঞান কোনো নির্দিষ্ট সীমায় বা সংখ্যায় নির্ধারণ করা সম্ভব না। কিন্তু সত্য আলামত পাওয়া গেলে এর মাধ্যমে জ্ঞান সাব্যস্ত হবে। তাই আমরা যখন একজন সম্ভ্রান্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখব খালি মাথায় ছেঁড়া পকেটে পায়ে জুতা না পরে চিৎকার করে বলছে যে তার ছেলে বা বাবা মারা গিয়েছে এবং জানাযা হয়ে গিয়েছে, যারা গোসল করায় তাদেরকে বের হতে বা ঢুকতে দেখি; তাহলে এ সকল আলামতের মাধ্যমে আমরা অকাট্যভাবে জ্ঞান লাভ করি যে সেটা সত্য, আবার এটাও বুঝি যে তিনি পাগল হয়ে যাননি।'[১১৯] সফীউদ্দীন হিন্দী বলেন, 'কিছু অবস্থায় কিছু আলামতের মাধ্যমে জ্ঞান না পাওয়া যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, সকল

---

১১৭. আল-বুরহান (১/২১৭)।

১১৮. মুতাওয়াতির বর্ণনা অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হবে এ মর্মে উসূলবিদদের বক্তব্যের সমালোচনা করেন জুয়াইনী। তিনি মনে করেন, এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আলামত কোনো অংশে ইন্দ্রিয়ের চাইতে কম নয়। তিনি বলেন, 'আমরা যে ভিত্তির ব্যাপারে কথা বলছি সেটার ক্ষেত্রে একদল উসূলবিদ শর্ত দিয়েছে যে, সেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হবে। এই শর্ত অর্থহীন। কারণ আবশ্যকীয় জ্ঞানের থেকে বর্ণনা এসেছে কিনা সেটা কাম্য। তারপর সেটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হতে পারে আবার পরিস্থিতির প্রসঙ্গ থেকেও হতে পারে। ইন্দ্রিয়ের এক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব নেই। কারণ ইন্দ্রিয় লজ্জিত ও রাগান্বিত ব্যক্তির চেহারার লাল রঙ থেকে ভীত ব্যক্তির চেহারার লাল রঙ আলাদা করতে পারে না। বরং আকল এটাকে আলাদা করে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সাথে শর্তযুক্ত করে দেওয়া অর্থহীন।' (আল-বুরহান: ১/২১৬)

১১৯. প্রাগুক্ত (১/২২০)।

অবস্থায় কোনো আলামত থেকেই তা পাওয়া যাবে না। বরং বিষয়টা পরিস্থিতি, অবস্থা ও ব্যক্তি অনুযায়ী ভিন্ন। এক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো প্রাসঙ্গিক আলামত পরিবেষ্টিত বর্ণনার শ্রোতার অবস্থা। শ্রোতার যদি জ্ঞান অর্জিত হয়, তাহলে বোঝা যায় সেটা উপকারী, নতুবা নয়।'[১২০] তূফী বলেন, 'বর্ণনার সাথে বিদ্যমান প্রতিটি প্রাসঙ্গিক আলামত কোনো বর্ণনার নিশ্চয়তা বৃদ্ধিতে একজন বর্ণনাকারীর সমান ভূমিকা রাখে। কারণ আমরা স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব নিজেদের মাঝে পাই। আর যদি এই আলামতগুলো বর্ণনাকারীর মত হয়ে থাকে, তাহলে আবশ্যকীয়ভাবে খবরে ওয়াহেদের দ্বারাও জ্ঞান অর্জিত হবে। কারণ একজন বর্ণনাকারীর সাথে বিশটি প্রাসঙ্গিক আলামত যুক্ত হলে একুশ জন বর্ণনাকারী হয়ে যায়। বরং এমনটাও ঘটে যে একটা প্রাসঙ্গিক আলামত এমন ফায়দা দেয়, যেটা হয়তো একদল বর্ণনাকারী দিতে পারে না; আর সেটা নির্ভর করে যে বিষয়টা দিকে বুদ্ধিভিত্তিক ইঙ্গিত করে, সেটার সাথে সম্পর্কের মাত্রা অনুযায়ী।'[১২১] এই বর্ণনাকে সকল উসূলবিদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে এটাকেই চূড়ান্ত মত বলে বিবেচনা করা যাবে। কারণ 'কোনো বুদ্ধিমান মানুষ প্রাসঙ্গিক আলামতের মাধ্যমে জ্ঞানপ্রাপ্তি অস্বীকার করবে না।'[১২২]

যদিও ইবনুল হাজিবসহ অন্যান্য উসূলবিদরা বলেন, 'অধিকাংশ উসূলবিদ একমত যে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির প্রদত্ত খবর জ্ঞানের ফায়দা দেয় না, তার সাথে প্রাসঙ্গিক আলামত থাকুক বা না থাকুক।' তাদের এই কথার কারণ দুটি। প্রথমত, **কালামশাস্ত্র অনুযায়ী মুতাওয়াতির বর্ণনায় যে পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসের জ্ঞান অর্জিত হয়, সেটার তুলনায় প্রাসঙ্গিক আলামতযুক্ত খবরে ওয়াহেদ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের কমতির বিষয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা।** মাযেরীর বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'আমাদের অধিকাংশ ইমাম মনে করেন স্বাভাবিকভাবে যেমন মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে আবশ্যকীয় জ্ঞানপ্রাপ্তির বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত, একইভাবে খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে জ্ঞান না পাওয়ার বিষয়টাও প্রতিষ্ঠিত, যদিও এই বর্ণনার সাথে বহু

---

১২০. নিহায়াতুল উসূল (৭/২৭৬৫)।
১২১. শারহু মুখতাসারির রাওদ্বাহ (২/৮৫)।
১২২. যারকাশীর 'আল-বাহরুল মুহীত্ব' (৪/২৩৯)।

প্রাসঙ্গিক আলামত পাওয়া যায়।'[১২৩] দ্বিতীয়ত, নবীজীর হাদীসের সাথে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কিছু আলামতের প্রায়োগিক দিক। বিশেষ করে 'উম্মাহর আমল' নামক আলামত, যেটা এখন স্পষ্ট করা হবে।

প্রায়োগিক দিকে আমরা যদি নির্দিষ্টভাবে 'উম্মাহর আমল'কে আলামত হিসেবে নিই, যেটা কিনা সবচেয়ে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ আলামত, তাহলে কি এই আলামত কোনো বর্ণনাকে ঐতিহাসিকভাবে সঠিক বলে গণ্য করবে? আমরা দেখতে পাই এটা নিয়ে মতভেদ আছে।

মুতাযিলী আলেম আবুল হুসাইন আল-বসরী বলেন, 'খবরে ওয়াহেদে নিহিত বিষয়ের ব্যাপারে যদি উম্মাহ একত্র হয় এবং সঠিক বলে গণ্য করে, তাহলে এটাকে অকাট্যভাবে সঠিক বলা যাবে, কারণ উম্মাহ ভুলের উপর একত্র হয় না। আর যদি উম্মাহ একমত না হয়, তাহলে শাইখ আবু হাশেম (আল-জুব্বাই- ৩২১ হি.), আবুল হাসান (আল-কারখী- ৩৪০ হি.) এবং আবু আব্দিল্লাহ (আল-বসরী- ৩৬৯ হি.) রাহিমাহুমুল্লাহর মতে উম্মাহ খবরে ওয়াহেদে নিহিত বিষয়ের উপর ততক্ষণ একমত হয় না যতক্ষণ তার দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হয়।'[১২৪] এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো খবরে ওয়াহদকে সঠিক গণ্য করার ক্ষেত্রে ইলম-আমলের মাঝে সংযোগ স্থাপন এবং বর্ণনা থেকে পৃথক এমন আলামতের ব্যবহার (উম্মাহর আমল)। এটা বাকিল্লানীর তত্ত্বীয় বক্তব্যের ঠিক বিপরীত।

জাস্‌সাস বলেন, 'মানুষজন যেটাকে গ্রহণ করে নিয়েছে, সেটা যদি খবরে আহাদ হয়, তবুও আমাদের কাছে মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য।'[১২৫]

আবু ইসহাক আল-ইসফারাইনী (তার থেকে জুয়াইনী বর্ণনা করেন) মুতাওয়াতির এবং আহাদের মাঝে আরেকটা প্রকার করেন। এর নাম দেন 'আল-মুস্তাফীদ্ব'। সেটার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এটা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফায়দা দেয়, আর মুতাওয়াতির অভিজ্ঞতাপূর্ব আবশ্যকীয় জ্ঞানের ফায়দা

১২৩. ঈযাহুল মাহসূল (৪২৩)।
১২৪. আল-মু'তামাদ (২/৮৪)।
১২৫. আল-ফুসুল ফিল-উসুল (১/১৭৪)।

দেয়। অনুরূপভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত হবে বহুল প্রচলিত সে সকল বর্ণনা যেগুলো হাদীসের ইমামরা গ্রহণ করে নিয়েছে।'[১২৬]

ক্বারাফী বলেন, 'যে বর্ণনাকে অকাট্যভাবে সত্য বলা যায় না, সেটার উপর আমল করা বৈধ হওয়ার বিষয়টা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু যখন তারা এটার সত্যতার ব্যাপারে জ্ঞান লাভ না করেই তারা এটার উপর আমল করবে, তখন আমাদের কাছে এটার সত্যতার জ্ঞান অর্জিত হয়ে যাবে। কারণ তারা ভুলের উপর আমল করা থেকে পবিত্র। তাই তারা যা করেছে সেটার সত্যতা অকাট্যভাবে বলা যাবে।

আর আবু হাশেম এমনটাই বলেছেন।'[১২৭]

বরং আবুল মুযাফ্‌ফর আস-সাম'আনী বলেন, 'যে খবরে ওয়াহেদকে উম্মাহ গ্রহণ করেছে এবং এর উপর আমল করেছে সেটার সত্যতা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হবে। হোক সেটা এমন যে, সেটার উপর সবাই আমল করেছে অথবা কেউ আমল করেছে আর কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছে।'[১২৮]

শাওকানী বলেন, 'এটা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করার ব্যাপারে যদি উম্মাহর ইজমা হয়ে যায় তাহলে সেটা জ্ঞানের ফায়দা দেয়। কারণ ইজমা হওয়ার মাধ্যমে সেটার সত্যতার জ্ঞান পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে খবরে ওয়াহেদকে উম্মাহ গ্রহণ করে নিলে সেটার উপর আমল করা বা সেটার ভিন্ন ব্যাখ্যা করা দুই ধরনের মত আছে।'[১২৯] (যদিও অধিকাংশ উসূলবিদ বর্ণনাকে উম্মাহর গ্রহণ করার বিষয়টা বলেছে, তবুও কেউ কেউ প্রথম তিন প্রজন্ম কর্তৃক গ্রহণ করার মাঝে সীমিত করে দিয়েছেন। সেই তিন প্রজন্ম হল সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী। আমরা জাস্‌সাসের বক্তব্যে এমনটা দেখতে পাই, 'সালাফের মাঝে যদি কোনো বর্ণনার ব্যবহার এবং সেটার অনুসরণ দেখা যায় যদিও বর্ণনা গ্রহণের শর্তসমূহ এবং বর্ণনা গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে ইজতিহাদের

---

১২৬. আল-বুরহান (১/২২৩)।
১২৭. নাফায়েসুল উসূল (২/২৮৭৯)।
১২৮. ক্বাওয়াত্বেউল আদিল্লাহ (১/৩৩৩)।
১২৯. ইরশাদুল ফুহূল (১/১৩৮)।

বৈধতায় তাদের মতভেদ আছে; তাহলে বোঝা যাবে সেটা সঠিক। কেননা যদি এটার সত্যতা বা যথার্থতা তারা না মনে করত, তাহলে গ্রহণ করা ও ব্যবহার করার ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য হতো না। আর এখান থেকেই বর্ণনার বিশুদ্ধতার জ্ঞান আবশ্যক হয়।'[১৩০]

কিন্তু এদের বিপরীতে বহু কালামবিদ এমন 'আলামত'কে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আসমান্দী বলেন, 'একজন ব্যক্তি কোনো কিছু বর্ণনা করলে এবং উম্মাহ সেটা অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে একমত হলে এবং বিশুদ্ধতার হুকুম দিলে বোঝা যায় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন। কিন্তু কোনোভাবে উম্মাহর জন্য ভুলের উপর একমত হওয়া বৈধ না। আর যদি সেটা অনুযায়ী আমল করে, কিন্তু বিশুদ্ধতার হুকুম প্রদান না করে, তাহলে একদল কালামবিদের মতে অকাট্যভাবে বলা যাবে এটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অন্যদলের মতে, এটা অকাট্যভাবে বলা যাবে না।'[১৩১] এখানে আপত্তির মূলভিত্তি হলো, আমল করা এবং ঐতিহাসিকভাবে সাব্যস্ত হওয়ার মাঝে আবশ্যকীয় সম্পর্ক নেই।

ইবনুস সাম'আনী মনে করেন আকীদাগত বিভ্রান্তির সূচনালগ্নে ক্বাদারী ও মুতাযিলা সম্প্রদায় এই শর্ত যুক্ত করেছে। তিনি বলেন, 'কোনো বর্ণনা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও ইমামরা বর্ণনা করে, খালাফ থেকে সালাফ পেরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং উম্মাহ সেটাকে গ্রহণ করে নেয়; তাহলে সেটা জ্ঞানকে আবশ্যক করে। এটাই আহলুল হাদীস এবং সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ ইমামের মত। খবরে ওয়াহেদ কখনো জ্ঞানের ফায়দা দেয় না আর জ্ঞানের ফায়দা দিতে হলে মুতাওয়াতির হওয়া আবশ্যক এমন শর্ত ক্বাদারী এবং মুতাযিলাদের উদ্ভাবন। এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য ছিল বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা। কিছু ফকীহের এ ব্যাপারে দৃঢ় জ্ঞান ছিল না, তাই তারা উক্ত কথার মর্ম না বুঝেই গ্রহণ করে নেয়।'[১৩২]

---

১৩০. আল-ফুসুল ফিল-উসুল (১/১৭৫)।
১৩১. বাযলুন নাযার ফিল-উসূল (১/১৭৫)।
১৩২. সাউনুল মান্তিক (২১২-২১৩)।

ইবন হাযমও এই মতের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, 'মুসলিমরা সবাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণের ব্যাপারে একমত ছিলেন। সকল দল এর উপর আমল করত। যেমন- আহলুস সুন্নাহ, খারেজী, শিয়া, ক্বাদরিয়া। কিন্তু প্রথম হিজরী শতকের পর মুতাযিলা সম্প্রদায় ইজমার বিপরীতে গিয়ে নতুন মত উদ্ভাবন করে।'[১৩৩]

আশ'আরীদের মাঝে সর্বপ্রথম এটা বলেন বাকিল্লানী (৪০২ হি.)। তিনি বলেন, 'যদি উম্মাহর সকলে 'আহাদ' হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারে একমত হয় যদিও এর মাধ্যমে জ্ঞানপ্রাপ্তিকে আবশ্যক মনে না করে, তাহলে খবরে ওয়াহেদের উপর আমলের মাধ্যমে ইবাদত সম্পন্নকারী উম্মাহর ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত হুকুম থাকবে। বর্ণনাটা সত্য ও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, আবার বানোয়াট ও বাতিল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখবে। ... কারণ বর্ণনার উপর উম্মাহর আমল করার ইজমা থাকলেই বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না।'[১৩৪]

জুয়াইনী বলেন, 'উস্তায আবু বকর ইবন ফুরাক বলেন, যে বর্ণনাকে উম্মাহ গ্রহণ করে নিয়েছে সেটাকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। নিজের কিছু বইয়ে তিনি বিস্তারিত এটা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, যদি তারা এটার উপর আমল করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে, তাহলেও সেটাকে অকাট্যভাবে সত্য গণ্য করা যাবে না, বরং তারা যে খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করার আবশ্যকতায় বিশ্বাস করে, সেটার কারণে এমনটা করেছে বলে গণ্য করা হবে। আর যদি তারা কথায় অকাট্যভাবে গ্রহণ করে নেয়ার ক্ষেত্রে একমত হয়, তাহলে এটা সত্য বলে গণ্য করতে হবে।'[১৩৫]

গাযালী বলেন, 'যদি বলা হয়, যে খবরে ওয়াহেদের উপর উম্মাহ আমল করেছে, সেটাকে কি বিশ্বাস করতে হবে? আমরা বলব, যদি তারা বুঝে করে তাহলে তারা নিশ্চয় অন্য কোনো দলীলের উপর ভিত্তি করে করেছে। বস্তুত তারা খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করার ব্যাপারে আদিষ্ট, যদিও

---

১৩৩. আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম (১/১৪১)।
১৩৪. আত-তাকরীব (৩/১৮০)।
১৩৫. আল-বুরহান (১/২২৩)।

সেটার সত্যতা তারা না জানে। সুতরাং এটার সত্যতার হুকুম প্রদান করা আবশ্যক হবে না। এখন যদি বলা হয়, বর্ণনাকারীকে মিথ্যুক হিসেবে ধরে নিলে উম্মাহর আমল বাতিল বলে গণ্য হবে আর এটা বড় ভুল, উম্মাহর জন্য এমনটা করা বৈধ নয়। আমরা তখন বলব, উম্মাহ এটার উপর আমল করেছে এ কারণে যে, তাদের শক্তপোক্ত ধারণা হয়েছিল এটা সত্য। তাদের দৃঢ় ধারণা ছিল। যেমন- একজন বিচারক যখন দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর মাধ্যমে বিচার করে, তখন সে ভুল করে না; যদিও সাক্ষী মিথ্যুক হয়। বরং তার কাজ সঠিক বলে গণ্য হয়, কেননা তাকে এমনটাই (দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ) করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।'[১৩৬]

রাযী বলেন, 'আবু হাশেম, কারখী এবং তাদের ছাত্র আবু আব্দিল্লাহ বসরী দাবি করেছে যেকোনো বর্ণনায় আমল করার উপর ইজমা প্রমাণ করে যে বর্ণনাটা বিশুদ্ধ। কিন্তু এটা দুই দিক থেকে বাতিল: প্রথমত, উম্মাহর সকলে বর্ণনায় নিহিত বিষয়ের উপর আমল করার উপর সেই বর্ণনার বিশুদ্ধতার নির্ভর করে না। সুতরাং বোঝা গেল বর্ণনাটার বিশুদ্ধতার পক্ষে এটা দলীল হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এটার উপর নির্ভর করে না, সেহেতু এটা সাব্যস্ত হলেও ওটা (বর্ণনার বিশুদ্ধতা) সাব্যস্ত হবে না।'[১৩৭]

যারকাশী বলেন, 'কাযী আবু বকর বাকিল্লানী বলেছেন, উম্মাহ কোনো বর্ণনায় উপর আমল করলে সেটার সত্যতা অকাট্যভাবে বলা যায় না, যদিও তারা মুখে সেটার সত্যতা মেনে নেয়। সর্বোচ্চ যেটা হয় সেটা হলো দৃঢ় ধারণা। ইমামুল হারামাইন, গাযালী, ইলকিয়া ত্বাবারী প্রমুখ এই মতকে গ্রহণ করেছেন।'[১৩৮] এখান থেকে আমরা দেখতে পাই, বেশ কিছু বড় কালামবিদ প্রাসঙ্গিক প্রসিদ্ধ আলামতকে (قرائن) অস্বীকার করে। সুতরাং আলামতের অকার্যকারিতাকে একদল কালামবিদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

কালামবিদদের দৃষ্টিতে খবরে আহাদের নির্ভরযোগ্যতা এবং এটাকে জ্ঞান হিসেবে গণ্য করার পথে প্রথম প্রতিবন্ধক হলো মুতাওয়াতিরের তুলনায়

১৩৬. আল-মুস্তাসফা (১১৩)।
১৩৭. আল-মাহসূল (৪/২৮৭)।
১৩৮. আল-বাহরুল মুহীত্ব (৬/১১১-১১২)।

খবরে আহাদ জ্ঞানের ফায়দা দেয় না। খবরে আহাদের মৌলিক সমস্যা হলো এটা ভুলের সম্ভাবনা রাখে। এটা একটা মানবীয় বৈশিষ্ট্য, যেটা অস্বীকার করা যায় না। যদিও বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ ও মুখস্থশক্তির অধিকারী হয়ে থাকে।

তাফতাযানী বলেন, 'আমরা (খবরে আহাদের) সত্যতাকে এতটা প্রাধান্য দিতে পারি না যে, মিথ্যার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিব (যেখানে বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ); বরং আকল সাক্ষ্য দেয় যে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দৃঢ় বিশ্বাসকে আবশ্যক করে না। মিথ্যার সম্ভাবনা থেকেই যায়, যদিও সেটা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত নয়। তা নাহলে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দুটি পরস্পরবিরোধী বর্ণনা প্রদান করলে অকাট্যভাবে দুটিকে সঠিক বলে মেনে নিতে হবে।'[১৩৯] সংক্ষেপে বললে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত বিষয়ই জ্ঞান।

কেউ কেউ আরো একটু নমনীয়তা অবলম্বন করেন, যেমন আবু যাইদ দাব্বুসী বলেন, 'যদি কোনো মতের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হয়, কোনটা দলীল আর কোনটা দলীল না সেটা পৃথক করা যায়, কোনো একটা মতকে প্রমাণের ভিত্তিতে সংশয়মুক্ত করে প্রাধান্য দেওয়া যায় এবং প্রাধান্য পেয়েও যায়, দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়াই অন্তর সেটার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে অধিকাংশের মতে এটাই জ্ঞানের সূচনা। যেমন- ভুলের সম্ভাবনা রাখে এমন কিয়াস এবং ইজতিহাদলব্ধ জ্ঞান, খবরে আহাদ এবং এ রকম যত দলীলের কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থাকে জ্ঞান বলা হয় তবে রূপকার্থে; যেহেতু দলীল থাকার পরও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। কিন্তু বিশেষভাবে এটাকে সত্য বলা হবে, কেননা দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে।'[১৪০] যিনি মনে করেন খবরে আহাদ বাহ্যিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়, তার বক্তব্যকে ইবন ফূরাক দৃঢ় নিশ্চয়তার অর্থে নিয়েছেন।[১৪১]

মাযেরীও এমনটাই মনে করেন। তার ভাষ্য, 'যাদের সূত্রে আমরা বর্ণনা করেছি যে, খবরে ওয়াহেদ অন্তর্নিহিত জ্ঞানের পরিবর্তে বাহ্যিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়, তাদের কাছে বাহ্যিক জ্ঞান মূলত নিশ্চয়তাপ্রাপ্তি বোঝায়।

১৩৯. শারহুত তালওয়ীহ 'আলাত-তাওযীহ (২/৭)।
১৪০. তাকওয়ীমুল আদিল্লাহ (৪৬৫)।
১৪১. আল-বাহরুল মুহীত (৫/১৩৬)।

তাদের নিশ্চয়তা দৃঢ় পর্যায়ে উপনীত হয়ে জ্ঞানের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, এমনটা বোঝাতে তারা এটা ব্যবহার করেছে।'[১৪২] এটা কালামবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি যারা 'ধারণা, অজ্ঞতা, অনুকরণ, সংশয়, অনুমানকে জ্ঞান হিসেবে গণ্য করে না, বরং জ্ঞানের বিপরীত কিছু মনে করে।'[১৪৩]

এটা সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, একটা বর্ণনার সাথে প্রাসঙ্গিক আলামতসমূহ যুক্ত হলে ভুলের সম্ভাবনা অনেক কমে যায় বা দূর হয়ে যায়। এখানে দৃঢ় নিশ্চয়তা আর অকাট্যতা খুব কাছাকাছি। তাই যারকাশী বলেন, 'আলামতযুক্ত খবরে আহাদ 'অনেক ক্ষেত্রে অকাট্যতার প্রমাণ দেয়।'[১৪৪] শাওকানীসহ কেউ কেউ মনে করেন পার্থক্যটা শাব্দিক। তিনি বলেন, 'প্রাসঙ্গিক আলামতযুক্ত খবরে ওয়াহেদের ব্যাপারে তারা মতভেদ করেছে। কেউ কেউ বলেন, এটা জ্ঞানের ফায়দা দেয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা জ্ঞানের ফায়দা দেয় না। এই পার্থক্যটা শাব্দিক। কারণ আলামতগুলো যদি এত শক্তিশালী হয় যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এর থেকে জ্ঞান অর্জন করে, তাহলে এর সত্যতা অনিবার্য। অন্যথায় অধিকাংশ মানুষের যে দাবি— আলামতসহ হোক বা আলামত ছাড়া হোক কোনোভাবেই জ্ঞান অর্জিত হবে না— সেটা একটা অর্থহীন দাবি।'[১৪৫]

কিন্তু যিনি আলামতের উপস্থিতি থাকার পরও তত্ত্বীয়ভাবে সংশয় পোষণ করেন, তিনি কোনোভাবে মেনে নিবেন না যে বর্ণনাটা আলামতের সাহায্যে জ্ঞানের ফায়দা দেয়। কারণ 'যদি জ্ঞানের ফায়দা দিত, তাহলে এটা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকা বৈধ হতো না। কিন্তু বাস্তবে এটা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কারণ আমরা যদি শুনতে পাই কেনো মানুষ মারা গিয়েছে এবং সেটার পক্ষে কিছু আলামত দেখতে পাই যেমন তার জন্য সবাই কান্নাকাটি করছে, কাফনের কাপড় আনা হয়েছে, গোসল করানোর লোকজন হাজির হয়েছে; তাহলেও আমরা তার মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত বলব না। কারণ

১৪২. ঈদাহুল মাহসূল (৪৪৫)।

১৪৩. আদ-দুসুকী, আত-তাজরীদুশ শাফী (পৃ. ২৯)। মূল তথ্যসূত্র: যাইনাব শুর্বার 'আল-ইবুস্তমুলুজিয়া: দিরাসাতুন তাহলিলিয়্যাতুন লি-নাযারিয়্যাতিল ইলমি ফিত-তুরাস', দারুল হাদী, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৪৩।

১৪৪. আল-বাহরুল মুহীত্ব (৬/১৩৮)।

১৪৫ .ইরশাদুল ফুহুল (১/১৩৮)।

বাস্তবে তার মৃত্যু না ঘটা প্রমাণিত হতে পারে। যেমন- হয়তো তিনি অজ্ঞান হয়েছেন, বা হঠাৎ নিঃশ্বাস থেমে গিয়েছে, অথবা কেউ তাকে হত্যা করতে চাইছিল সেই আশঙ্কায় সে মৃত হওয়ার ভান ধরেছে। সুতরাং বোঝা গেল বিভিন্ন আলামতের সাহচর্যে এসে বর্ণনা জ্ঞানের ফায়দা দেয় না।'[১৪৬] ভুলের সম্ভাবনা থাকলেই কিছু উসূলবিদ কোনো কিছুকে অকাট্য বলেন না। কারণ (রাযীর মতে) 'জ্ঞানের সাথে যদি তার বিপরীতটা (অজ্ঞতা) ঘটার সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে সবচেয়ে দূরতম পর্যায়ে গিয়ে হলেও, তাহলে সেটা নিছক ধারণা, জ্ঞান নয়।'[১৪৭] সুতরাং বিষয়টা দূরতম সম্ভাবনার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্নতর হয়ে থাকে।

অধিকন্তু এখানে জ্ঞানতাত্ত্বিক একটা বিবেচনা আছে। উক্ত বিবেচনার কারণে যে সকল উসূলবিদ তত্ত্বীয় জ্ঞানকে 'সংশয়ের বিপরীত' বলে সংজ্ঞায়িত করেন, তারা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গিয়ে আলামতযুক্ত খবরে আহাদের সাথে মুতাওয়াতিরের মত আচরণ করেন না। সেই বিবেচনাটা হলো মূলের ভিন্নতা। প্রথমটা তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংশয়মূলক, অন্যদিকে দ্বিতীয়টা আবশ্যকীয় ও দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দেয়। গাযালী বলেন, 'অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হলো এমন জ্ঞান যেটাতে সংশয় সৃষ্টি হওয়া বৈধ এবং অবস্থাভেদে নানা রকম হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এটা কিছু মানুষ জানে আর কিছু মানুষ জানে না। নারী-শিশুসহ যারা চিন্তাশক্তির অধিকারী নয় তারা জানে না। অনুরূপভাবে যারা ইচ্ছাকৃত চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে, তারাও জানে না। আর প্রতিটি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে সংশয়ে থাকে, তারপর অনুসন্ধানী হয়।'[১৪৮]

আত্তার বলেন, 'অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বিরোধিতা করা যায়, বিপরীতে অভিজ্ঞতাপূর্ব তথা আবশ্যকীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে করা যায় না। সুতরাং সঠিক মত হলো, আবশ্যকীয় জ্ঞান শক্তিশালী, কারণ এর বিরোধিতা করা যায়

১৪৬. মুহাম্মাদ আল-মাবার, আল-ক্বারায়েন ইন্দাল উসূলিয়্যিন, জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ, রিয়াদ, ২০০৫, (১/৩৫৭)।

১৪৭. আল-মাহসূল (৫/৪০০)।

১৪৮. আল-মুস্তাসফা (১০৬)।

না।'[১৪৯] সুতরাং আবশ্যকীয় সত্য এবং সংশয়ের সম্ভাবনা রাখে এমন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের এই দ্বৈত বিভাজনের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, প্রাসঙ্গিক আলামত সংশয়কে পুরোপুরি দূর করে দেয় না। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র আবশ্যকীয় জ্ঞানই দিতে পারে। খবরে আহাদের সামনে এটা তৃতীয় বাধা। কারণ সংজ্ঞার দিক থেকে 'আবশ্যকীয় জ্ঞান কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখে না, যেটা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের বিপরীত। সেটাতে সংশয়ের অনুপ্রবেশের সুযোগ আছে। পুনরায় সঠিকভাবে অনুসন্ধান চালানোর মাধ্যমে সেটাকে নাকচ করতে হয়।'[১৫০] আর প্রায়োগিক দিক থেকে দেখলে একটা প্রয়োগ মনোযোগ দিয়ে দেখার মত। সেটা হলো ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য। তিনি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের 'সকল হাদীস মুতাওয়াতিরের মত অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা দেয় না' এমনটা উল্লেখ করার পর এর কারণ বলেন, 'মুতাওয়াতির আবশ্যকীয় জ্ঞানের ফায়দা দেয়, যেটাতে কোনো সংশয় থাকে না। আর এটা ছাড়া অন্যগুলো (আহাদ) অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফায়দা দেয়, যেটা সংশয়ের অবকাশ রাখে। তাই এই দুই গ্রন্থে যে সকল হাদীসকে ইল্লত বা সূক্ষ্ম ত্রুটিযুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে সেগুলো জ্ঞানের ফায়দা প্রদান করেনি। আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।'[১৫১]

---

১৪৯. হাশিয়াতুল আত্তার আলা শারহিল জালাল আল-মাহাল্লী আলা জামইল জাওয়ামে' (১/২১০)।

১৫০. আস-সান'আনী, ইজাবাতুস সায়েল শারহু বুগইয়াতিল আমিল (পৃ. ৫৮)।

১৫১. আন-নুকাত 'আলা ইবনিস সালাহ (১/৩৭৯)।

তৃতীয় অধ্যায়

> পূর্ণ সংশয়ের থেকেই সম্ভবত বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সত্য যাত্রাটা হয়ে থাকে। কিন্তু পূর্ণ সংশয়েও একটা বিশ্বাস থাকে, সেটা হলো: কথার সত্যতায় বিশ্বাস।
>
> \- নিৎশে

এই বাহ্যিকতার উপর আমল করতে হবে। আর বহু বিষয় উহ্য থাকে, যেগুলো জানার দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। কেবল বাহ্যিকতার উপর আমাদেরকে নির্ভর করতে বলা হয়েছে। সেগুলো (উহ্য তথা অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো) হলো: মুহাদ্দিসের কল্পনা, মিথ্যা, ভুল, এক বা একাধিক ব্যক্তি সনদে সংযুক্তি বা অনুরূপ সম্ভাব্য সকল কিছু। এগুলোর কোনো কিছু প্রকাশ পেলে তখন সেটা গ্রহণ করা আমাদের জন্য বৈধ হবে না।

\- হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর আল-হুমাইদী (২১৯ হি.)

পূর্বের দুই অধ্যায়ের সারকথা হলো ব্যাপকভাবে দেখলে আমাদের কাছে বিদ্যমান ইতিহাসে আর বিশেষভাবে দেখলে আমাদের হাদীসশাস্ত্রে সংকলিত বক্তব্যে পাঁচটা দার্শনিক কালাম-নির্ভর মৌলিক প্রতিবন্ধক বিদ্যমান। সেগুলো হলো:

- সংশয়ই মূল (দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব)
- কেবল পরীক্ষণ-নির্ভর জ্ঞানই জ্ঞান
- ইতিহাস নিরপেক্ষ নয়
- অকাট্য জ্ঞানই জ্ঞান
- আবশ্যকীয় জ্ঞানই দৃঢ় বিশ্বাস দেয়

এই অধ্যায়ে আমাদের কাজ হলো প্রতিবন্ধকগুলো দূর করা। সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে ইতিহাস নামক জ্ঞানের দার্শনিক বিবরণ দিব, আর বিশেষভাবে ইলমুল হাদীসের উপর আলোকপাত করব। এর মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব যে, এই প্রতিবন্ধকগুলো ভুল তত্ত্ব ও দর্শন, যেগুলো অদ্ভুত ফলাফল প্রদান করে। এরপর চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দর্শন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও নৃবিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনামূলক আলোচনা করব।

১. বুদ্ধিভিত্তিক আদর্শবাদ কি সম্ভব?

দর্শনের ইতিহাস জুড়ে সংশয়মূলক চিন্তার মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে একটা প্রসিদ্ধ পন্থা আছে। সেটা হলো তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংশয়পূর্ণ দলীলগুলোকে বিবেচনার উপযুক্ত হিসেবে গণ্য না করা এবং জ্ঞানকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ এমন জ্ঞানতত্ত্ব উপস্থাপন করা, যেটা সংশয় দূর করে দেয়। আর এখানেই আমরা পৌঁছে যাই বুদ্ধিভিত্তিক আদর্শবাদী কল্পনায়। সে কল্পনাটা হলো সাধারণ মানুষ স্বভাবত যে বিশ্বাস লালন করে (যেমন- আল্লাহর অস্তিত্ব) সেটা অবশ্যই বিশ্বাস ব্যতীত ভিন্ন কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। নাহলে বিশ্বাসটা **যুক্তিসঙ্গত** হবে না। এটাই দেকার্তের সৃষ্ট নতুন জ্ঞানতত্ত্ব। অথবা আরো সূক্ষ্মভাবে বললে দেকার্ত এটাকে বের করে এনেছেন। কেননা 'প্লেটো থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে নিরবচ্ছিন্নভাবে পশ্চিমাদের চিন্তার একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল, সেটা হলো মানুষের চিন্তা স্বভাবত স্পষ্ট। মানুষ গভীরভাবে ভেবে দেখলে তার চিন্তার ভিত্তিমূলে পৌঁছাতে পারবে। চিন্তার ভিত জানার বিষয়টা নির্ভর করে সে কতটা গভীরভাবে ভেবে চিন্তার মূল আবিষ্কার করতে পারে সেটার উপর। আর এভাবেই জ্ঞানের ভিত্তি সে আবিষ্কার করবে। এই মূলের অনুসন্ধানকে জরুরী মনে করা হতো। কেননা এটা ছাড়া (যেমনটা ধারণা করা হয়) কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক সত্যতা নিরূপনের পন্থা নেই।'[১৫২] তবে আমাদের কাছে বিশেষভাবে কার্তেসিয়ান ভিত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেকার্তে বিজ্ঞানবাদী সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে

১৫২. Kazmi, Yedullah, Faith and Knowledge in Islam: An Essay in philosophy of religion. Islamic Studies, Vol. 38, No, 4 (1999) pp. 503-534.

গিয়েছেন। অথবা আলোকায়নের যুগে তার পরে যে সকল দার্শনিক এসেছিলেন, তারা তার নীতি অনুসরণ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল বুদ্ধিভিত্তিক ভিত্তের উপর জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করা।

এই ভিত্তি অনুসরণের ফলে যে সকল বিষয় মেনে নিতে হয়েছে—

(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দিকে আধুনিক ঝোঁক এবং এর পাশাপাশি সমাজ ও সামাজিকভাবে প্রাপ্ত জ্ঞানের অবহেলা। 'দেকার্তের এই নতুন ব্যক্তি-নির্ভর চিন্তা অনুযায়ী বর্ণনা তথা সাক্ষ্য দলীল হিসেবে কোনো শক্তি রাখে না, কেবল গৌণ ভূমিকা পালন করে; যদিও এর ভিত্তি থাকে।'[১৫৩] তরণ ব্যক্তির আকল-বুদ্ধি কোনো কিছু অনুধাবন করলে সেটা দলীল। অতীত 'স্বাভাবিকভাবে অতীতই। বর্তমান বা ভবিষ্যতে এর কোনো অস্তিত্বগত গুরুত্ব নেই।'[১৫৪] খুব সংক্ষেপে বললে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস হলো: 'মধ্যযুগে দর্শন পুরোপুরি ধর্মের অনুগামী ছিল। তখন দর্শন ছিল ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা ও প্রচলিত মতামতের বিশ্লেষণ। নিছক একাডেমিক জ্ঞানে সীমিত হয়ে গিয়েছিল যেটার সাথে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনোভাবে সেটা সত্যকে আলোকিত করতে সমর্থ ছিল না। তারপর দেকার্ত এসে লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে দর্শনকে মুক্ত করেন। তিনি সবকিছুতে সংশয় তোলার মাধ্যমে নিজের যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু তিনি এমন সব বিষয়ে সংশয় পোষণ করে বসেন, যেগুলোতে সংশয় পোষণ করা যায় না। কারণ একজন মানুষ এটা সংশয় পোষণ করতে পারে না যে তার নিজের অস্তিত্বই নেই। তার অবশ্যই অস্তিত্ব থাকতে হবে; যাতে সে সবকিছুতে সংশয় পোষণ করতে পারে। আমি যখন সংশয় পোষণ করি, তখন আমাকে মেনে নিতেই হবে যে আমি অস্তিত্বশীল। সুতরাং আমার নিজের অস্তিত্বে সংশয় পোষণ করা সম্ভব না। এভাবে মানুষের চোখে 'আমি' হয়ে পড়ে চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকেই আধুনিককালে আত্মনির্ভর ও আত্মমুখী চিন্তার যাত্রা শুরু হয়।'[১৫৫]

---

১৫৩. Leslie Stevenson, Why Believe What People Say? Sunthese Vol. 94, No. 3 (Mar., 1993), pp. 429-451.

১৫৪. লুসিয়ান গোল্ডম্যান, আল-উলুম আল-ইনসানিয়্যা ওয়াল-ফালসাফা, আল-মাজলিসুল আ'লা লিস-সাক্বাফা, অনুবাদ: ইউসুফ আল-আনত্বাকী, পৃ. ৫২।

১৫৫. প্যাট্রিক হিলি, সুয়ারুল মা'রিফাহ, পৃ. ৪৯।

(২) সত্য কেবল সেটাই, যেটা অনুধাবন করা এবং গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব। ঐতিহাসিক বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা যেমন: নৈতিকতা, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয় যদি বাস্তব বা সত্য হয়ে থাকে তবুও সেগুলো দ্বিতীয় স্তরের সত্য। আধুনিক দর্শনে এই জ্ঞানতত্ত্ব প্রভাব বিস্তার করেছে, হোক সেটা দেকার্তের অনুসারীদের মাঝে কিংবা তার সাথে আংশিকভাবে যাদের মতভেদ আছে তাদের মাঝেও। আমরা দেখতে পাই দেকার্তের পর থেকে পরীক্ষণ প্রক্রিয়ার অনুসারীরাও জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে 'জ্ঞানের' সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছে। তারা অনুসন্ধানের সমস্যাকে বৈধতা প্রদানের জন্য 'আমিত্ব' থেকে যাত্রা শুরু করেছে (যেটা মূলত বিশ্বজগৎ সম্পর্কে কিছু ব্যক্তির নিছক প্রতীতি, প্রকৃত রূপ নয় যেমনটা দেকার্তের মত)। তবে আমরা যেন বিক্ষিপ্ত না হয়ে যাই, সে জন্য আমরা শুধু বহির্জগতের অস্তিত্বের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টির দিকটাতে মনোযোগ নিবদ্ধ করব। আমরা জানি, কান্টের মতে এই বহির্জগতের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনো বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ না থাকাটা দর্শনের জন্য লাঞ্ছনার বিষয়।

আমরা আমাদের বইয়ে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করব, সেটা হলো দর্শনের কাঠামো বা ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসা, যেটা জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা তত্ত্ব দাঁড় করানোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় (বরং যেকোনো প্রকার দর্শনচর্চারই সমালোচনা করা)। কারণ এই কাঠামোই মূলত সংশয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। 'দেকার্তের মতে, মানুষ যেটাকে 'জানা' বিষয় মনে করে, সেটাকে 'জ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করা যাবে না। যতক্ষণ না সেই জ্ঞানটা কিংবা সেটা যে সকল অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোকে সংশয়ের মুখোমুখি করা যায়।'[১৫৬] আমরা এমন সমালোচনার পদ্ধতি অনুসরণ করার আহ্বান জানাবো যেটা সকল দার্শনিকের প্রস্তাবিত জ্ঞানের তত্ত্বকে সমালোচনা করবে। এক্ষেত্রে আমাদের বিকল্প হলো বর্ণনামূলক পন্থা, জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপনের পদ্ধতি না। এই সমালোচনা (জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির সমালোচনা) বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দুই দার্শনিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ছিল। তারা হলেন মার্টিন হাইডেগার এবং লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের দ্বিতীয় পর্যায়। দার্শনিক রিচার্ড রর্টির মতে এরা ছিলেন দর্শনের রোগ উদঘাটনকারী। দেকার্তের পর থেকে দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের যে কেন্দ্রীয় অবস্থান, সেটার কঠোর সমালোচনা

১৫৬. রিচার্ড শাখত, রুয়াদুল ফালসাফাহ আল-হাদীসাহ, পৃ. ১৭।

করে খ্যাতি কুড়ান হাইডেগার। আর ভিটগেনস্টাইন গ্রীক দর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক দর্শন পর্যন্ত দর্শনচর্চার প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করার কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। উভয়ে আমাদের বাস্তব জীবনের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তাদের প্রস্তাব হলো দর্শনের সমস্যাগুলো স্বাধীন চিন্তা থেকে সৃষ্ট। সমস্যাগুলোর সমাধান প্রদানের জন্য তারা দুজন আমাদের স্বাভাবিক জীবনে কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা করার আগে বিভিন্ন বিষয়কে আমরা বাহ্যত কীভাবে নিতাম সেটার বিবরণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। হাইডেগার এবং ভিটগেনস্টাইন যাত্রা শুরু করেন ভাষা থেকে, জ্ঞান সৃষ্টিতে ভাষার গুরুত্বের জায়গা থেকে। সুতরাং ভাষার কোনো তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আপেক্ষিক চিন্তার খণ্ডনে তারা সবচেয়ে উপযুক্ত। এই দুজনের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে আমরা যা উপস্থাপন করব, সেটা হলো দর্শনের পূর্বের যুগে আমাদের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান। কেউ সেটাকে দর্শন-বিরোধী বলুক কিংবা মানুষের স্বাভাবিক পরিস্থিতির বিবরণ বলুক অথবা চিকিৎসা বলুক সেটা বিবেচ্য নয়। এটা 'সে সকল অনুমানের মূলোৎপাটন করে দিবে, যেগুলো দেকার্তের পরবর্তী সকল দর্শনে প্রচলিত সমস্যাগুলো তৈরি করেছে।'[১৫৭] তাহলে আমরা দেখি জ্ঞানতত্ত্বের খণ্ডন এবং সংশয় প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে এই দুজন দার্শনিক কী কী বিষয় উপস্থাপন করেছেন, যাতে করে আমরা জ্ঞানের নানা তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করার বৈধতা দিতে পারি এবং বর্ণনামূলক পদ্ধতির দিকসমূহ উপস্থাপন করতে সক্ষম হই।

হাইডেগার মনে করেন বিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব (যেটাকে তিনি ডাজায়েন-Dasein) সংজ্ঞা এবং বাস্তবতা উভয় দিক থেকেই তার সত্তার বহির্ভূত। সুতরাং হাইডেগারের ভাষায়, 'ডাজেইনের সারবস্তু তার সত্তার বাহিরে অস্তিত্ব লাভ করে।' আমরা যখন মানবীয় অস্তিত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন বিশ্বের মাঝে এই অস্তিত্বই সর্বপ্রথম আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়।[১৫৮] ডাজায়েনকে তার পারিপার্শ্বিক জগত থেকে পৃথক করা সম্ভব না। কারণ এটা পরিবেশের সাথে আবশ্যকীয়ভাবে সম্পৃক্ত। সামাজিক জীবন থেকেও

১৫৭. Rudd, Anthony, Expressing the World: Skepticism, Wittgenstein, and Heidegger. Chicago: Open Court, 2003, p. 56.

১৫৮. আব্দুর রহমান বাদাভী, মাউসুআতুল ফালসাফাহ, হাইডেগার অধ্যায়।

একে আলাদা করা সম্ভব না; কারণ অন্যরা আমার সাথে চলছে এবং সাহচর্য গ্রহণ করছে। আমি তাদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে যাচ্ছি। এই বিশ্বকে তাদের সাথে আমাকে ভাগ করে নিতে হবে। মানুষ যখনই কিছুটা প্রশস্ততার মাঝে বসবাস করে, তখন অন্যের মাঝে ঢুকে যায় এবং তার জন্য নিজেকে আলোকিত করে। তাই একজন মানুষের জন্য অন্যান্য মানুষের অস্তিত্বটা **মৌলিক**। আমার অস্তিত্বের মাঝে একই সময়ে আমি অন্যদের সাথে আছি। 'কারো সাথে অস্তিত্ব' প্রত্যেক ডাজেইনের মৌলিক ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর অন্যদেরকে বুঝতে পারা আপন অস্তিত্বের একটা অস্তিত্বমূলক অবস্থা।[১৫৯] অন্যভাবে বললে, ডাজেইনের জন্য তার বিশেষ অস্তিত্ব অনুধাবন হলো অন্যদেরকে বুঝতে পারে। আবার আপন সত্ত্বাকে তার পূর্ণভাবে অনুভব ও অনুধাবন করা মূলত অন্যদেরকে অনুভব ও অনুধাবন করা থেকেই সে গ্রহণ করেছে।[১৬০] ডাজায়েন যখন অন্যদের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করে, তখন সে পরিত্যাগের মাধ্যমে যেন তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়।[১৬১] এভাবে হাইডেগার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অঙ্গন, সমাজ বা পরিবেশকে চূড়ান্ত একটা প্রভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছিল, যেটাকে আধুনিক দর্শন পুরোপুরি অবহেলা করেছে। দেকার্তের সমালোচনায় এটাই প্রথম পয়েন্ট যার মূলকথা হলো, **'আমার নিজেকে অনুধাবন করা আমার পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো অনুধাবন থেকে বিচ্ছিন্ন** নয়।'[১৬২] সুতরাং 'জ্ঞান এক প্রকার ডাজায়েন যেটা বিশ্বজগতের অভ্যন্তরে অস্তিত্বের ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত,'[১৬৩] পৃথক সত্তার উপর নয়। আরো সহজভাবে বললে, জীববিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের সকল দিক থেকে জীবনের অস্তিত্ব জ্ঞানেরও অস্তিত্বের পূর্বে। 'আল-কাইনূনা ওয়ায-যামান' বইয়ে হাইডেগার অভিযোগ করেন যে, জ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের ধারণটা সমস্যাজনক। আমরাই প্রশ্ন সৃষ্টি করি, 'কীভাবে এই জ্ঞাত সত্তা তার অভ্যন্তরীণ (বৃত্ত) থেকে বেরিয়ে বাহ্যিক বৃত্তের দিকে ধাবিত হয়? সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জ্ঞানের বিষয়বস্তু কীভাবে থাকতে পারে? একটা

১৫৯. প্রাগুক্ত।

১৬০. সাফা আব্দুস সালাম জাফর, আল-উজুদুল হাকীকী ইন্দা মার্তিন হাইডেগার, মুনশাআতুল মা'আরেফ, পৃ. ১৮৭।

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

১৬২. Rudd, Anthony, Expressing the World, 2003, p. 59. .

১৬৩. হাইডেগার, আল-কাইনুনা ওয়ায-যামান, দারুল কুতুবিল জাদীদ আল-মুত্তাহিদাহ, অনুবাদ, ভুমিকা ও টীকা: ফাতহী আল-মিসকীনী, পৃ. ১৪৫।

নির্দিষ্ট বিষয়ে কীভাবে ভাষা যেতে পারে? এমনকি শেষ পর্যন্ত সত্তাও তাকে চিনতে পারে?'[১৬৪] **কিন্তু বাস্তবে ব্যাখ্যা জরুরী বা প্রয়োজনীয় নয়। কারণ ডাজায়েন সবসময় অস্তিত্বশীল জিনিসগুলোর মাঝে অস্তিত্বশীল, ফলে এই সকল সৃষ্টির মাঝে এটা ব্যাপ্ত।**

আত্মগত তথা ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক এর দ্বৈততা (যেটাকে ইতিহাসের সত্যতার বিপরীতে সর্বপ্রথম আপত্তি হিসেবে পেশ করা হয়) ধারণা করে নেয় যে, 'বাহির'কে বোঝার ক্ষেত্রে 'অভ্যন্তর'-এর অধিকার আছে। অথচ বিশ্বজগতের সাথে মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক হলো মাধ্যম বিহীন এক বিশ্বে তার অস্তিত্ব; বরং এটা 'নিছক গ্রহণ'-এর মাঝে সীমিত। মানুষকে এই বিশ্বে শুধু অস্তিত্ব প্রদান করা হয়েছে। সে ভেতর থেকে বাহিরে বের হওয়ার সত্তা নয়। বরং সে একজন ডাজায়েন হওয়া মাত্রই সে কোনো প্রচেষ্টা না চালালেও বিশ্বের ব্যাপারে নির্দিষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারবে। হাইডেগার বলেন, মানুষের অনুধাবনের ক্ষেত্রে 'ডাজায়েন প্রথম বারের মত তার অভ্যন্তরীণ বৃত্তের বাহিরে যায় না। বরং সে তার অস্তিত্বের সূচনালগ্ন থেকে সবসময় (বাহিরে) এমন এক বৃহদাকার সৃষ্টির মাঝে অস্তিত্বশীল, যার কাছে প্রতিবারই এই আবিষ্কৃত বিশ্বজগতের দূরত্ব বিদ্যমান। একটা সৃষ্টির মাঝে নির্দিষ্টভাবে অবস্থান থেকে কখনো এটা বোঝা যায় না যে, সে 'অভ্যন্তরের' বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। বরং ডাজায়েন এই বহির্জগতে অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও অভ্যন্তরে যে অর্থে সঠিকভাবে বোঝা হয় ঠিক সেটাই। অর্থাৎ এই সত্তাই বিশ্বজগতে তার সেই অস্তিত্ব যেটা আপনি জানেন। অনুরূপভাবে সত্য-সঠিককে গ্রহণ করা বাহির থেকে গনীমত অর্জন করে বিজয়ীর মত নিজের বুঝে ফিরে আসা নয়। বরং গ্রহণ ও সংরক্ষণের পরও জ্ঞাত ডাজায়েন তেমনই থাকে, যেমনটা বাহিরের জগতে থাকে।'[১৬৫] হাইডেগারের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ একমাত্র অস্তিত্ব, যার গহীন ভেতরে অস্তিত্বের আলো বিদ্যমান। বিপরীতে অন্যান্য জড় ও ঘন অস্তিত্বগুলো এমন নয়। মানুষ আপন সত্তায় বন্দী নয়। বরং সে উদার ও প্রশস্ত। হাইডেগারের মতে মানুষ প্রকৃতিতে বা অস্তিত্বের মাঝে অস্তিত্বশীল একটা সত্তা নয়। বরং সে অস্তিত্বশীল সত্তাসমূহের মাঝে অবস্থান করে, তার সাথে অন্যান্য সত্তার

১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।
১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

সম্পর্ক উদারতা ও প্রশস্ততার।[১৬৬] তাই হাইডেগার বলেন, 'প্রত্যেক নৈর্ব্যক্তিক ঝোঁকের মাঝেই রয়েছে অনুরূপ ব্যক্তিগত ঝোঁক। এর অর্থ এটা নয় যে, সৃষ্ট সত্তা পৃথক চিন্তাশীল ব্যক্তির একটা বিন্দুতে পরিণত হবে। অর্থাৎ একটা এলোমেলো বিষয়ে রূপ নিবে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমরা যত কিছুর সম্মুখীন হই, সেগুলো আমাদের সামনে 'বস্তু' নিয়ে হাজির হয় যেটাকে 'ব্যক্তি' স্থান করে দেয়; অর্থাৎ ব্যক্তি সত্তা সেটার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং অস্তিত্বকে জোরদার করে।'[১৬৭]

আমরা বিশ্বকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন বস্তু হিসেবে পরীক্ষা করি না। ব্যক্তি প্রথম ধাপে নিজেকে চেনার পর দ্বিতীয় ধাপে বিশ্বকে চিনে— বিষয়টা এমন নয়। বরং বিশ্বের সাথে আমাদের আচরণ একজন কাঠমিস্ত্রীর মতো, যে তার সকল উপকরণ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে আচরণ করে। প্রত্যেকটি উপকরণের অর্থ, গুরুত্ব ও সম্পর্ক আছে। হাইডেগার বলেন, 'একটা উপকরণ সর্বদা অন্য উপকরণের অন্তর্ভুক্তির দিকে ধাবিত করে: লেখার উপকরণ, পালক, কালি, কাগজ, বালিশ, টেবিল, ফানুস, আসবাবপত্র, জানালা, দরজা, রুম। এগুলো একা একা অস্তিত্ব লাভ করে না, যে পরবর্তীতে এগুলোর সমন্বয়ে কক্ষ গঠিত হবে। শুরুতে প্রথম দেখায় একজন ব্যক্তি যে জিনিসটার প্রকৃত রূপ উদঘাটন করতে পারবে না, সেটা হলো কক্ষ। আর এই কক্ষও (চার দেওয়ালের ভেতরে) কোনো স্থানের অর্থে নেই, বরং এটা বসবাসের উপকরণ। এর থেকেই যাত্রা শুরু করে (এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের) আসবাবপত্রের প্রকাশ ঘটে। প্রত্যেকবার এর ভেতর একক উপকরণ প্রকাশ পায়। এগুলোর আগে প্রত্যেক বার উপকরণবাচক বাক্য আবিষ্কৃত হয়েছে।'[১৬৮] সংক্ষেপে বললে, 'আমরা জগতকে আমাদের ইচ্ছা-আগ্রহের জায়গা থেকেই দেখে থাকি।'[১৬৯]

---

১৬৬. হায়াত খালকাওয়ী, মাফহুমুল হাকীকাহ ইন্দা মার্তিন হাইদেগার, মিন্তাউরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স থিসিস, পৃ, ৫৬।

১৬৭. মুহাম্মাদ আশ-শাইখ, নাকদুল হাদাসাহ ফী ফিকরি হাইদেগার, আশ-শাবাকাতুল আরাবিয়্যা লিল-আবহাসি ওয়ান-নাশর, ২০০৮, পৃ. ৪৭০।

১৬৮. হাইডেগার, আল-কাইনূনা ওয়ায-যামান, পৃ. ১৫৬।

১৬৯. Rudd, Anthony, Expressing the World, 2003, p. 57.

তাই হাইডেগারের মত অনুযায়ী 'এই বিশ্বজগতের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করা আমাদের জন্য সম্ভব না। কারণ আমাদের জন্য নিজেদের বুঝতে হলে সেটা এই বিশ্বের মাঝে সৃষ্ট প্রাণী হিসেবেই বুঝতে হবে। আর এই বিশ্বকে বুঝতে হলে এমন বিশ্ব হিসেবেই বুঝতে হবে, যেখানে আমাদের অস্তিত্ব আছে।'[১৭০] সুতরাং বহির্জগতের অস্তিত্বের পক্ষে এমন কোনো বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণের অস্তিত্ব নেই যা সংশয় দূর করে— কান্টের দাবিকৃত এই দার্শনিক সংকট 'এমন নয় যে এর দলীল পাওয়া দুঃসাধ্য। বরং এমন দলীল সর্বদা কাম্য ও প্রত্যাশিত।'[১৭১] এই দলীলের অপেক্ষা করাটাই লাঞ্ছনার বিষয়— এমনটা মনে করেন হাইডেগার।

দেকার্ত যেমন অনুধাবনকে উপস্থিত একটা মুহূর্ত বলে মনে করে, অর্থাৎ নিজেকে পূর্বে বিদ্যমান যেকোনো জ্ঞান থেকে আলাদা করে ফেলে; তার বিপরীতে গিয়ে হাইডেগার মনে করেন আমরা সময়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে প্রবহমান, অর্থাৎ আমাদের ইতিহাস আছে, সেটা অতীত বা ভবিষ্যত উভয় সময়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'কারণ অতীতকে আমরা যাচাই করব এই হিসেবে যে, অতীত হলো আমরা যা কিছু করে বর্তমান পর্যন্ত এসেছি। আর ভবিষ্যতকে যাচাই করব কিছু প্রশস্ত সম্ভাবনা হিসেবে, তার মধ্যে কিছু সম্ভাবনায় আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করব, আর কিছু এড়িয়ে যাব।'[১৭২] আমাদের নিজেদের বুঝ, আগ্রহ, বিশ্বাস ও অনুভূতি সম্পর্কে আমাদের সকল বক্তব্য আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার দিকে ইঙ্গিত করে, পাশাপাশি ভবিষ্যতে আমরা যে সকল অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে পারি, সেটার দিকেও নির্দেশ করে। আমাদের ইতিহাসকে বর্তমান মুহূর্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের সামনে এই মুহূর্তে (ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কিংবা হৃদয়ে ধারণ) যা প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলো পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত নয়, আবার ভবিষ্যতের সাথেও এর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন নয়। স্মৃতি আমাদেরকে 'বাস্তবতার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে সে ব্যাপারে যাবতীয় উপকরণ প্রদান করে। স্মৃতি ছাড়া আমাদের দিন-রাত লক্ষ্যহীন হয়ে পড়বে। স্মৃতি আমাদের প্রত্যেককে আপন ইতিহাস রচনা করতে সাহায্য করে। ... আমরা যেটাকে

১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
১৭১. হাইডেগার, আল-কাইনুনা ওয়ায-যামান, পৃ. ৩৮৩।
১৭২. Rudd, Anthony, Expressing the world, 2003, p. 65.

প্রথম প্রকাশন

বর্তমান বলি, সেটা একটা সময়ের স্পষ্ট সীমারেখায় বেঁধে ফেলা যায় না; কারণ এটাকে বর্তমান বলে অভিহিত করার আগেই এটা শেষ হয়ে অতীতে পরিণত হয়। আমাদের এমন বর্তমান প্রয়োজন পড়ে যেটার আলোকে আমরা পরিমাপ করব। সেজন্য নিকট অতীত থেকে একটা অংশ চুরি করে আমরা সেটাকে নিজেদের তৎক্ষণাৎ অনুভূতি হিসেবে গণ্য করে 'বাহ্যিক বর্তমান' হিসেবে চালিয়ে দিই। এই বর্তমানটা এক প্রকার চিন্তা যেটা আমাদের তৎক্ষণাৎ অর্জনের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া এবং লক্ষ্য অনুযায়ী বদলে যায়। প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের প্রত্যেকে (ইতিহাস লেখকেরাও) অনুভবযোগ্য পরিবর্তনশীল বর্তমানের বুকে সর্বদা নতুন সুতা বুনে চলি, সেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করে। স্মৃতিশক্তিকে নবায়ন করার ভিত্তির উপর দাঁড়ানো চিন্তা অনুভবযোগ্য বর্তমানের পরিধিকে বিস্তৃত করতে ভূমিকা রাখে। যেমন আমরা বলি: 'এই বছর' বা 'বর্তমান প্রজন্ম'। অথচ ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ঘটনাগুলো এমন অনুভূত বর্তমানের অংশ না যেটা অতীতের দিকে ইঙ্গিত করে। তবে এগুলো কিছু অনুমান হিসেবে সমবেত হয়েছে যেগুলো ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে।' আমাদের স্মৃতি শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতিতে সীমিত না। 'বরং ব্যক্তির গণ্ডি অতিক্রম করে আমাদের সমাজ ও অন্যান্য সমাজের সাধারণ বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলো আমরা আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন উৎসের জ্ঞান থেকে অর্জন করেছি। এই ক্রম নবায়নকৃত স্মৃতি দিয়ে আমরা আমাদের জন্য এবং আমাদের মাধ্যমে একটা সরল ইতিহাস তৈরি করি, যেটার উৎস হলো অনুভূত বর্তমানে চিন্তাকৃত অতীত।'[১৭৩] দেকার্তের 'আমি'কে কেবল 'কোনো জাতিগোষ্ঠীর পটভূমিতেই পাওয়া যায়। আমরা অতীতে যেটার খোঁজ করি, বর্তমানে মানুষকে জানতেও সেটাই খুঁজি। প্রথমে ব্যক্তিদের মৌলিক অবস্থান এবং তারপর মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে মানুষের সমবেত হওয়া, তারপর পরস্পরের মিলেমিশে অবস্থান করা আর বিশ্বজগত। ইতিহাস জানাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, আমরা এর মাধ্যমে এমন কিছু মানুষের সাথে পরিচিত হই যারা অনুরূপ মূল্যবোধের পক্ষে লড়াই করেছিল। আমরা আজ যা কিছু পাচ্ছি, সেগুলোর সাথে মিলে অথবা সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে

১৭৩. কাইস মাদী, আল-মা'রিফাতুত তারীখিয়্যা ফিল-গার্ব, পৃ. ৩৫-৩৬।

পারি যে, আমাদেরকে অতিক্রম করে এমন সকল কিছুর একটা অংশে আমরা। ইতিহাসের জ্ঞান শুধু ঐ ব্যক্তির মাঝে থাকে, যে আত্মকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করে এবং সেই অতিক্রম করার বিষয়টা বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম মৌলিক মাধ্যম নির্ধারণ করে নেয়।'[১৭৪] সুতরাং জ্ঞানতত্ত্ববিদদের সমস্যা হলো তারা 'নিজেদেরকে পৃথক আকল মনে করে সেখান থেকে চিন্তার যাত্রা শুরু করে, যে আকলগুলো স্বতন্ত্র কোনো কিছুর মোকাবেলা করে যেমনটা তারা দাবি করে। ধরে নেয়া হয় যে আমরা সেগুলোকে না জানলেও সেগুলো অস্তিত্বশীল। কিন্তু যদি সবকিছুর এমন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকে, তাহলে অবশ্যই সংশয়মূলক তর্ক উত্থাপিত হবে। জ্ঞানতত্ত্ববিদদের বক্তব্যগুলো মেনে নিলে সেগুলো মোকাবেলা করা কঠিন হবে। আমরা যদি মেনেও নিই যে, আমাদের বাহিরে জগতের অস্তিত্ব আছে, তবুও সেটা অর্থবহ বহু জিনিসে ভরপুর বিশ্বে আমাদের দৈনন্দিন অনুধাবনকে পুনরায় দাঁড় করানোর জন্য যথেষ্ট হবে না।'[১৭৫] এই 'আত্ম' সকল সমস্যার মূল, কারণ 'ইতিহাস তত্ত্বের ভিত্তিই হলো অন্যদের সাথে সম্পর্ক।'[১৭৬]

এভাবে হাইডেগার যে উপসংহারে উপনীত হন সেটা হলো মানবিক বিদ্যা সামাজিক, পরস্পরের অংশগ্রহণে সৃষ্ট এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এটা আদর্শিক কল্পিত কিছু নয়। বরং মানুষের প্রয়োজনীয়তার সাথে সংশ্লিষ্ট। মানুষের সাথে বিশ্বজগত কিংবা মানুষের সাথে সমাজের প্রকৃত বিচ্ছিন্নতা নেই। সুতরাং ব্যক্তিসত্তা ও বস্তুর মাঝে পৃথকীকরণ বলে কিছু নেই। যেহেতু জ্ঞান উত্তরাধিকার বা বংশসূত্রে প্রাপ্ত, সেহেতু এটা ঐতিহাসিক।

দার্শনিক ভিটগেনস্টাইনও তার সর্বশেষ দর্শনে এসে বিশেষ ভাষার যুক্তি নামক একটি যুক্তিতে এসে এই ফলাফলে পৌঁছান। আমরা যদি কল্পনা করি দেকার্তের 'আমিত্ব' একটা শিশু যে কিনা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বসবাস করে, যেখানে কেউ নেই; তাহলে এই শিশু কি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে? তার জন্য কি এককভাবে ভাষা অর্জন করা সম্ভব হবে? শিশুটা কি 'ঘর'কে 'ঘর' নাম দিতে পারবে? ভিটগেনস্টাইন তার গবেষণার ২৫৮ নম্বর অনুচ্ছেদে

---

১৭৪. গোল্ডম্যান, আল-উলূম আল-ইনসানিয়্যা ওয়াল-ফালসাফাহ, পৃ. ৫৩-৫৪।

১৭৫. Rudd, Anthony, Expressing the World, 2003, p. 59.

১৭৬. গোল্ডম্যান, আল-উলূম আল-ইনসানিয়্যা ওয়াল-ফালসাফাহ, পৃ. ৫৩।

এসে এই প্রশ্নের একটা কাল্পনিক উদাহরণ টেনে বলেন, 'আমি একটা ডায়েরী রাখব যেটা আমাকে নির্দিষ্ট একটা অনুভূতি বারবার ঘটার কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। তারপর ঐ অনুভূতির সাথে 'ক' বর্ণের সম্পর্ক স্থাপন করব। যেদিনই ঐ অনুভূতি আমার হবে, সেদিন আমি 'ক' বর্ণ ডায়েরীতে লিখব। প্রথমে আমি লক্ষ্য করব যে বর্ণের সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি ইঙ্গিতবহ একটা সংজ্ঞা হিসেবেও এটার কথা নিজেকে বলতে পারছি না। কীভাবে? আমি কি অনুভূতিটার দিকে ইশারা করতে পারব? না, প্রচলিত অর্থে পারব না। তবে আমি বর্ণটা বলব বা লিখব। আবার একই সময়ে অনুভূতির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করব। মনে মনে সেটার দিকে ইশারা করব। কিন্তু এভাবে মনোযোগ দেওয়ার লক্ষ্য কী? লক্ষ্য হলো ঐ বর্ণের অর্থটা মনের ভেতর স্থাপন করা। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার কাছে শুদ্ধতার কোনো মাপকাঠি নেই। মানুষ এখানে বলতে পারে যে, আমার কাছে যা সঠিক মনে হয় তা সঠিক। অর্থাৎ আমরা 'সঠিক/শুদ্ধ' সম্পর্কে কথা বলতে পারি না।' ভিটগেনস্টাইন এই উদাহরণ দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যে ভাষা সামাজিক বিষয়। আর 'নামকরণ' এটা ভাষাগত কার্যক্রম যেটা নির্দিষ্ট মাপকাঠির উপর নির্ভর করে, আর সেই মাপকাঠিটা হলো সমাজ। সমাজ একটা শিশুর ইন্দ্রিয়গুলোকে এমনভাবে পরিচালিত করে, যেন সে বিশ্বকে আমাদের মত করে দেখতে পারে। একজন বিচ্ছিন্ন শিশু অসংখ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপকের মোকাবেলা করে (বস্তুবাদী পরীক্ষণ-নির্ভর দর্শনের দৃষ্টিতে যে শিশুর মাথা সাদা পৃষ্ঠার মতো শূন্য)। একজন শিশু এ সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপকের স্পর্শ পাওয়ার সময় অসংখ্য মানসিক অবস্থার সম্মুখীন হয়। সুতরাং নামকরণের কাজটা নির্বাচনমূলক, এর জন্য দরকার আত্মপরিচয়মূলক স্মৃতি। আর একটা সমাজের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভাষা এটাকে নিশ্চিত করে।

বিষয়টা আরো স্পষ্ট করার জন্য আমরা বারট্রান্ড রাসেলের চোখে জ্ঞানের দুই ভাগ উল্লেখ করব: প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বর্ণনামূলক জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো 'আপনার ইন্দ্রিয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোর ব্যাপারে অনুভূতি। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি টেবিলের দিকে তাকান তাহলে প্রথম দেখায় পুরো টেবিল জানা সম্ভব নয়। কারণ আপনি টেবিল দেখছেন, কিন্তু হাতের আঙুল দিয়ে অনুভব করছেন না। আপনি আলোর প্রতিফলনে এর

রং দেখতে পাচ্ছেন। পদার্থটা কঠিন বলে আপনি বুঝতে পারছেন। সরাসরি সংযোগে আপনি যা জেনেছেন, সেটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি। আপনি যদি আবার প্রচেষ্টা চালিয়ে এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি দিয়ে একটা টেবিলের সামগ্রিক রূপ অর্জন করেন, সেটা হবে প্রথম ধাপের পর দ্বিতীয় ধাপ। আর এটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, বরং একটা বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে দলীল প্রদান। রাসেলের পরিভাষায় এটা হলো বর্ণনামূলক জ্ঞান।'[১৭৭] এখানে জ্ঞানের এই ভুল বিভাজনের স্বীকৃতি প্রদান করা উদ্দেশ্য নয়। বরং সমস্যাটা তুলে ধরা উদ্দেশ্য। সেটা হলো, একজন শিশুর জন্য বিক্ষিপ্ত, আকৃতিগত এবং প্রয়োগিক বিভিন্ন অনুভূতি থেকে 'টেবিল' নামক পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন সম্ভব? ভিটগেনস্টাইন মনে করেন 'বিভিন্ন জিনিসের মাঝে সাদৃশ্য বুঝতে পারা মানব জীবনের অন্যতম অংশ। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করাও আমাদের জীবনের চিত্রের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সক্ষমতাগুলো আমাদেরকে ভাষা ব্যবহারের অভিনব যোগ্যতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কারণ এটা আমাদেরকে সরল বিষয় থেকে সামগ্রিক ও জটিল বিষয় গঠনের বৈধতা দেয়।'[১৭৮] **নিছক ইন্দ্রিয় থেকে বর্ণনার পর্যায়ে পৌঁছানোর কোনো প্রক্রিয়া নেই। বরং অন্যের সাথে সংযোগ এবং অপরের দিক-নির্দেশনা এখানে প্রাধান্য পায়।** ভিটগেনস্টাইন জোর প্রদান করে বলেন যে, নামকরণের বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত কিছু নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। নাহলে নামকরণ অর্থহীন হতো। নামকরণ হলো, 'আমি আমার জানাশোনার ভেতরে এটাকে এই নাম দিয়েছি'। সুতরাং নামকরণ বুঝতে পারা ভাষার মূলনীতি বুঝতে পারার সমান। যেমনিভাবে দাবা খেলা পুরোপুরি বোঝা ছাড়া দাবার কোর্টে একটা গুটিকে বোঝা সম্ভব নয়। এই বুঝের সূচনা 'দেকার্তের আত্ম' কিংবা 'স্বচ্ছ আকল' থেকে হয় না। আমার যখন কোনো নতুন অনুভূতি হয় যেমন- ব্যথার অনুভূতি (ভিগটেনস্টাইনের উদাহরণ) আর আমি মনের গভীর থেকে সেটা বুঝতে পারি, সেটাকে আমি 'ব্যথা' নামক শব্দের সাথে সম্পৃক্ত করি, আর ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে আমার অনুরূপ অনুভূতি হয়; অতীতে আমার দেওয়া এই নামটা স্মরণ হয়, তখন আমি এটাই ব্যবহার করি। স্মৃতি আমাদেরকে বিভিন্ন শব্দ ও তার অর্থের মাঝে সঠিক সংযোগের

---

১৭৭. যাকী নাজীব মাহমুদ, বারট্রান্ড রাসেল, দারুল মা'আরেফ, পৃ. ৬৭।

১৭৮. হানী মুজা, ভিটগেনস্টাইন, আল-মারকাযুল কওমী লিত-তর্জমা, আকাক লিন্নাশর ওয়াত-তাওযী, অনুবাদ: সালাহ ইসমাইল, পৃ. ১৬১।

ক্ষেত্রে সহায়তা করে না, যতক্ষণ আমাদের কাছে ভুল থেকে সঠিক আলাদা করার মাপকাঠি না থাকে।[১৭৯] এই মাপকাঠি হলো সম্মিলিত স্মৃতি, যেটা বর্ণনার মাধ্যমে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কৃতি। এটা মানুষের জীবনের চিত্রকে তুলে ধরে। অর্থাৎ আপনি মানুষের একটা সমাজে বসবাস করলেই এমন বিষয়গুলোর মুখোমুখি হবেন। আমাদের চারপাশে বিশ্বকেন্দ্রিক আমাদের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের বর্ণনা (দৃষ্টিভঙ্গী) দ্বারা পূর্ণ। এটা উপরে ভিটগেনস্টাইনের দেওয়া স্মৃতির উদাহরণ থেকে আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়। তখন প্রশ্নটা হয়, কীভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহকে (ব্যথার অনুভূতি কিংবা টেবিলের অনুভূতি) বদলে (ব্যথা কিংবা টেবিলের) সংজ্ঞায় রূপ প্রদান করা যায়? উত্তর হলো, সমাজ প্রদান করে? সমাজ ব্যথার অনুভূতিকে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামাজিক পর্যায়ে নিয়ে যায়। সমাজ একটা নির্দিষ্ট আকৃতি বা পারিপার্শ্বিক সব কিছুর সাথে এর সম্পর্ককে একত্র করে টেবিলের সংজ্ঞায় রূপ দেয়। স্বভাবতই সম্মিলিত মাপকাঠি হলো বেদনার অনুভূতির হওয়ার সাথে সাথে কৃত আচরণ। কারণ মানুষজন এটাই প্রত্যক্ষ করে থাকে। মানুষজন যখন ব্যথা অনুভব করে, তখন তার আচরণ এবং পারিপার্শ্বিক মানুষদের আচরণ থেকে 'ব্যথা'র সংজ্ঞা শিখতে পারে। শিক্ষণের মাপকাঠি থাকে আচরণ, অনুভূতি না। আচরণই ব্যথার সংজ্ঞাকে যথাযথ ব্যবহার করার মাপকাঠি। যেমনিভাবে টেবিলের সাথে মানুষের আচরণ টেবিলকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাপকাঠি।

তাই দেকার্ত যখন বলেন, আমি বহির্জগতের অস্তিত্বের ব্যাপারে কার্যত সংশয় পোষণ না করলেও তত্ত্বীয়ভাবে করি, তখন তিনি মূলত বলেন, 'আমি সংশয়ের দাবি তুলি, কিন্তু আচরণে তার কোনো প্রতিফলন থাকে না!' অর্থাৎ তিনি সংশয়ের অনুভূতির কথা বলছেন, কিন্তু সংশয়ের সংজ্ঞা বলছেন না যেটা আমরা সবাই জানি। তিনি এক বিশেষ ভাষায় কথা বলছেন যেটা বোধগম্য না, বা অন্ততপক্ষে স্ববিরোধী। তার উদাহরণ এমন মানুষের মতো যিনি বলেন, 'আমি ঈমানদার' কিন্তু ঈমানের প্রতিফলন ঘটে এমন কোনো কাজ সে করে না। সংশয় বলতে আমরা যা জানি সেটা হলো:

---

১৭৯. মাহমুদ যাইদান, নাযারিয়্যাতুল মা'রেফা ইন্দা মুফাক্কিরিল ইসলাম ওয়া-ফালাসিফাতিল গারবিল মুয়াসিরীন, মাকতাবাতুল মুতানাব্বী, পৃ. ১১৫।

➢ এমন সংশয় যেটা পূর্ব থেকেই দৃঢ় বিশ্বাসকে অনুমিত ধরে নেয়। কারণ একটা শিশু কোনো কিছু জানার আগে অবশ্যই তাকে চারপাশের সবকিছুকে স্বীকার করে নিতে হবে। অর্থাৎ তাকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট বিষয় মেনে নিতে হবে এবং মেনে নেওয়ার নীতির অন্ধ অনুকরণ করতে হবে। তাহলেই বিশ্বজগত সম্পর্কে সে দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে। তারপর যদি কখনো তার মনে হয় যে উত্তরাধিকারসূত্রে যা জেনে এসেছে, সেটা অতিক্রম করতে হবে; তাহলে সে সেটা করতে পারে। কিন্তু বিশ্বকে চেনার আগে কিংবা শূন্য থেকে শুরু করে তার জন্য এমনটা করা সম্ভব নয়। আক্বলে শুরু থেকে যে জ্ঞান থাকে, সেটা নিয়ে সে সংশয় পোষণ করতে পারবে না (যেমন- নিজের অস্তিত্ব, বহির্জগতের অস্তিত্ব, অন্যদের আক্বল থাকা, যুক্তিবিদ্যার প্রারম্ভিক কিছু মূলনীতি)। দেকার্ত যেখানে মনে করেন, সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃঢ় বিশ্বাসের আগে মৌলিক সংশয়ের প্রয়োজন, সেখানে ভিটগেনস্টাইন বর্ণনা করেন যে, 'সংশয়ের জন্য পরীক্ষণ চালানোর সম্ভাবনা ও সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। আর পরীক্ষণের দাবি হলো এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকা, যার উপর ইতঃপূর্বে পরীক্ষা চালানো হয়নি যা সংশয় পোষণ করা হয়নি।' কালামবিদদের ভাষায় বললে, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে শেষ পর্যন্ত আবশ্যকীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হবে। ভিটগেনস্টাইন বলেন, 'আপনি যদি সব বিষয়ে সংশয় পোষণ করতে চান, তাহলে সংশয়ের ফলে আর কিছুই খুঁজে পাবেন না। সংশয়ের জন্য আগে দৃঢ় বিশ্বাসের অস্তিত্ব আপনাকে মেনে নিতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সংশয়গুলো মেনে নেয় যে সংশয়ের ব্যতিক্রম কিছু বিষয় আছে। এগুলো মৌলিক বিস্তৃত বিষয়ের মত যেগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় পরিচালিত হয়।'[১৮০] সুতরাং মৌলিক বা প্রাথমিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসই মূল কিংবা অন্যভাবে বললে প্রাথমিক বা মৌলিক অবস্থান হলো দৃঢ় বিশ্বাস, সংশয় নয়। কারণ শুরুতেই আমরা যদি শিখতে চাই, তাহলে কিছু জিনিসের উপর সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমেই বিশ্বাস করতে হবে, দলীল খুঁজতে হবে না। দার্শনিক শার্ল

---

১৮০. অ্যান্ডি হ্যামিল্টন, ভিটগেনস্টাইন ওয়াকিদ ইয়াকীন, ইবনুন নাদীম ওয়া-দারুর রাওয়াফেদ, ২০১৯, অনুবাদ: মুস্তফা সামীর, পৃ. ৩১২।

স্যান্ডেজ পিয়ার্স বলেন, 'পূর্ণ সংশয় থেকে আমাদের সূচনা করা সম্ভব নয়। বরং আমরা যখন দর্শন পড়া শুরু করব, তখন বাস্তবের ব্যাপারে যত পূর্ব ধারণা রাখি, সেগুলো থেকে যাত্রা শুরু করতে হবে। ... শুরুতেই পূর্ণাঙ্গ সংশয়বাদ নিছক আত্মপ্রতারণা, এটা প্রকৃত সংশয়বাদ নয়। ব্যক্তি সংশয় পোষণ করে কারণ সেটার পক্ষে তার ইতিবাচক কারণ থাকে। ... আসুন, আমরা মনে মনে যেসব বিষয়ে সংশয় পোষণ করি না, দর্শনে সেগুলোতে সংশয় পোষণ করার ভান না ধরি।'[১৮১] এর উপর ভিত্তি করে 'ভিটগেনস্টাইন জ্ঞানের জন্য কিছু মূলনীতি থাকা দরকার এ মর্মে দেকার্তের পরবর্তী যুগে সবাই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে দাবি তোলে, সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।' তিনি বিপরীতে এই 'অ-জ্ঞানতাত্ত্বিক বক্তব্যকে' গ্রহণ করেন।[১৮২]

➢ এমন সংশয় যেটার অস্তিত্ব পূর্বের কোনো বিশ্বাসকে মেনে নিতে বাধা প্রদান করে না। ভুল ও সংশয়ের সম্ভাবনার তত্ত্বীয় অস্তিত্ব আমাদের প্রাথমিক বিশ্বাসকে হুমকির মুখে ফেলে দেয় না। আর ভিটগেনস্টাইনের মতে 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কোনো মাধ্যম বা অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না। এর প্রয়োজনও নেই। সংশয়ের জন্য কেবল মৌলিক কোনো কারণ থেকেই হতে হবে। দার্শনিকভাবে সৃষ্ট কোনো কিছু থেকে নয়।'[১৮৩] আমরা 'অনেক সময়ে যৌক্তিক কারণে অসংখ্য সম্ভাবনাকে গণনার বাহিরে রাখি, যেগুলোর ব্যাপারে সূক্ষ্মভাবে দেখলে বলতে হবে যে, সেগুলো ঘটার মতো নয়; যদি আমরা যা জানার দাবি করি তা বাস্তবে জেনেই থাকি।' দেকার্তের স্বপ্নের যুক্তির উপর এটা প্রয়োগ করলে বলতে হবে, মূল অবস্থা হলো এটা মেনে নেয়া যে আমি স্বপ্নে আছি। বিভিন্ন তত্ত্বীয় সমস্যার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকটা সংশয়ের সাথে এমন তত্ত্বীয় আচরণ করার অসম্ভাব্যতা ব্যক্ত করে ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'কেউ যদি বলে, এই জ্ঞান (প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞান) বিষয়গুলোর বিপরীতে কূটতর্কের মাধ্যমে যে সকল যুক্তি দাঁড় করানো হয় সেগুলোর জবাব না দিলে এগুলো টিকবে না; তাহলে কারো কাছে কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র জ্ঞান টিকে থাকবে না। কারণ মানুষের

---

১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

মনে কূটতর্কের কারণে যে সকল যুক্তি উপস্থিত হয়, সেগুলোর কোনো শেষ নেই।'[১৮৪]

- প্রায়োগিকভাবে বৈধতা পায় কিন্তু দার্শনিকভাবে পায় না এমন সংশয়। যে সকল মৌলিক বিশ্বাসের বিষয়গুলোতে অসুস্থতার কারণে বা খুব জোরাজুরি না করলে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না; সেগুলোর ব্যাপারে একজন ইতিহাসবিদের জন্য সংশয় পোষণ করা সম্ভব **যদি তার কাছে এমন কিছু প্রকাশ পায়** যেটা তাকে সন্দেহে ফেলে দেয়। একজন মুহাদ্দিস মুখস্থে পারদর্শী কোনো এক বর্ণনাকারীর বর্ণনার ব্যাপারে সংশয় পোষণ করতে পারে, যখন সে ঐ বর্ণনাকে অন্য বর্ণনার সাথে তুলনা করে। যেমন, তার চাইতে মুখস্থে আরো দক্ষ কারো বর্ণনা। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সংশয় আমাদের স্বাভাবিক সংশয়ের মতো। আমরা যখন কোনো মানুষের সাথে কথা বলি তখন তার কথার সত্যতার ব্যাপারে সংশয় পোষণ করতে পারি, **যদি প্রাসঙ্গিক কোনো আলামত পাই**। ভিটগেনস্টাইন বলেন, 'এটা হলো কল্পনা বা অনুমান, যাকে অন্যভাবে প্রকাশ করতে হবে।' কারণ দেকার্ত কর্তৃক উপস্থাপিত 'ব্যবহারিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি'[১৮৫] কল্পনা করা সম্ভব নয়।

সারকথা হলো, দেকার্তের পর থেকে জ্ঞানের তত্ত্বগুলো (যেমন: সংশয়বাদ) সমাজ এবং সামাজিক প্রয়োগের দিকগুলোর প্রাধান্য উপেক্ষা করে যায়। সেগুলো মনে করে জ্ঞান হচ্ছে, 'একজন জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের ব্যাপারে প্রদত্ত নির্ভরযোগ্যতার প্রক্রিয়া। আমি যখন এই প্রক্রিয়ার অধিকারী হব, তখন আমি (জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে) জানব যে আমি এটার মালিক।'[১৮৬] আর আমাদের বিবরণমূলক পদ্ধতি মৌলিক তথা প্রাথমিক জ্ঞানের ব্যাপারে উত্থাপিত দার্শনিক প্রশ্নগুলোর জবাব দেয় না। মানুষজন যা জানে, সেটাকে প্রকাশ করার মাধ্যমে আমরা সে সকল দার্শনিক প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিই। অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক কার্যক্রমের বিবরণ দেওয়ার

---

১৮৪. ইবন তাইমিয়্যাহ, দারউ তা'আরুদ্বিল 'আক্বলি ওয়ান-নাক্বল, তাহকীক: মুহাম্মাদ রাশাদ সালেম (৫/২৫৪)।

১৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

১৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

মাধ্যমে। যার মাঝে রয়েছে মানুষদের দ্বারা মৌলিক জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা। এটা তুলে ধরা বা প্রকাশ করার মাধ্যমে একজন দার্শনিক সম্মিলিত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করে, তার উপযুক্ত জবাব প্রদান করা হয়। ভিটগেনস্টাইন বলেন, 'দার্শনিক সমস্যার জন্য (মানুষদের) সম্মিলিত ইন্দ্রিয়ের পক্ষ থেকে কোনো জবাব নেই। একজন মানুষের জন্য সম্মিলিত ইন্দ্রিয়ের বিপক্ষে দার্শনিকদের সব আক্রমণের মোকাবেলা করার উপায় হলো এমন কিছু উপস্থাপন করা, যেটা দেখলে তারা এই সম্মিলিত ইন্দ্রিয়ের উপর আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হবে।'[১৮৭]

উপর্যুক্ত বিবরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে সামাজিক ও পরস্পরের অংশগ্রহণমূলক জ্ঞান ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী হয়, যখন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহু মানুষের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যৌক্তিকভাবে দেখলে জ্ঞানের মূলনীতিসমূহের ব্যাপারে 'দৃঢ় বিশ্বাস' সংশয়ের পূর্বে অবস্থান করে, অর্থাৎ যে মৌলিক জ্ঞান সকল মানুষ জানে সেটার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস। আর জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়কে প্রায়োগিক দৃঢ় বিশ্বাস দুর্বল করে দেয়।

পূর্বের বক্তব্যগুলো প্রয়োগ করে বলব, ইসলামী সমাজে আমরা দেখতে পাই একজন মুসলিম কিছু মৌলিক জ্ঞান ধারণ করে। যেমন- আমাদের বইয়ের বিষয়বস্তু হলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ প্রমাণ করা। আমাদের কাছে যে সকল বর্ণনা পৌঁছেছে, সেগুলোর সমষ্টি সুন্নাহকে তুলে ধরে। আর কোন কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বা প্রত্যাখ্যাত, সেগুলো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হাদীসের আলেমদের বক্তব্য চূড়ান্ত। বর্ণনাগুলো যাচাই করার সূক্ষ্ম মাপকাঠি আছে। এই জ্ঞান একজন মুসলিম 'অ-জ্ঞানতাত্ত্বিক' পদ্ধতিতে অর্জন করে। কেবল একটা মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ বা বেড়ে ওঠার মাধ্যমে সে এই জ্ঞানের অধিকারী হয়। দলীল-নির্ভর জ্ঞানের চাইতে এই জ্ঞান তার রক্তে-মাংসে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। উপর্যুক্ত বক্তব্য অনুযায়ী এই জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদান করা স্বাভাবিকভাবেই যুক্তিযুক্ত। এ ধরনের জ্ঞান মেনে নিতে জ্ঞানতাত্ত্বিক কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়।[১৮৮]

---

১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

১৮৮. তবে কিছু অমুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সমস্যা আছে। স্বাভাবিকভাবেই এই মৌলিক জ্ঞান তাদের কাছে স্বীকৃত বিষয় হবে না। বরং এগুলো শুধুই তত্ত্ব। তাই

মৌলিক বা প্রাথমিক জ্ঞানের আলোচনা শেষ করে এবার আমরা ভিন্ন আলোচনায় যাব, সেটা হলো আধুনিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ইতিহাসশাস্ত্রের একটা অংশ হিসেবে হাদীসশাস্ত্র কতটুকু জ্ঞানসম্মত বলে বিবেচ্য হবে।

২. আদর্শবাদ ও আপেক্ষিকতার মাঝে জ্ঞান

এই অনুচ্ছেদে আমরা 'জ্ঞান'-এর ধরন নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ মানুষের একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যে জ্ঞান সৃষ্টি করে সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে। যেমন- বিজ্ঞান। এক্ষেত্রে আমরা বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব এবং জ্ঞানের ইতিহাসে সেগুলোর প্রভাবের উপর আলোকপাত করব।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মেটাফিজিক্সের বিরোধিতা করে এমন বিজ্ঞানমনস্ক একটা গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। এদেরকে 'যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ' (Logical Positivism)-এর অনুসারী বলে গণ্য করা হয়। তাদের কাজ মূলত উনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই বর্ধিত রূপ, যেটার ঐতিহাসিক বিবরণ আমরা প্রথম অধ্যায়ে দিয়েছি। এছাড়াও তারা ছিল বিজ্ঞানবাদিতার চরমপন্থার বহিঃপ্রকাশ। বিজ্ঞানবাদী এবং প্রচলিত দৃষ্টবাদী থেকে তারা কীভাবে আলাদা, সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। আমরা তাদেরকে উল্লেখ করব দেকার্তের পর থেকে সর্বশেষ বারের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আদর্শবাদী জ্ঞানের আহ্বানের উদাহরণ প্রদানের জন্য। এই জ্ঞান বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং ক্রম-উন্নতি সাধন করে। এটার নমুনা হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। এর একমাত্র মাধ্যম হলো অনুসন্ধান। তবে এদেরকে পৃথক করে এমন একটা মৌলিক উপাদান আছে, যেটা উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ তারা প্রচলিত বিজ্ঞানবাদী চিন্তার থেকে ভিন্নভাবে বিষয়টা গ্রহণ করেছে। সেই উপাদানটা হলো 'যাচাইয়ের যোগ্যতা থাকা'। এর

আমরা চতুর্থ অধ্যায় রেখেছি যেন সেখানে প্রাচ্যবিদদের উত্থাপিত মৌলিক অভিযোগগুলোর খণ্ডন করা যায়। আমরা আবারও বলছি, যে মুসলিম ঐ সকল সংশয় পড়ে না বা খণ্ডনও পড়ে না, স্বাভাবিকভাবেই মৌলিক জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদান (অ-জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে) করে, মুসলিম হিসেবে তার অবস্থান বৈধ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে সেটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কিছু নেই।

সারকথা হলো— বাক্যের অর্থ নির্ভর করে সেটা যাচাইয়ের পদ্ধতির উপর। আপনি একটা বাক্যের অর্থ জানেন মানে হলো আপনি জানেন কীভাবে সেটা যাচাই করতে হবে। যদি কোনো বিষয় যাচাই করার উপায় না থাকে, তাহলে সেটা অর্থপূর্ণ নয়। যাচাই (Verification) বলতে দৃষ্টবাদীরা বোঝায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই। আর পর্যবেক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সব ধরনের কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে দৃষ্টবাদিতাকে আলাদা করে ভাষাগত দিক। ভাষা হচ্ছে বাস্তবতার এমন বিবরণ, যেটা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির উপর নির্ভর করে। দৃষ্টবাদিতাকে আরো আলাদা করে প্রাকৃতিক দিক। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভাষাকে বিশ্বের বিবরণ দেওয়ার উপযুক্ত উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা। নিঃসন্দেহে এই কাজ ইতিহাসকে জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। বিখ্যাত বিজ্ঞান দার্শনিক কার্ল পপার যৌক্তিক ইতিবাদের কঠোর ও বারংবার সমালোচনা করায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। আমরা আমাদের প্রসঙ্গের সাথে মিলে এমন সমালোচনাসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করব। অনুসন্ধানের সমস্যার সমাধান উদঘাটনের ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতির অক্ষমতার কথা কার্ল পপার স্পষ্ট করেছেন। পর্যবেক্ষণ আর নিয়মের মাঝে সবসময় একটা দূরত্ব থাকে। আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গুটিকয়েক জিনিস পর্যবেক্ষণ করতে পারি, সেখান থেকে একটা নিয়মের সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। কিন্তু একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে সকল পদার্থ যাচাই করে বলা সম্ভব নয় যে, 'পদার্থগুলো গরমে বিস্তৃতি লাভ করে।' কিন্তু সে নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটা নিয়ম দাঁড় করিয়ে ফেলে। হিউমের উত্থাপিত সমস্যা এবং সেটার ব্যাপারে হিউমের বুঝের সমালোচনায় পপার লম্বা আলোচনা করেছেন।[১৮৯] **তার সমালোচনার সারকথা হলো, একজন বিজ্ঞানী স্বচ্ছ পর্যবেক্ষক হিসেবে পরীক্ষণ শুরু করে না, বরং তার নির্দিষ্ট একদিকে ঝোঁক থাকে।** তিনি বলেন, 'পর্যবেক্ষণ সবসময় তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাছাইকৃত। নির্দিষ্ট বিষয়ে, নির্ধারিত কাজে বা প্রয়োজনে বাছাইকৃত সমস্যা এটাকে প্রভাবিত করে। পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য থাকে দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই। সমস্যা হলো একজন বিজ্ঞানী কোথা থেকে শুরু করবে? নিছক স্বচ্ছ পর্যবেক্ষণ না- যেমনটা অনুসন্ধানের পক্ষের লোকেরা বলে থাকেন। তার জন্য কী কী পর্যবেক্ষণ বা লিখে রাখা সম্ভব? একজন

---

১৮৯. ইউমনা তারীক আল-খূলীর 'ফালসাফাতু কার্ল পপার: মানহাজুল ইলম, মানত্বিকুল ইলম' বইটি পড়ুন।

বিজ্ঞানীকে অবশ্যই একটা তত্ত্ব জানতে হবে, যাব উপর ভিত্তি করে সে পর্যবেক্ষণ করবে।"[১৯০] তাই পপার মনে করেন কোনো নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রকৃত যাচাই হয় সেটাকে অবিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে, সেটার উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনার মধ্য দিয়ে না। পপারের বৈজ্ঞানিক দর্শন এবং সেটার সমালোচনাকে একপাশে রেখে বলতে হবে[১৯১], বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমানের ভূমিকা এবং জ্ঞানের মানবীয় দিক ইতিহাসকে 'জ্ঞান' বলে বিবেচনা করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটা যুক্তি। কারণ মানুষের জটিল কার্যক্রম বোঝার ক্ষেত্রে ইতিহাসশাস্ত্রে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের বড় ভূমিকা আছে। পাশাপাশি এটা তাকে বিজ্ঞানের নীতিসমূহের কাছাকাছি নিয়ে যায় এবং পর্যবেক্ষণ ও উদঘাটনের মাঝে সমন্বয় সাধন করে।

কিন্তু ১৯৬২ সালে একটা বই প্রকাশ পায় যেটার বড় প্রভাব পড়ে মানবিক বিদ্যাসমূহে, তন্মধ্যে একটা বিদ্যা ইতিহাসশাস্ত্র। সেটা হলো দার্শনিক টমাস কুনের বই: 'দ্যা স্ট্রাকচার অফ সায়েন্টিফিক রেভলুশন্স'। এই বইয়ের দ্বৈত ভূমিকা ছিল। কারণ এটা মানবিক বিদ্যার অবস্থানকে অনেক উপরে নিয়ে আসে, যেটা কিনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনেক পেছনে ছিল। আবার একই সময়ে যেকোনো ধরনের পদ্ধতিগত জ্ঞানকে হুমকির মুখে ফেলে, হোক সেটা প্রাকৃতিক বা মানবিক বিদ্যা। এই বই জ্ঞানকে 'আপেক্ষিক' করে দেয় এমন অভিযোগ তোলা হয়, তাই অল্প কথায় এটার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা জরুরী।

টমাস কুন মনে করেন বিজ্ঞান তিন ধাপে অগ্রগতি সাধন করে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই তিনটা ধাপ বারবার অতিক্রান্ত হয়:

- বিজ্ঞানপূর্ব পর্যায়: যেখানে একদল বিজ্ঞানী থেকে এলোমেলোভাবে কোনো এক বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম প্রকাশ পায়।
- বিজ্ঞানের স্বাভাবিক পর্যায় (Normal Science)।

---

১৯০. ইউমনা আল-খূলী, ফালসাফাতু কার্ল পপার: মানহাজুল ইলম, মানতিকুল ইলম, পৃ. ১৩৯।

১৯১. দেখুন আমার (লেখকের) বই 'নাহ্‌য়া মানহাজিন ওয়াসফিয়্যিন লিল-ইলম', মারকাযু বারাহীন, ২০১৯।

- বিজ্ঞানের বিপ্লবের পর্যায়, যে সময়ে পূর্বের জ্ঞানের বদলে স্বতন্ত্র একটা পদ্ধতি স্থাপন করা হয়।

এরপর এই পর্যায়গুলো বারবার ঘটতে থাকে।

তিনি মনে করেন বিজ্ঞান একটা নির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক প্যারাডাইমের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেটা বিজ্ঞানের যাবতীয় তত্ত্ব, অনুমান, প্রয়োগের পদ্ধতি ও দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে। এই নমুনাটা সুশৃঙ্খল জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তিদের কাছে একটা আদর্শ বিজ্ঞানভিত্তিক নমুনা বলে গণ্য হয়। সুশৃঙ্খল জ্ঞানের যুগে গবেষণার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো দেখা যায় এবং যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করে। এই সুশৃঙ্খল জ্ঞানের দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে জ্ঞানের অঙ্গনে একটা নীরবতা বজায় থাকে। অবশেষে নমুনায় ফাটল দেখা দেয়, যখন ঐ জ্ঞানীদের গোষ্ঠী থেকে কিছু মানুষ বেরিয়ে পড়ে। এই ফাটলের ফলে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটে। বিজ্ঞানীরা পুরাতন নমুনার বদলে নতুন একটা নমুনাকে গ্রহণ করে। যেমন- টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্বের পরিবর্তে কোপার্নিকাসের তত্ত্ব অথবা নিউটনের তত্ত্বের পরিবর্তে আইনস্টাইনের তত্ত্ব। টমাস কুন বিজ্ঞানের দার্শনিক এবং বিজ্ঞানের ক্রম উন্নতির ইতিহাস রচয়িতাদের মাঝে প্রচলিত একটা বিশ্বাসের সমালোচনা করেন। সেটা হলো, বিজ্ঞান সবসময় কিছু নতুন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বিজ্ঞানীরা নতুনভাবে কোনো বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পেলে সেটাকে বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করে, অথবা ভুল পেলে সেটাতে সংশয় পোষণ করে। বরং পশ্চিমা বিশ্ব বিজ্ঞানের যে বিপ্লব দেখেছে, সেটা বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে প্রমাণ নয়। সুশৃঙ্খল জ্ঞান আবশ্যকীয়ভাবে নতুন নতুন বাস্তবতা তৈরি করে না। বরং এগুলো কিছু ধাঁধার মতো, যেগুলোর সমাধান বিজ্ঞানীরা করে। তারপর তাদের অনুসরণীয় নমুনার ছায়ায় সেগুলো স্তূপীকৃত করে রেখে দেয়। সুশৃঙ্খল জ্ঞানের সময়ে অর্জিত এই স্তূপগুলোর অধিকাংশই বিজ্ঞানের বিপ্লবের সময়ে এসে আর অবশিষ্ট থাকে না। বরং সেগুলোর জায়গায় নতুন আবিষ্কার জায়গা করে নেয়।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ পরীক্ষণের মাধ্যমে সেগুলোর সত্যতার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আনা সম্ভব, এই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে কুন। তিনি মনে করেন বিভিন্ন আলামত যাচাই নির্ভর করে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের পর

অনুসন্ধানের উপর। এগুলোর মাধ্যমে তত্ত্বের সত্যতা বা ভুল জানা যায়। পপারের সাথেও কুন দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, যে সকল বিজ্ঞানী জ্ঞানের সুশৃঙ্খল নিয়মনীতি মেনে চলেন, তাদের দৈনন্দিন প্রায়োগিক কার্যক্রমে কোনো তত্ত্বকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার মতো ব্যাপার ঘটে না। কারণ কোনো তত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক বিচ্ছিন্ন অবস্থার প্রকাশ এমন তত্ত্বকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট না, যেটার অনুসরণ করে বিজ্ঞানীদের গোষ্ঠী। তার মতে, সুশৃঙ্খল জ্ঞানের পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা তাদের নমুনার খণ্ডনের নানা পন্থার খোঁজ বা যাচাই করে না। তারা বিচ্ছিন্ন নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে একটা আদর্শ নমুনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে দেয় না। অর্থাৎ তারা কিছু নির্দিষ্ট তত্ত্বের নমুনার অভ্যন্তরকে শুধু মিথ্যা সাব্যস্ত করে, সরাসরি নমুনাকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অবস্থা বারবার আসার ফলে শেষ পর্যন্ত তত্ত্বের সংহতি হুমকির মুখে পড়ে এবং ফাটল দেখা দেয়। বিজ্ঞানীদের মাঝে তখন বিভক্তি দেখা দেয় যে এই নমুনা কি টিকে থাকার উপযুক্ত কিনা। বিজ্ঞানীদের গোষ্ঠী নির্ধারণ করে দেয় কখন পুরাতন নমুনাকে বাতিল করে নতুন নমুনাকে গ্রহণ করা হবে। **কুন যে বিষয়টাতে বেশ জোর প্রদান করেন সেটা হলো এই সিদ্ধান্ত যৌক্তিক পন্থায় গৃহীত হয় না- যেমনটা বিজ্ঞানকে যারা আদর্শ জ্ঞান করে তারা মনে করে থাকে।**

অ্যালেক্স রুজেনবার্গ বলেন, 'বিপ্লবীরা যখন একটা নতুন নমুনা দাঁড় করায়, তখন তারা কোনো নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে না যেটার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে এটা বেশি যৌক্তিক পন্থা। অনুরূপভাবে তাদের বিপরীতে তাদের চাইতে বয়স্ক এবং গভীরতার অধিকারী ব্যক্তিরা যখন পুরাতন নমুনাকে আঁকড়ে ধরে সেটার পক্ষে লড়াই করে, তখন তারাও অধিকতর যৌক্তিক পন্থার অনুসরণ করে না।'[১৯২] সুতরাং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অর্থ বিজ্ঞানীদের মাঝে নমুনায় বিদ্যমান অধিকাংশ ধাঁধাঁ সমাধান করার যোগ্যতা থাকা। কোনো তত্ত্বকে যাচাই করার মাপকাঠি স্থিত কিছু নয়, এটা বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র নয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ অধিকাংশ সময়ে পূর্বের

---

১৯২. অ্যালেক্স রুজেনবার্গ, ফালসাফাতুল ইলম: মুকাদ্দিমাতুন মুয়াসিরা, আল-মারকাযুল কাওমি লিত-তার্জামা, অনুবাদ: আহমদ আস-সামাহী, ফাতহুল্লাহ আশ-শাইখ, পৃ. ২৭৮।

মতামত ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং বিজ্ঞান অগ্রগতিমূলক কিংবা নিরপেক্ষ নয়। তারপর কুন বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে এর পক্ষে অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেন।[১৯৩]

তাই বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'নিরপেক্ষতা'কে উপস্থাপন করার বিষয়টা কুন সংশয়ের চোখে দেখেছেন। তার বক্তব্যের কারণে সে সময়ে এসে মানবিক বিদ্যাও 'জ্ঞান' হিসেবে কতটুকু উপযুক্ত সেটা নিয়ে বিদ্যমান তর্কে মানবিক বিদ্যা এগিয়ে যায়। কেননা কুন বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেন যে প্রত্যেকটা বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমে পর্যবেক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রভাব আছে। তত্ত্বকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ বা গবেষণার কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেই, যেমনটা দৃষ্টবাদীরা বা কার্ল পপার কিংবা অন্যরা বলে থাকে। তাই ইতিহাসের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে যে আপত্তি তোলা যায়, বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতার ব্যাপারেও সেই আপত্তি তোলা যায়। কারণ 'ইতিহাসের দর্শনে নিরপেক্ষতা মোটাদাগে দর্শনে বিদ্যমান নিরপেক্ষতার সাথে সম্পৃক্ত।'[১৯৪] কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে যেকোনো বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের সত্যতার উপর কুনের এই বইটা বড় ধরনের প্রভাব ফেলে, হোক সেটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিংবা মানবিক বিজ্ঞানের চর্চা। কুনের পর থেকে কোনো বিজ্ঞানীর জন্য 'বিজ্ঞানের আপেক্ষিকতার' যুক্তিগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে ইতিহাসের দর্শনে যারাই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তারা কুনের যুক্তিগুলোর পর্যালোচনা করে অগ্রসর হয়েছেন। উল্লেখ করা জরুরী যে, কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে (পরীক্ষণের উপযুক্ততা, মিথ্যার সম্ভাবনা) জ্ঞান এবং 'অ-জ্ঞান' পৃথক করা তথা এই দুইয়ের মাঝে সীমারেখা টেনে দিয়ে কোনটা 'জ্ঞান' আর কোনটা 'জ্ঞান' নয় সেটা নির্ণয় করার চিন্তা কুনের পর থেকে প্রায় পরিত্যক্ত। কারণ কুন এমন পার্থক্য করার লক্ষ্যে অগ্রসর হননি। তিনি 'বিজ্ঞানের যৌক্তিকতা'-কেই সন্দেহ করেছেন। ফলে 'বিজ্ঞান' অন্য কোনো মানবীয় কার্যক্রম থেকে আলাদা হওয়া সম্ভব না। তাই যদি হয় তাহলে আপেক্ষিকতার উপর্যুপরি আক্রমণের পরও ঐতিহাসিক জ্ঞান কীভাবে 'সম্ভাব্য' থাকে?

---

১৯৩. আল-মা'রেফাতুত তারীখিয়্যাহ ফিল-গার্ব, পৃ. ১২৫-১৩১।

১৯৪. Aviezer Tucker, ed., 2009, p. 172.

৩. ইতিহাসের নিরপেক্ষতা

মৌলিক জ্ঞানের ব্যাপারে সংশয় থেকে বের হওয়ার সমাধান যেমন দেকার্তের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির পরিবর্তে 'বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে' বিদ্যমান, তেমনিভাবে বিজ্ঞানের আপেক্ষিকতা থেকে বেরিয়ে আসার সমাধান বিজ্ঞানের 'বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে' বিদ্যমান। টমাস কুন প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানের যে নমুনা পেশ করেছেন, সেটা বিজ্ঞানের প্রকৃত বিবরণ না। বরং এটা তত্ত্বীয় একটা নমুনা মাত্র। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের প্রদত্ত নমুনা বা কল্পনা পপারের প্রদত্ত নমুনার মতো এটা একটা নমুনা। কুন বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে বাছাই করে তার নমুনার সাথে যেগুলো মিলে যায়, সেগুলো নিয়েছেন। বিজ্ঞানের দার্শনিক 'ল্যারি লোডান'সহ আরো কয়েকজন কুনের উদাহরণের সাথে সাংঘর্ষিক উদাহরণ দেখিয়েছেন। 'বিজ্ঞানের বিপ্লব' এবং 'যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানের' মাঝে সৃষ্ট শক্ত সীমারেখা অবাস্তব। কুন যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার চাইতে বিজ্ঞানের যাত্রা আরো জটিল। কিন্তু এই টেকনিক্যাল সমালোচনা আমাদের কাছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ না।[১৯৫] আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'লোডান' কি বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেটা মেনে চলেছেন কিনা। কুন বা তার পরবর্তীতে আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা বিজ্ঞানে বিদ্যমান 'অযৌক্তিক' প্রভাবকের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। এটা স্বাভাবিক। কারণ আমরা মানুষ। এছাড়াও কুন জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এটা নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই। **কারণ 'যৌক্তিকতা' কী সেটা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও কুনও যাত্রা শুরু করেছেন দৃষ্টবাদিতার ভূমি থেকে।** যেমন: 'এই তত্ত্ব কি পূর্বের তত্ত্বসমূহের চাইতে বেশি ঘটনার ব্যাখ্যা করে? এটার পক্ষে কি পূর্ববর্তী তত্ত্বে বিদ্যমান পরীক্ষণ-নির্ভর কিছু বিচ্ছিন্নতার সমাধান করা সম্ভব?'[১৯৬] ল্যারি লোডান যেমনটা ব্যাখ্যা করেছেন— এই 'যৌক্তিকতা' মূলত 'যৌক্তিকতার একটা রূপ'। **এটা বিজ্ঞানের ইতিহাসের সাথে সাংঘর্ষিক, যেটা**

---

১৯৫. আমার বই 'নাহুয়া মানহাজিন ওয়াসফিয়্যিন লিল-ইলম' এর তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

১৯৬. ল্যারি লোডান, আত-তাকাদ্দুম ওয়া-মুশকিলাতুহু: নাহুয়া নাযারিয়্যাতিন 'আনিন-নুমুয়্যিল ইলমী, আল-মারকাযুল কওমী লিত-তর্জমা, অনুবাদ: ফাতিমা ইসমাঈল, পৃ. ৯১।

অনুসারে বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সমস্যার সমাধান করা, বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করা নয় (যেমনটা দৃষ্টবাদীরা দাবি করে)। সুতরাং আমাদের উচিত বিজ্ঞান বাস্তবতার বিবরণ কতটা সত্যভাবে করে সেটার মূল্যায়ন করা থেকে বিরত থাকা। বিজ্ঞানকে আমাদের সমস্যাসমূহ সমাধানের একটা উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা। লোডান বলেন, 'আমার গবেষণা দাবি করে, কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে একটা কাঠামো হিসেবে দেখা মূলত এমন দৃষ্টিভঙ্গি, যেটা অনেক উচ্চাশা রাখে। সেই উচ্চাশা হলো অন্য যেকোনো কাঠামোর তুলনায় বিজ্ঞান যে বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা সেটাকে অনুধাবন করতে পারা।' আমরা এমনটা করলে স্পষ্ট হবে যে 'বিজ্ঞানের দর্শনে অধিকাংশ প্রথাগত সমস্যা এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসে মাপকাঠির পর্যায়ে থাকা বেশ কিছু বিষয় এখন খুবই মতভেদপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে; বিশেষত যখন আমরা বিজ্ঞানকে কোনো সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম বলে গণ্য করছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা প্রমাণ করব যে বিজ্ঞানের একটা সুচিন্তিত বিশ্লেষণ এমন অনেক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিবে, যেগুলো বর্তমান বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতা ও বিজ্ঞান-দার্শনিকদের প্রচলিত অনেক ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক হবে।'[১৯৭] লোডান বেশ নিশ্চয়তার সাথে ব্যক্ত করেন যে, তত্ত্বসমূহ মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে 'এটা লক্ষ্য রাখা খুব দরকারী যে, তত্ত্বগুলো কতটুকু 'সত্য' বা 'সমর্থনপ্রাপ্ত' অথবা আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে সেগুলোর কতটুকু বৈধতা দেওয়া সম্ভব সেটা যাচাইয়ের চাইতে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কতটুকু উপযুক্ত ও যথাযথ সমাধান দেয় সেটা দেখা।'[১৯৮] লোডানের যুক্তি অনুযায়ী আধুনিক বিজ্ঞানের বেশ কিছু দার্শনিক পদার্থ বা রসায়নের কিছু মূলনীতি ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহের সত্যতাকে অস্বীকার করেন। কেউ কেউ সত্যতার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যান, কাজের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেন।

ইতিহাসশাস্ত্রে এটা প্রয়োগ করলে আমরা দেখতে পাই, দৃষ্টবাদীরা যে ভুল করে তা হলো, সামাজিক প্রয়োজন, সামাজিক চর্চা, সামাজিক ধ্যান-ধারণা, ইতিহাসবিদের উদঘাটনমূলক অনুমান, ইতিহাসবিদের পক্ষপাতিত্ব বা (কোনো

১৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

এক ইতিহাস দার্শনিকের ভাষায়) 'গোপন আবেগ'— এর কোনোটি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু সেটার কারণে ইতিহাসের যেমন 'যৌক্তিকতা' হ্রাস পায় না, তেমনিভাবে অন্য কোনো শাস্ত্রের 'যৌক্তিকতা'ও কমে যায় না। কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আদর্শবাদী যৌক্তিকতা নিছক কল্পনাই। আর অবিনির্মাণবাদীদের ভুল হলো 'তারা বর্তমানে ইতিহাস চর্চায় বিদ্যমান মৌলিক জটিলতার ব্যাপারে উদাসীন।'[১৯৯] বরং ব্যাপকভাবে বললে ইতিহাস চর্চার ব্যাপারেই তারা উদাসীন। তারা জানে না যে, ইতিহাসবিদের উদঘাটন ও অনুমান স্বাধীন না। বরং সেগুলো 'বিভিন্ন উৎস থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে অর্জিত, আর সেগুলো অবিনির্মাণবাদী চিন্তাধারার বিপরীতে প্রথম ঢাল।'[২০০] এমন শর্ত প্রদান বিজ্ঞানে সাধ্যমত নিরপেক্ষতার সুযোগ প্রদান করে। আর মানবীয় এই নিরপেক্ষতা গ্রহণ না করা মূলত অন্য কথায় 'আদর্শবাদী বীরোচিত' জ্ঞান কামনা করার মতো, যেটা খোঁজ করে বেড়ায় দৃষ্টবাদীরা। এটা 'বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে পার্থক্য ধ্বংস করে দেয়। একজন লেখক টেক্সট থেকে সত্য বের করে আনার জন্য যে ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা চালায়, সেটাকে অনর্থক কাজ হিসেবে গণ্য করে।'[২০১] এটা সত্য যে, 'ইতিহাসবিদদের হাতে এমন কোনো জাদুর কাঠি নেই যেটা দিয়ে তারা অতীতে প্রবেশ করতে পারে। তবে তারা নিশ্চিত হতে পারে যে, তাদের ঐতিহাসিক বিবরণ বিদ্যমান বিভিন্ন আলামতের অভিনব ব্যাখ্যা প্রদানেরই অংশ; ফলে তারা এ সকল বিবরণের সত্যতার উপর নির্ভর করে।'[২০২] অনেক বড় বড় ইতিহাসবিদ চূড়ান্ত মাত্রার নিরপেক্ষতা অর্জনের জন্য বড় ধরনের শর্ত দিয়েছেন। যেমন- ইতিহাসবিদ এভিয়েযার টাকার (Aviezer Tucker) সঠিক ইতিহাস জানার জন্য কিছু শর্ত প্রদান করেছেন। সেগুলো হলো:

(১) জ্ঞানের ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মাঝে ঐকমত্য।

(২) ঐকমত্য হবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ইতিহাসবিদদের মাঝে। অর্থাৎ তারা রাজনৈতিক মতামত বা দার্শনিক মতাদর্শের দিক থেকে ভিন্ন

---

১৯৯. মুন্সলো, দিরাসা তাফকিকিয়্যা লিত-তারীখ, পৃ. ১২২।

২০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

২০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

২০২. কাইস মাম্বী, আল-মা'রিফাতুত তারীখিয়্যা ফিল-গার্ব, পৃ. ১১০।

হবে। এভাবে নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে যে, একই আদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণে তারা ঐকমত্য পোষণ করেনি।

(৩) ইতিহাসবিদদের একটা বড় সংখ্যা এই ঐকমত্যে অংশ নিবে।[২০৩]

কিন্তু ইতিহাসের সত্যতার প্রশ্নে কী হবে? এটা কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের থেকে ভিন্ন হবে? আমরা এখানে মেনে নিব যে, **একজন বিজ্ঞানী যত বৈচিত্র্য সহকারে বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবে, তার জন্য নিরপেক্ষতা ও সত্যতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।** পদার্থবিজ্ঞান বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুমিত তথ্যে পূর্ণ। পাশাপাশি থাকা প্যারাডাইমের সংখ্যা অনেক। অধিকন্তু একটা নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সম্ভাব্য অনেক তত্ত্ব বিদ্যমান। সুতরাং নিরপেক্ষতা থেকে দূরে থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু ইতিহাসে অনুধাবন করার জাল ততটা সুবিস্তৃত নয়, ফলে একজন আধুনিক ইতিহাসবিদ সরাসরি টেক্সটে প্রবেশ করে এবং সেটার লেখকের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রসঙ্গের খোঁজ করে। এর মাধ্যমে সে কথকের বক্তব্যের অর্থ বুঝতে পারে। পদার্থবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মাঝে পার্থক্য জানা যায় ইতিহাসের ব্যাপারে খুব প্রসিদ্ধ একটা সমস্যার জবাবে, যেটা হলো ইতিহাসের পাতায় থাকা অতীত ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি হওয়ার অসম্ভাব্যতা। পুনরাবৃত্তি ঘটার সক্ষমতা সাধারণত বিজ্ঞানের থাকে। কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বেশ কিছু পরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে একটা নির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল বিষয়ের প্রভাবক নির্ণয়ে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল উপাদানের প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। (আমরা 'সাধারণত' বললাম কেননা বিজ্ঞানের কিছু বিষয় পুনরায় ঘটে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে সকল বিষয়ে গবেষণা চালায়, সেগুলো তারা নিয়ন্ত্রণ করে না। অনুরূপ অবস্থা ভূতত্ত্ববিদদেরও। তারা যে সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়, সেগুলোর মাঝে অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের সম্ভাবনা রাখে না)[২০৪] অন্যদিকে ইতিহাসে পুনরাবৃত্তির সুযোগ নেই। কিন্তু 'একজন দক্ষ ইতিহাসবিদ তার পরীক্ষণের যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অতীতের ঘটনাবলি বারংবার স্মরণ করতে পারে না, যেমনটা একজন বিজ্ঞানী পুনরায় যাচাই করার লক্ষ্যে

২০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

২০৪. Aviezer Tucker ed. 2009 p.20.

বিভিন্ন পরীক্ষণে এমনটা করে থাকে। তবে সেটা দুর্বলতার কোনো উপাদান নয়, বরং শক্তিমত্তার উপাদান; যা ইতিহাসকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে। কারণ দক্ষ ইতিহাসবিদ মৃত অতীতের বাস্তবতাকে স্বতন্ত্রভাবে খুঁজে। অন্যদিকে বিজ্ঞানী যেকোনো ঘটনার প্রকৃতির ব্যাপারে এমন কিছু প্রশ্ন দাঁড় করায়, যেগুলো সবসময় সে যা কিছু প্রমাণ করতে ইচ্ছুক তার সাথে মিলে যায়। তার এ সকল পরীক্ষণের লক্ষ্য থাকে ঈপ্সিত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন অথবা দৃঢ়ভাবে নাকচ। ... সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান একটা কৃত্রিম কাঠামো, কেননা সেটা প্রকৃতির বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কৃত্রিম উপস্থিত বিষয় এবং গৌণ উপাদান দিয়ে যাচাই করে থাকে।'[২০৫]

উপর্যুক্ত বক্তব্য অনুযায়ী আমরা বলব, ইতিহাস যতটা কাঠামোগত শাস্ত্র, তার চাইতে উদঘাটনমূলক শাস্ত্র।

তবে বলা হতে পারে 'মানবিক বিদ্যা' হিসেবে ইতিহাসে পক্ষপাতিত্ব বিজ্ঞানের যেকোনো শাস্ত্রে বিদ্যমান পক্ষপাতিত্ব থেকে বৃহৎ। আমরা সেটা মেনেও নিব। **কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, ইতিহাসের সাথে জড়িত সকল ব্যবহারিক শাস্ত্রে পক্ষপাতিত্বের মাত্রা সমান।** স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ইতিহাসকে এক প্রকার অনুধাবন আর ইতিহাসকে এক প্রকার নথিপত্র হিসেবে দেখা—এ দুটি বিষয় আমাদের আলাদা করতে হবে। কারণ ইতিহাসচর্চার সত্যতা নিয়ে সামগ্রিকভাবে বলা বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। মৌখিক বর্ণনার আধুনিক ইতিহাস অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট ঘটনা যে প্রজন্ম শুনেছে সে প্রজন্ম অথবা তৎপরবর্তী প্রজন্মের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের (যারা সরাসরি শোনেনি কিন্তু পূর্বের প্রজন্ম থেকে শুনেছে) ব্যাপারে সঠিক ঐতিহাসিক জ্ঞানে পৌঁছানোর দুটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপ হলো তাদের বক্তব্যগুলোর অডিও রেকর্ড সংগ্রহ। দ্বিতীয় ধাপ হলো সেই বক্তব্যগুলো অনুধাবন ও সেগুলোর মাঝে সমন্বয়। নিঃসন্দেহে প্রথম ধাপে (সমন্বয়) কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে (অনুধাবন) পক্ষপাতিত্ব আছে। যে বইগুলো ইতিহাসকে জ্ঞান হিসেবে মেনে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি পেশ করে, সেগুলো অনুধাবনের এই ধাপের ক্ষেত্রেই ইতিহাসের পক্ষ নেয়। কারণ প্রথম ধাপে মানবীয় অনুধাবনের জাল পাতার কোনো সুযোগ নেই।

২০৫. কাইস মাদ্বী, আল-মা'রিফাতুত তারীখিয়্যা ফিল-গার্ব, পৃ. ১০৪।

ইলমুল হাদীস তথা হাদীসশাস্ত্র পদ্ধতিগতভাবে নথিপত্রের মাধ্যমে সংকলিত ইতিহাসের অধীন, আর এটা দুটি বিষয়ের অধীন:

(১) সকল বর্ণনাকে সংরক্ষণ (আমল করা নয়) করা। আর যে সকল বর্ণনাকে দুর্বল বলার ব্যাপারে ঐকমত্য আছে বা মুহাদ্দিসরা দুর্বলতার বিষয়টা প্রাধান্য দিয়েছে সেগুলোকে মুছে না ফেলা। কেননা 'বাস্তবতার ব্যাপারে আমরা যে ঐতিহাসিক জ্ঞানই লাভ করি না কেন সেটা এই বর্ণনাসমূহের থেকে পেতে হবে। হাদীসগুলো নিয়ে খেল-তামাশা করা বা সেগুলো থেকে পছন্দমত বাছাই করার অর্থ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হারিয়ে বসা, যার কোনো বিকল্প খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। ... মানবীয় ইতিহাসে জীবনীশাস্ত্রের সাথে জড়িত মুখস্থের মাধ্যমে সংকলিত সর্ববৃহৎ কাজ ছিল এটা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ যেখানে মুসলিমদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ, সেখানে তার জীবনীর প্রতিটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বর্ণনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ: হোক সেটা তার কথা বা কাজ। এমনকি তিনি অন্যদের যে কাজ করতে দেখে আপত্তি করেননি, সেটাও এর অন্তর্ভুক্ত।'[২০৬]

(২) বিপুল সংখ্যক বর্ণনার মাঝে তুলনা। হাদীসের সমালোচক বর্ণনা কারীদেরকে তাদের সমকালীন বর্ণনাকারীদের সাথে তাদের যোগাযোগ ও সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করে থাকেন। তাদের বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ বর্ণনাকারীদের সাথে তুলনা করেন। এছাড়া তাদের ধার্মিকতা ও মুখস্থশক্তি যাচাই করেন। অধিকন্তু বর্ণনাকারীদের সমকালীন হাদীস সমালোচকদের মূল্যায়নের উপরও নির্ভর করে থাকেন। তুলনা করাটা ইলমুল হাদীসে একটা মৌলিক উপাদান, হোক সেটা বর্ণনাসমূহের মাঝে কিংবা বর্ণনাকারীদের মাঝে। আর বর্ণনা ও বর্ণনাকারী একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তির দিকে একটা টেক্সট সম্বন্ধযুক্ত করা হলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রসঙ্গের আলোকে সেই টেক্সটের উপর সিদ্ধান্ত

২০৬. জন ওয়ালব্রিজ, আল্লাহ ওয়াল-মানত্বিক ফিল-ইসলাম: খিলাফাতুল আক্বল, মারকায নামা, ২০১৮, পৃ. ৭৯-৮০।

প্রদান এবং টাকারের উল্লিখিত সমন্বয়ের খোঁজ করার মতো কাজের তুলনায় বর্ণনাকারীদের সমালোচনা আর বর্ণনাসমূহের মাঝে তুলনা করার কাজটা সহজ। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শাস্ত্র ইতিহাসের উপর গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান সুযোগ প্রদান করেছে, যেটাকে মৌখিক ইতিহাসের পক্ষাবলম্বী যেকোনো ইতিহাসবিদ কাজে লাগাতে চাইবে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এমন কিছু উল্লেখ করব যা নৃতাত্ত্বিকভাবে এই সমালোচনার অস্তিত্ব প্রমাণ করে, সেটা সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে সুন্নাহ সংকলনের সময় পর্যন্ত। আর প্রাচ্যবিদরা শরয়ী টেক্সটগুলোর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কোনো গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি উপস্থাপন করেনি। তবে আমাদের জন্য এখানে নিম্নের বিষয়গুলো জানা যথেষ্ট:

- হাদীসশাস্ত্র একটা বানানো শাস্ত্র।[২০৭] এটা ঐতিহাসিক গবেষণার একটা রূপ। কিন্তু এর বাস্তবায়নের রূপটা ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে; কেননা এটা একটা সংকলনমূলক কাজ, যেটা ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে ঘটে থাকে; যেমনটা আধুনিক মৌখিক ইতিহাসে উপকরণ সংকলনের ক্ষেত্রে ঘটে। এখানে অনুধাবনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবের বাহিরে স্বতন্ত্র কোনো অনুধাবনের জাল নেই। বরং এটার জন্য কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, যেগুলো বর্ণনা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাভাবিক কার্যকলাপের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়; তবে নিয়ম মাফিক।
- নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো বর্ণনা গ্রহণ ও তার উপর নির্ভর করা। যে বর্ণনা নির্ভরযোগ্য ও মুখস্থশক্তির অধিকারী কারো হয়ে থাকবে, আর ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞানের বিরোধী হবে না। আবার দক্ষ বর্ণনাকারীদের বর্ণনা জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে বৈধ এমন কোনো ঘটনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। এটাই মূল অবস্থা, আর মূলের বাহিরে কোনো প্রমাণ ছাড়া যাওয়া যাবে না।[২০৮]

---

২০৭. অর্থাৎ মানুষের চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষা নির্ধারিত হয়েছে। এখানে হাদীসকে বুঝানো হচ্ছে না।

২০৮. অন্যদের বর্ণনার জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈধতা ও তা গ্রহণ করার যথার্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা:

৪- আবশ্যকীয় (অভিজ্ঞতাপূর্ব) ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাঝে কাল্পনিক ব্যবধান

জ্ঞানের ব্যাপারে কালামবিদদের তত্ত্ব যে ভিত্তিবাদী (Foundationalist), তা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। এটা আকৃতি বা কাঠামোর উপর নির্ভর করে, যে কারণে দেকার্তের মত জ্ঞানের সামাজিক দিকটা উপেক্ষা করে। মৌলিক পূর্ব-স্বীকৃত জ্ঞানের ব্যাপারে তত্ত্বীয় ধারণায় বিশ্বাসের ভয়াবহতা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কারণ এই জ্ঞানসমূহের জন্য তত্ত্বীয় শর্ত প্রদান সংশয় সৃষ্টিতে সহায়ক। এর মাধ্যমে জ্ঞানের জটিল প্রক্রিয়াকে তত্ত্বীয় ও সংশয়-নির্ভর কিছু শর্তে সীমিত করে দেওয়া হয়। আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে বর্ণনামূলক পদ্ধতি এমন সীমিতকরণ এড়িয়ে চলে, আর পূর্ব-স্বীকৃত মৌলিক জ্ঞানের উপর বিশ্বাস আনে; কেননা সেগুলো সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় হওয়ার সুবাদে সমাজে অস্তিত্বশীল ও প্রতিষ্ঠিত। এই অনুচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করব কীভাবে জ্ঞানের স্তরভেদ মানা সত্ত্বেও মুতাওয়াতির (আবশ্যকীয়) ও আহাদ (অভিজ্ঞতালব্ধ) জ্ঞানের দ্বৈততা থেকে আমরা বের হতে পারব।

প্রথমত, শাফেয়ীর দ্বৈততা (বহু মানুষ থেকে বহু মানুষের বর্ণনা ও একক বর্ণনা) এবং কালামবিদদের দ্বৈততা (মুতাওয়াতির ও আহাদ) ভিন্ন। শাফেয়ী বহু মানুষ থেকে বহু মানুষের বর্ণনা উপস্থাপনের সময় কোনো তত্ত্বীয় কথা বলেননি, বরং উদাহরণ পেশ করেছেন। অন্যদিকে কালামবিদরা মুতাওয়াতিরের কিছু শর্ত প্রদান করেছেন। মুতাওয়াতির বর্ণনা শুধু 'আবশ্যকীয়' হওয়ার মাঝে তারা সীমিত থাকেনি, কারণ এটা সামাজিকভাবে সুদৃঢ় জ্ঞান। যদিও তারা কখনো কখনো তত্ত্বীয় জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে জানিয়েছে যে সংশয়পূর্ণ বিষয় খণ্ডনের অনুপযোগী।

শাফেয়ী ইসলামে বহু মানুষ থেকে বহু মানুষের বর্ণিত জ্ঞানকে (হোক সেটা বর্ণনা কিংবা বিধান) ব্যক্তির ইসলামী আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন; যেটা একজন মানুষ ইসলামী সমাজে জন্ম নিলেই জেনে থাকে।

Coady, C.A.J, 1992, Testimony: A Philosophical Study, Oxford, Oxford University Press.

মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানের মতোই এই জ্ঞান। তিনি সে সকল জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্তগুলো বলেননি, যেগুলো কালামবিদরা শর্ত করেছেন। অন্যভাবে বললে, শাফেয়ীর দৃষ্টিতে দীনের যে জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই সবাই জানে, হোক সেটা বর্ণনা কিংবা বিধান, সেটা অ-জ্ঞানতাত্ত্বিক জ্ঞান। এটা তত্ত্বীয় জ্ঞানতত্ত্বের পরিধির অন্তর্ভুক্তই হবে না। শাফেয়ী এর নাম দিয়েছেন 'পূর্ব-স্বীকৃত জ্ঞান' (العلم المقدم)।[২০৯] আর কালামবিদদের কাছে মুতাওয়াতির বর্ণনা হলো একটা মনস্তাত্ত্বিক কার্যক্রম যার কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্ত আছে। যে জ্ঞানের জন্য জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্তের প্রয়োজন নেই, সেখানে যখন কালামবিদরা কিছু শর্তারোপ করেছে, তখনই মতবিরোধ দেখা দিয়েছে: মুতাওয়াতির বর্ণনা কি আবশ্যকীয় জ্ঞান নাকি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফায়দা দেয়? তবে কালামবিদরা স্বীকার করে যে, বালক শিশুরা মুতাওয়াতির বর্ণনার তত্ত্বীয় শর্ত জানা ছাড়াই সেগুলো মেনে নেয়। বাস্তবে শিশুরা যে বিভিন্ন দেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সেটা তাদের প্রতিপালনের শিক্ষা থেকে, নিছক বর্ণনা থেকে নয়। শিশুকে বিভিন্ন মানুষজন মক্কার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানায়নি। বরং নানা প্রসঙ্গ থেকে সে শিখে নিয়েছে। আমাদের যুগে মিডিয়া, পাঠ্যবই, আত্মীয়স্বজন, বিভিন্ন ঘটনা থেকে সে এগুলো জানে। মক্কা সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান প্রতিপালনের উপর নির্ভর করে, বর্ণনার উপর নয়। তাই মুতাওয়াতির বর্ণনা যিনি অস্বীকার করেন, তার ব্যাপারে সঠিক অবস্থান হলো তার সংশয়কে না মানা। কারণ সংশয়বাদী মানুষের বাস্তব জীবনের কার্যক্রমের সাথে এই সংশয় মিলে না। ইবন রুশদের ভাষায়— 'সে বাস্তবে যে অবস্থায় আছে, সেটার ব্যাপারে নিজের জিহ্বা দিয়েই সে মিথ্যা বলে।'[২১০] তার খণ্ডন করার জন্য প্রসঙ্গসমূহের সাহায্য নিয়ে সংশয়কে পরাভূত করে জ্ঞানতাত্ত্বিক নানা শর্ত প্রণয়ন করার দরকার নেই; যেগুলোর ব্যাপারে স্বয়ং রাযী বলেছেন যে সেগুলোর অকাট্য উত্তর 'যদি সম্ভব হয়, তবুও গভীর সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পরই তা সম্ভব' যেমনটা আমরা পূর্বে তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছি।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রাসঙ্গিক আলামত থেকে সৃষ্ট জ্ঞান 'অ-জ্ঞানতাত্ত্বিক' (তত্ত্ব প্রদানকে গ্রহণ করে না), বরং জীবনমুখী। স্বাভাবিকভাবে তা অর্জিত হয়। ভিটগেনস্টাইন বলেন, 'আমি (জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে) কি জানি যে একজন

২০৯. জিমাউল ইলম (পৃ. ২১)।

২১০. ইবন রুশদ, মুখতাসারুল মুস্তাসফা, দারুল গার্বিল ইসলামী, পৃ. ৬৯।

অসুস্থ মানুষ এখানে শুয়ে আছে? এটা অনর্থক কথা। আমি তার বিছানার পাশে বসি, গুরুত্ব দিয়ে তার চেহারার দিকে তাকাই, তারপরও কি এমন হতে পারে যে আমি জানি না এখানে অসুস্থ ব্যক্তি শুয়ে আছে কিনা? সন্দেহ বা নিশ্চয়তা উত্তরটা এখানে অর্থহীন।'[২১১] অর্থাৎ আমাদের জন্য এটা বলা বৈধ হবে না যে, জ্ঞানতাত্ত্বিক দলীলের উপর ভিত্তি করে আমরা জেনেছি লোকটা অসুস্থ। বরং আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা জেনে গিয়েছি বাস্তব পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। স্বাভাবিক সহজাত প্রক্রিয়ায় আমাদের অর্জিত এই জ্ঞানে সংশয় পোষণ করা ঠিক নয়। কারণ এটা সংশয়ের ক্ষেত্র নয়। তত্ত্ব প্রদানের কোনো স্থান এখানে নেই। বরং নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে চর্চাই এখানে সর্বোচ্চ স্থান পাবে। আবার সংশয়েরও স্থান নেই, কেননা জ্ঞানটা 'অ-জ্ঞানতাত্ত্বিক'।

দ্বিতীয়ত, কালামী গবেষণা এই মতের উপর স্থিত হয়েছে যে, মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান, যুক্তিভিত্তিক কাঠামোগত জ্ঞান নয়। সুতরাং তত্ত্বীয় সম্ভাবনা থাকতে পারে যে, বিপুল সংখ্যক মানুষ মিথ্যা বলবে, সেটা সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন। তাওয়াতুরের সংজ্ঞায় 'সাধারণ' কথাটার অর্থ হলো প্রাসঙ্গিক আলামত পর্যবেক্ষণ। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে কি আমাদের জন্য এটা বলার সুযোগ আছে না যে, মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক আলামতযুক্ত বর্ণনার মাঝে প্রকারের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই? ত্বাহের আল-জাযায়েরী বলেন, 'বিপুল সংখ্যক উসূলবিদ স্পষ্ট বলেছেন যে, মুতাওয়াতিরের পক্ষে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক আলামত থাকতে হবে, সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আলামতযুক্ত খবরে আহাদের সাথে তার কোনো পার্থক্য থাকছে না, যে খবরে আহাদের সত্যতার উপর জ্ঞান আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞানের আবশ্যকতা প্রাসঙ্গিক আলামতের সহায়তায়। এখানে উত্তর দেওয়ার সময় বলা উচিত হবে না যে, 'মুতাওয়াতিরে প্রাসঙ্গিক আলামতসমূহ বর্ণনার সাথেই সম্পৃক্ত থাকে, কিন্তু খবরে আহাদে প্রাসঙ্গিক আলামত বাহিরে থাকে, সুতরাং মুতাওয়াতির নিজে নিজেই জ্ঞানকে আবশ্যক করে'। কেননা খবরে আহাদেও অনেক সময় প্রাসঙ্গিক আলামত সম্পৃক্ত থাকে। সম্পৃক্ত আলামত বলতে বোঝানো হয় বর্ণনাকারী, বর্ণনাকৃত বিষয় এবং বর্ণনার অবস্থা। বর্ণনাকারী এমন হতে পারে যিনি কখনো মিথ্যা বলেন

২১১. হ্যামিল্টন, ভিটগেনস্টাইন ওয়া-ফিল ইয়াকীন, পৃ. ২৬৩।

না বা এই বর্ণনায় তার এমন কোনো প্রয়োজন নেই যার জন্য সে মিথ্যা বলবে। আর বর্ণনাকৃত বিষয় খুবই সম্ভাব্য একটা বিষয়, বিশেষ করে যদি তার কিছু ভূমিকা আগেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর বর্ণনাটাও এতটা স্পষ্ট হবে যে, সেখানে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা, অসংলগ্নতা বা সংশয়ের অবকাশ থাকবে না।'[২১২] জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুই বর্ণনাকে কাছাকাছি দেখার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, 'কোনো বিষয় অকাট্য বা সম্ভাব্য হওয়াটা অতিরিক্ত বিষয়, এটা বিশ্বাসীদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন হবে। কোনো বক্তব্যকে এমন (অকাট্য বা সম্ভাব্য) বিশেষণে বিশেষায়িত করা যাবে না। কারণ মানুষ এমন অনেক কিছুতে অকাট্যভাবে বিশ্বাস করে যেগুলোতে সে আবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জন করেছে, অথবা তার কাছে এমন বর্ণনা এসেছে যার সত্যতা সে জানে। অথচ অন্য কেউ একই ব্যাপারে অকাট্য বা সম্ভাব্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। কোনো কোনো মানুষ হয়তো বুদ্ধিমান, শক্তিশালী চিন্তার অধিকারী থাকে যে কিনা দ্রুত কোনো কিছু বুঝে নিতে পারে। সে সত্য জেনে সেটার ব্যাপারে অকাট্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারে, কিন্তু একই বিষয়ে অন্যরা হয়তো ভাবতে পারে না কিংবা জানলেও অকাট্য বা সম্ভাব্য জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। সুতরাং অকাট্যতা এবং সম্ভাব্যতা নির্ভর করে একজন মানুষের প্রাপ্ত দলীল অনুযায়ী এবং সেই দলীলগুলোর মাধ্যমে সে কতটুকু দলীল প্রদান করতে পারে সেটা অনুযায়ী। দলীল প্রাপ্তি এবং দলীল প্রদানের ক্ষেত্রেই মানুষের তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো বিষয় 'অকাট্য' কিংবা 'সম্ভাব্য' হওয়াটা মতভেদপূর্ণ বিষয়ের অবিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্য নয়। ফলে সেই বিষয়টার বিপক্ষে কেউ গেলেই বলা যাবে না— কেউ যদি এই বিষয়ের বিপরীতে যায় তাহলে সে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীতে গেল। বরং 'অকাট্যতা' একজন অনুসন্ধানী দলীল প্রদানকারী বিশ্বাসী ব্যক্তির অবস্থা।'[২১৩] সুতরাং যে বর্ণনাকে বর্ণনার সমালোচনায় বিশেষজ্ঞ কিছু মানুষ (মুহাদ্দিসরা) বিশুদ্ধ বলে, সেটা থেকে জ্ঞান প্রাপ্তির বিষয়টা প্রত্যাখ্যানের জন্য বর্ণনাগুলোকে (দৃঢ় বিশ্বাসের জ্ঞান প্রদানকারী) মুতাওয়াতির এবং (সম্ভাব্যতার জ্ঞান প্রদানকারী) আহাদে বিভক্ত করাই যথেষ্ট নয়। কারণ

২১২. ত্বাহের আল-জাযায়েরী, তাউজীহুন্নাযার ইলা-উসূলিল আসার, মাকতাবাতুল মাত্বূআত আল-ইসলামিয়্যাহ, আলেপ্পো (১/৪১)।

২১৩. মাজমূউল ফাতাওয়া (১৯/২১১)।

হাদীসের এই সকল বিশেষজ্ঞ এমন কিছু প্রাসঙ্গিক আলামতের উপর নির্ভর করেছেন যেগুলোর দরুন তারা প্রায় অকাট্যভাবে একটা নির্দিষ্ট বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন। এই প্রাসঙ্গিক আলামতগুলো ভুলের সম্ভাবনাকে কমিয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসে। যদিও বর্ণনার বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় ভুলের সম্ভাবনাটুকু থেকে যায়। আর এই বিষয়টা শাফেয়ী বা আহলুল হাদীস কেউ নাকচ করেন না। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয় না, আর এটাকে অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। শর্ত হলো অপ্রয়োজনে এই বিশুদ্ধ বর্ণনাকে মুতাওয়াতির বর্ণনার সাথে তুলনা না করা।[২১৪] কারণ তুলনা সবসময় আপেক্ষিক। হাদীসশাস্ত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত পূর্বের মুহাদ্দিসরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অসংখ্য হাদীস সম্বন্ধযুক্ত করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন। এগুলোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস বহু মানুষের থেকে বহু মানুষের বর্ণনার দৃঢ় বিশ্বাসের চাইতে ভিন্নভাবে তারা দেখতেন না। হাদীসের বিশুদ্ধতাকে তত্ত্বীয় বিভাজন দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এছাড়া আমরা কিছু কালামবিদের মত উল্লেখও করেছি যারা মনে করেন মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে অর্জিত দৃঢ় বিশ্বাস যুক্তিশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা থেকে অর্জিত দৃঢ় বিশ্বাস থেকে কম। তাই বলে কি মুতাওয়াতির বর্ণনা থেকে অর্জিত জ্ঞান প্রশ্নবিদ্ধ হবে?

তৃতীয়ত, জ্ঞান দৃঢ়ভাবে স্থাপনের ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকার পাশাপাশি ভিটগেনস্টাইন আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করেন। সেটা হলো দৃঢ় বিশ্বাসের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা, যেন আরো অনেক বিষয় তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এক শর্তে, সেটা হলো 'গ্রহণযোগ্যতা'। কিছু পরীক্ষণ-নির্ভর বিষয় আছে, যেগুলো কালের পরিক্রমায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে আর কেউ সেগুলো দিয়ে সংশয় পোষণ করে না। অর্থাৎ মৌলিক পূর্ব-স্বীকৃত জ্ঞানের মতো করে সমাজ সেগুলোকে দেখে। যেমন: পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব, ইতিহাসের মৌলিক কিছু তত্ত্ব প্রভৃতি। বিশেষজ্ঞরা প্রথম থেকে এগুলোর ব্যাপারে একমত। যুগের পর যুগ কেটে যাওয়ায় এই সকল শাস্ত্রীয়

---

২১৪. বইয়ের শেষভাগে বিবরণ আছে যে, শাফেয়ী বর্ণনাসমূহের ঐতিহাসিক বিশুদ্ধতার স্তরসমূহের খোঁজ করতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবহারিক: খবরে ওয়াহেদ অস্বীকারকারীর ক্ষেত্রে ফিকহী বিধান। তার কোনো তত্ত্বীয় উদ্দেশ্য এখানে ছিল না।

বিষয় মানুষের কাছে প্রায় দৃঢ় বিশ্বাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মৌলিক পূর্ব-স্বীকৃত জ্ঞানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। মৌলিক পূর্ব-স্বীকৃত বিষয় আর পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের মাঝে পার্থক্য হলো পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের গতিময়তা। এগুলো মৌলিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু সময়ের আবর্তনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

হাদীসের উপর প্রয়োগ করলে আমরা দেখতে পাই, বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত যে হাদীসের বিষয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে কোনো আপত্তি তোলা হয়নি, সেটা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সঠিক জ্ঞান। হাদীসশাস্ত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এই হাদীসের ব্যাপারে অর্জিত দৃঢ় বিশ্বাস শাফেয়ীর অস্তিত্ব বা অন্যান্য মৌলিক জ্ঞান থেকে ভিন্ন না। অনুরূপভাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এমন প্রতিষ্ঠিত অবস্থান শুধু এ কারণে নয় যে, এই দুটি বইকে বিজ্ঞদের সমাজ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং হাদীসশাস্ত্রের মাপকাঠি অনুযায়ী এর হাদীসগুলো বিশুদ্ধতম হাদীস। বরং এ কারণেও যে এতে রয়েছে 'প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রশস্ত বিজ্ঞ সমাজের দিকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি'। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব 'কোনো আনুষ্ঠানিক কমিটি বা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান করে না, যাদেরকে এমন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে'।[২১৫] বরং এটা সমাজে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে স্বীকৃত। আর এই সামাজিক স্বীকৃতিকে তৎক্ষণাৎ দেওয়া হয়নি। বরং তীব্র প্রতিযোগিতা নির্ধারণ করে দিয়েছে কোন বইগুলো বেশি প্রভাব রাখার মতো।[২১৬] শুধু তাই নয়, বরং এই গতিময়তা ভিটগেনস্টাইনকে বলার সুযোগ করে দিয়েছে যে 'পদ্ধতিগত বিষয় (প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান) আর পদ্ধতির অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মাঝে কোনো স্পষ্ট পার্থক্য নেই। ... প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সাথে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কোনো ফারাক নেই।'[২১৭] অর্থাৎ হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য একজন আলেম যখন কোনো একটা হাদীসের সনদকে সঠিক বলে এবং এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যে (মতনে) কোনো সমস্যা না পাওয়া যায়, সেটার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান যেকোনো

২১৫. একদল লেখক, আত-তারীখুশ শাফাওয়ী: মুকারাবাত ফিল-মাফাহিম ওয়াল-মানহাজ ওয়াল-খিবরাত, আল-মারকাযুল আরাবী লিল-আবহাস ওয়া-দিরাসাতিস সিয়াসাত, ২০১৫, পৃ. ১৩৭।

২১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

২১৭. হ্যামিল্টন, ভিটগেনস্টাইন ওয়া-ফিল ইয়াক্বীন, পৃ. ১৫১।

প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের অধিকাংশ মতন) থেকে কোনো অংশে কম নয়। হ্যাঁ, এটা সত্য যে নির্ভরযোগ্যতার বিচারে সেটা মর্যাদাগত স্তরের দিক থেকে নিচে, এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। আর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানকে যতটা সহজে গ্রহণ করে নেওয়া যায়, তার তুলনায় এটার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার বৈধ পরিধি আছে। **কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, এটা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানে রূপ নিতে পারবে না।** অন্ততপক্ষে হাদীসশাস্ত্রের কিছু বিশেষজ্ঞের কাছে তা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকলেই কোনো কিছু প্রত্যাখ্যানযোগ্য হয়ে যায় না। তবে যদি বিশেষজ্ঞ তাতে ভুলের কোনো আলামত পায় সেটা ভিন্ন বিষয়।

উপসংহারে বলব, হাদীসের ঐতিহাসিক বিশুদ্ধতার নানা স্তরের উপস্থিতি আমরা স্বীকার করি। অথবা শাফেয়ীর ভাষায় বললে 'জ্ঞানের প্রকারভেদ' স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে আমরা 'জ্ঞানের প্রকারসমূহের' মাঝে বিভাজনের অনমনীয় সীমারেখা তৈরি করতে পারি না; যেহেতু মানবীয় জ্ঞানকে পৃথককারী স্পষ্ট প্রবাহ বা গতি বিদ্যমান। আর জ্ঞানের প্রত্যেক প্রকারেই দৃঢ় বিশ্বাসের সুযোগ আছে। অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান আমাদের গবেষণার পরিধির বাহিরে। প্রতিষ্ঠিত বা গ্রহণযোগ্য জ্ঞানের ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ নেই। বিশদভাবে বললে ইতিহাসের দার্শনিকরা যখন ইতিহাসের দর্শন নিয়ে কথা বলেন এবং মূল্যায়ন করেন, তখন আমরা তাদের থেকে যা চাই আর কালামবিদরা যখন হাদীসশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কথা বলেন, তখন আমরা তাদের কাছ থেকে যা চাই তা হলো এই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞরা যেভাবে শাস্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন তার মাঝে সীমিত থাকা এবং ভিন্ন কিছু না বলা; যেহেতু এই শাস্ত্রে তাদের চর্চা ও পর্যালোচনা আছে। কারণ তারা (কালামবিদরা) যে তত্ত্বই প্রদান করবে, সেটা প্রায়োগিক দিক থেকে পূর্ণ থাকবে না। তাদের উত্থাপিত সে সকল তত্ত্বে সংশয় যা স্থূল আপত্তি থাকবে, অথচ শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করবে।

জিওফ্রে ইলটন (১৯৯৪ খ্রি.) তার 'ইতিহাসচর্চা' (The Practice of History) বইয়ে দার্শনিকদের আক্রমণের বিপরীতে ইতিহাসের পক্ষ নিয়ে যা বলেছেন, আমরা একই কথা বলব মুহাদ্দিসদের কার্যক্রমের ব্যাপারে কালামবিদদের সংশয় উদ্দীপক পর্যালোচনার জবাবে। জিওফ্রে ইল্টন তার

বইটাতে ইতিহাসবিদদের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার পক্ষ নিয়ে দার্শনিকদের খণ্ডন করেছেন 'যারা ইতিহাসবিদদের মতো করে অতীতের ঘটনার প্রকৃত রূপে পৌঁছানোর জন্য প্রাসঙ্গিক আলামতের উপর নির্ভর করেনি। ইল্টনের দৃষ্টিতে এ সকল দার্শনিক ও যুক্তিবিদরা ইতিহাসবিদদের চিন্তার পদ্ধতির ব্যাপারে মন্তব্য করেছে, কিন্তু ইতিহাসের নানা উৎস যাচাই ও সমালোচনার মাধ্যমে তারা যে প্রায়োগিক চর্চা করেছে, সেটার দিকে তারা দৃষ্টিপাতও করেনি। ইল্টন আরো বলেন, দার্শনিকদের মতো করে 'ঐতিহাসিক জ্ঞানের বাস্তববাদিতা' বা 'ঐতিহাসিক চিন্তার ধরন' প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কাজে আসে না, বরং ইতিহাসচর্চার কাজকে ব্যাহত করে।'[২১৮] নিঃসন্দেহে উসূল ও কালামের চর্চা ইলমুল হাদীসকে একটা শাস্ত্র হিসেবে মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে দিয়েছে। এর ফলে খবরে আহাদকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে বিংশ শতাব্দীর কিছু চিন্তাবিদের মাঝে। যেমন- শাইখ শালতূত বলেন, 'এভাবে আমরা দেখতে পাই কালামবিদ ও উসূলবিদ আলেমরা সবাই একমত যে, খবরে আহাদ দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দেয় না। এর মাধ্যমে আকীদা সাব্যস্ত করা যায় না। মুহাক্কিক আলেমরা মনে করেন এটা আবশ্যকীয় জ্ঞান প্রদান করে, যা নিয়ে কেউ মতভেদ করা ঠিক নয়। আর যারা বলে 'খবরে আহাদ জ্ঞানের ফায়দা দেয়' তাদের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তারা (আলেমরা) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভাবনার অর্থে জ্ঞান, অথবা আমল করার আবশ্যকতার জ্ঞান।'[২১৯] ইজমার দাবিকে একপাশে রাখলে এই বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয় কীভাবে কালামী দৃষ্টিভঙ্গি সংশয়ের ভিত স্থাপন করে দিয়েছে, যেমনিভাবে ইতিহাসের ব্যাপারে দার্শনিকদের বক্তব্যও সংশয়ের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছে। ইতিহাসবিদ লুডমিলা জোর্ডানোভা (Ludmilla Jordanova) বলেন, 'ঐতিহাসিক জ্ঞানের অবস্থানের উপর আঘাত অধিকাংশ সময়ে অন্যান্য মানবীয় বিদ্যা থেকে এসেছে।'[২২০]

---

২১৮. কাইস মাখী, আল-মারিফাতুত তারীখিয়্যা ইন্দাল 'আরাব, পৃ. ৯৯।

২১৯. মাহমুদ শালতূত, আল-ইসলাম আকীদাতান ওয়া-শারীয়াহ, দারুশ-শুরুক, পৃ. ৬০।

২২০. Aviezer Tucker, ed., 2009, p.71.

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান গ্রহণ করতে হয় ঊর্ধ্ব থেকে।

\- শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)

পবিত্র সুন্নাহর প্রামাণ্যতা এবং শরয়ী হুকুম প্রদানে এর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা দীনের আবশ্যকীয় বিষয়, আর এ ব্যাপারে কেবল ঐ ব্যক্তি দ্বিমত করবে, যার দীন ইসলামে কোনো অংশ নেই।

\- শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ)

পূর্বে অধ্যায়ের লক্ষ্য ছিল কালামী ও দার্শনিক বাধা-বিপত্তিতে হোঁচট খেয়েছে এমন মুসলিম পাঠককে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। আর সেক্ষেত্রে এটা মেনে নেওয়া যে, কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবী-তাবেয়ীদের আমল এবং পরবর্তী নির্ভরযোগ্য আলেমদের বক্তব্যে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংশয়ের বৈধতা নেই। এই অধ্যায়ের লক্ষ্য এটা প্রমাণ করা যে, আমাদের ঐতিহ্য (কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য ও ব্যাখ্যা) খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের বিপরীত। খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য রেনেসাঁর যুগ থেকে শুরু করে তৎপরবর্তী সময়ে বড় ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে আমাদের ঐতিহ্য জাহেলী যুগের কার্যক্রমের সমালোচনা করে। তারপর মুসলিম আলেমরা সাহাবী-তাবেয়ীদের থেকে প্রাপ্ত আদর্শকে আঁকড়ে ধরে নতুন গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন দলেরও সমালোচনা ও খণ্ডন করে। মুহাদ্দিসরা সমালোচনার একটা পদ্ধতির মাধ্যমে **সুন্নাহর সংরক্ষণ** করেন, যেটা একজন সাধারণ মুসলিমকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেই সহীহ হাদীসগুলো বলেছেন। আর এই পদ্ধতিটা হলো **ইলমুল হাদীস**।

ইসলামের **এই** মূলনীতিগুলো আমরা **জ্ঞানসম্মত বর্ণনামূলক** পদ্ধতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলব। সেটাকে মুসলিম-অমুসলিম সবাই গ্রহণ করে নিবে। প্রাসঙ্গিক

যে জ্ঞানের উপর এক্ষেত্রে আমরা নির্ভর করব, সেটা হলো সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ব। অর্থাৎ আমরা কিছু নির্দিষ্ট মানুষের (ইসলামপূর্ব যুগে ও ইসলামের প্রথম যুগে আরব) দৃষ্টিতে মূলনীতিসমূহ ভাষাগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করব। কারণ নৃতত্ত্বের বিশেষত্ব হলো এটা 'এমন অবস্থাসমূহের উপর অনুসন্ধান তথা গবেষণা চালায়, যেগুলোর মাধ্যমে সমাজ ও সংস্কৃতি স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করে। আর এই অবস্থাসমূহ অপ্রকাশিত নয়, বরং প্রকাশিত। অর্থাৎ যে সকল অবস্থাসমূহ সমাজ হজম করে নিজের মাঝে ধারণ করে নিয়েছে।'[২২১] এখানে যে মূলনীতিগুলো আমরা আলোচনা করব সেগুলো হলো:

- আরবদের চোখে ইসলামের আগে ও পরে সুন্নাহর সংজ্ঞা। প্রাচ্যবিদদের গবেষণার যাত্রা এই বৃহৎ বিষয় থেকে শুরু হয়, তারপর পৌঁছে যায় সুন্নাহর অ-মৌলিকত্ব ও প্রামাণ্যতার ঘাটতি প্রসঙ্গে। শেষ পর্যন্ত এই ফলাফলে উপনীত হয় যে, সুন্নাহ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দ্বিতীয় শতকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। ইলমুল হাদীসের ব্যাপারে সংশয়মূলক অবস্থান যেদিন থেকে প্রাচ্যবিদদের সর্দার ইগনাস গোল্ডযিহার (১৯২১ খ্রি) চালু করেছে, সেদিন থেকে সেটা সুন্নাহর সংজ্ঞার পাশাপাশি ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংজ্ঞার যথাযথ বিশ্লেষণ ইলমুল হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ প্রাচ্যবাদী ভিতকে বাতিল করে দিতে সক্ষম। ফযলুর রহমান মালেক বলেন, 'হাদীসের বিকাশ ও বিবর্তনের ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে যে ধারণাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো সুন্নাহর ধারণা, অন্তত পক্ষে মধ্যযুগে ইসলামের বিকাশের সময়ে। হাদীস ছিল প্রায়োগিক রীতিনীতি বা প্রথার সাথে জড়িত; আর হাদীসের মাঝে বিদ্যমান আদর্শিক রূপের প্রতিফলন ঘটায় এমন বিষয় হলো সুন্নাহ।'[২২২]

---

২২১. জ্যাক লোগোফ, আত-তারীখুল জাদীদ, আল-মুনায্যামাতুল আরাবিয়্যা লিত-তর্জমা, ২০০৭, অনুবাদ: মুহাম্মাদ আত-ত্বাহের আল-মনসুরী, পৃ. ২৪৮।

২২২. ফজলুর রহমান মালেক, আল-ইসলাম, আশ-শাবাকাতুল আরাবিয়্যা লিল-আবহাসি ওয়ান-নাশর ওয়া-মারকাযু দিরাসাতি ফালসাফাতিদ্দীন বি-বাগদাদ, ২০১৯, অনুবাদ: হাসুন আস-সারাই, পৃ. ৯৯। (তার এ বক্তব্যের খণ্ডন অচিরেই আসবে)

- আরবদের চোখে ইসলামের আগে ও পরে লিখনীর সংজ্ঞা। মারফূ', মাওকুফ ও মাকতূ' হাদীস লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টা অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ বা আধুনিকমনা আরবের সবচেয়ে বেশি উত্থাপিত দলীল, যেটা দিয়ে তারা প্রমাণ করে যে সুন্নাহ লিপিবদ্ধ করার কাজটা বিলম্ব হয়েছিল তাই সুন্নাহ প্রমাণ নয়। সেক্ষেত্রে তাদের দাবি থাকে যে, এই দলীল থেকে প্রমাণিত হয় সুন্নাহ মৌলিক নয় কিংবা সুন্নাহ লিখে রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে সুন্নাহ নির্দিষ্ট সময়কালে প্রযোজ্য তথা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে অন্য কোনো যুগে কার্যকরী না। সুন্নাহ লেখার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার এই মতটা ব্যবহার করা হয় 'সুন্নাহর ঐতিহাসিক প্রমাণকে বাতিলের উদ্দেশ্যে। ... হাদীসকে কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর কমপক্ষে একশ' বছর পরে। লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বাতিল করে দেয়। আবার হাদীস জাল করার মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়। হাদীস নয় এমন অনেক কিছু এতে প্রবেশ করে। একশ' বছর ধরে লিখনী ছাড়া কেবল মৌখিক বর্ণনা করলে বর্ণিত বিষয়টা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এমনকি বর্ণিত বিষয়টা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, সেটাকে প্রমাণিত বলার সুযোগ থাকে না।'[২২৩]
- আরবদের চোখে ইসলামের আগে ও পরে জ্ঞান ও সম্ভাবনার সংজ্ঞা। ইলমুল হাদীসের উসূল ও কালাম-নির্ভর গবেষণায় এটা মৌলিক বিষয়। আমরা ব্যাখ্যা করব যে ইলমের সংজ্ঞা আরবদের এবং ইসলামের আলেমদের চোখে অনেক ব্যাপক ছিল (শাফেয়ী ও আহমদের বক্তব্য অনুযায়ী), কালামবিদরা যতটা সংকীর্ণ করে উপস্থাপন করেছে এবং যেটার উপর নিজেদের গবেষণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ততটা সংকীর্ণ ধারণা ছিল না। তাদের এমন ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'খবরে আহাদ সম্ভাবনার ফায়দা দেয়।'

উপর্যুক্ত এই তিনটা সংজ্ঞা স্পষ্ট করলে আমরা সুন্নাহ এবং ইলমুল হাদীসের ব্যাপারে উত্থাপিত অধিকাংশ শাখাগত সমালোচনার খণ্ডন করতে সমর্থ হব।

---

২২৩. আল-হারেস ফখরী ঈসা, আল-হাদাসাহ ওয়া-মাওকিফুহা মিনাস্‌সুন্নাহ, দারুস সালাম, ২০১৮, পৃ. ১৭৫। (তার এ বক্তব্যের খণ্ডন অচিরেই আসবে)

১. ইসলামের আগে ও পরে ইমাম শাফেয়ীর সময়কাল পর্যন্ত সুন্নাহর সংজ্ঞা:

ক) ইলমুল হাদীসের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের গবেষণার ভিত স্থাপনকারী ইগনাজ গোল্ডযিহারের ছাত্র প্রাচ্যবিদ জোসেফ শাখ্ত বলেন, 'মোহাম্মদী ফিকহের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি সুন্নাহকে এভাবে সংজ্ঞায়ন করে যে এটা নবীজীর আদর্শিক চালচলনের বিবরণ। শাফেয়ী এই অর্থে সুন্নাহকে ব্যবহার করে। তার চোখে 'সুন্নাহ' এবং 'নবীজীর সুন্নাহ' সমার্থক। তবে সূক্ষ্মভাবে সুন্নাহর শাব্দিক অর্থ 'পুরাতন নজির' বা 'জীবনের পদ্ধতি'। গোল্ডযিহার ইতঃপূর্বে ব্যাখ্যা করেছেন যে এই 'পৌত্তলিক' পরিভাষা ইসলামকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলেছে। মার্গোলিউথ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে ফিকহের ভিত্তি হিসেবে সুন্নাহ বলতে বোঝায় সমাজের আদর্শিক মাপকাঠিতুল্য রীতিনীতি। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া রীতিনীতির অর্থটা সুন্নাহ অনেক পরে এসে অর্জন করেছে। শাখ্ত এ ব্যাপারে মার্গোলিউথের সাথে একমত। তারা উভয়ে মনে করে সুন্নাহ ছিল এমন রীতি বা প্রথা, যেটার ব্যাপারে সামাজিকভাবে সবাই একমত।'[২২৪] অর্থাৎ 'শাফেয়ীই প্রথম ফকীহ যিনি সুন্নাহকে নবীজীর আদর্শিক চালচলন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যেটা তার পূর্বে কেউ করেনি। তাদের কাছে সুন্নাহ মানেই নবীজীর থেকে প্রাপ্ত আদর্শিক রীতি-নীতি বা পদ্ধতি ছিল না। বরং তৎকালীন সামাজিক প্রথার প্রতিফলনই সুন্নাহ, যদি সেটা আদর্শিক হয়।'[২২৫] সুন্নাহর বিবর্তনের তিনটা ধাপ শাখ্ত উল্লেখ করেন। আরবদের কাছে ইসলামের আগে সুন্নাহ বলতে বোঝানো হতো 'সামাজিক প্রথাই বিশুদ্ধ ও সঠিক। পূর্বপুরুষরা যা করেছে, সেটার অনুসরণ করাই উপযুক্ত কাজ।'[২২৬] আর ইসলামে এসে এর কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল না। নির্দিষ্ট সমাজের 'অ-ধর্মীয় সম্মতি'কে পরবর্তী সমাজগুলোর জন্য নমুনা

---

২২৪. Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, London: Oxford University Press 1950, p. 57.

২২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

২২৬. J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford University Press 1964, p.17.

বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শাখ্তের দৃষ্টিতে এটা 'রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। এটা খলীফার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের দিকে নির্দেশ করে। এর মাপকাঠিগত কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় শতকে এসেছে ইরাকের ফকীহদের হাত ধরে এমন রূপ লাভ করে যার শরীয়ত প্রণয়নের অধিকার আছে।[২২৭] সুন্নাহর সংজ্ঞা বোঝানোর জন্য শাখ্ত একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন। সেটার সারকথা ছিল 'সুন্নাহ্ পরিভাষা মূলত আবু বকর ও উমারের কাজকর্ম ও চর্চাকে বোঝাত। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রম বোঝাতে সুন্নাহ্ নামক যে পরিভাষা ব্যবহৃত হয় সেটা পরবর্তী সময়ে আকীদাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয়। এই প্রয়োগের কারণে আবু বকর ও উমারের কার্যক্রম 'সীরাহ' নাম অর্জন করে। শাখ্ত আরো যোগ করেন, উমারকে খলীফা নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদরা 'নবীজীর সুন্নাহ' নামে যে বিষয়টার দিকে ইশারা করেন, সেটা বাস্তব নয়। বরং পরবর্তী কোনো প্রজন্ম এটাকে ঢুকিয়েছে।[২২৮] এটা খুবই স্বাভাবিক যে শাখ্ত দাবি করবেন শাফেয়ীর আগে সাহাবী-তাবেয়ীদের আছার দিয়ে দলীল প্রদান করাই ছিল মূল অবস্থা, আর হাদীস দিয়ে দলীল দেওয়াটা ছিল ব্যতিক্রম।[২২৯]

সুন্নাহর সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে এটা তত্ত্বীয় ভিত্তি। এর উপর দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় শতকে হাদীস জাল করার ধারণা। ইসলামপূর্ব যুগ থেকে 'ধর্মহীন' কিছু চর্চা ছিল, পরে সনদ জাল করে সাহাবীদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে; এরপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে যুক্ত করে বৃহত্তর কর্তৃত্ব অর্জিত হয়েছে। শাফেয়ীই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি নবীজীর সুন্নাহকে 'হাদীস'-এ সীমিত করে দিয়েছেন। ফজলুর রহমান মালেক বলেন, 'শাখ্ত শাফেয়ীর কাজকর্ম থেকে উদাহরণ দেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ কেবল হিজরী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝিতে পাওয়া যায়।

---

২২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

২২৮. M. M. Bravmann, The Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concepts (Leiden: E.J. Brill, 1972), p.125.

২২৯. J. Schact, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 1950, p.2

> নবীজীর কাজকর্ম বা সুন্নাহকে সে সময় তার সুন্নাহ বলে গণ্য করা হতো না। বরং উম্মাহর (জামায়াতের) সুন্নাহ বলে দেখা হত। (যদিও মদীনায় সুন্নাহ ইরাকের সুন্নাহ থেকে পৃথক); কিন্তু মূলত এই সুন্নাহ ছিল ফকীহদের স্বাধীন দলীল প্রদানের (কিয়াসের) ফলাফল। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি হাদীসপ্রাপ্তির ধারণার বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক প্রতিরোধ ফকীহরা গড়ে তোলেন, সেটাকে শাফেয়ী খুব বিন্যস্ত পন্থা অবলম্বন করে বিনষ্ট করে দেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামের ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতে সুন্নাহর সংজ্ঞার অনুপ্রবেশ ঘটান।[২৩০]

জিসি রবিন্সন বলেন, 'পশ্চিমারা বিশ্বাস করে যে, ফকীহরা শরয়ী বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সনদগুলো জাল করা হয়। তাদের পক্ষে বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সূক্ষ্মভাবে হাদীস বর্ণনা করতে তারা সমর্থ হয়নি। যে সকল সনদ ইসলামের প্রথম যুগের, সেগুলো খুব কম সময়ে বানানো হয়েছে; যাতে করে উমাইয়া এবং আব্বাসী যুগের বিভিন্ন মতকে বৈধতা দেওয়া যায়। সুতরাং এটা মেনে নিতেই হবে যে, বহু আলেম তাদের কাছে বিদ্যমান 'নবীজীর উদ্দেশ্য' অনুযায়ী পরিবর্তন এনেছেন। এগুলোর মাঝে কিছু সনদ দ্বিতীয় হিজরী শতকের। তবে এখানে অবশ্যই এমন কিছু ছিল না যেটার কারণে তৃতীয় হিজরী শতকে প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু হাদীসের সত্যতা মেনে নিতে হবে। সে সময়ে মৌখিক বর্ণনা প্রসিদ্ধি অর্জন করতে শুরু করে, আর মৌখিক বর্ণনার উপর লিখিত বর্ণনা প্রাধান্য পেতে থাকে। তখন খেলাফতের রাজধানী মদীনা থেকে দামেশ্ক এবং তারপর বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। চারটা ফিতনা, একটা গৃহযুদ্ধ ও একটা বিদ্রোহ হয়। এ সময়টাতে যে সকল ঘটনা ঘটে, সেগুলো হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়, যেমনটা হাদীসের সমালোচকরা মনে করেন। অর্থাৎ এগুলো ইসলামের প্রথম যুগের কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতা নয়, বরং সামাজিক বাস্তবতা

২৩০. ফজলুর রহমান মালেক, আল-ইসলাম, পৃ. ১০৩।

যেগুলোর উপর তৎকালীন সমাজ বিশ্বাস রাখত যে, এমন কিছু ইসলামের প্রথম যুগে বাস্তবেই ঘটেছে।'[২৩১]

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শাখ্‌ত অন্য সব প্রাচ্যবিদকে অনুসরণ করে গিয়েছেন (যদিও তত্ত্বীয় পর্যায় পেরিয়ে শাখাগত ক্ষেত্রে তাদের মাঝে মতভেদ ছিল)। যেমন: জে. ইয়াম্বুল বলেন, 'নবীর মৃত্যুর পর প্রথম তিন খলীফার শাসনকাল ছিল কুরআন ও নবীর সুন্নাহর কর্তৃত্ব। ... তারপর উমাইয়া যুগে সুন্নাহ্ বলতে নবীকে যেমন বোঝাত, তেমন অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এবং রীতি-নীতিকেও বোঝাত। যদিও প্রাচীন তথ্যসূত্র কখনো নবীর সুন্নাহ শব্দটা উল্লেখ করেছে, তদুপরি সুন্নাহ বা সুনান সাধারণত ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গ থেকে শব্দটার অর্থ বোঝা সম্ভব হয় না। এটা কি নবীজীকে বোঝাচ্ছে, নাকি সাহাবীদেরকে? নাকি পুরো সমাজকে? নাকি নির্দিষ্ট অংশকে? দ্বিতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্যদের সুন্নাহ নবীজীর সুন্নাহ থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। সেগুলো ছিল হাদীস ছাড়া অন্য উৎস থেকে গৃহীত সুন্নাহ।'[২৩২]

এন. জে. কুলসন বলেন, 'সুন্নাহর আভিধানিক অর্থ চলার স্পষ্ট পথ। এটা বলতে প্রথমত বোঝানো হয় বাস্তবের চলমান প্রথা। হোক সেটা ইসলামপূর্ব যুগে আরব গোত্রসমূহের প্রথা কিংবা সপ্তম শতকে (প্রথম হিজরী শতক) মুসলিম সমাজের রীতি-নীতি। কিন্তু অষ্টম শতকের ফকীহদের (দ্বিতীয় হিজরী শতক) মাঝে এসে এটা নতুন অর্থ লাভ করে। সুন্নাহ তাদের কাছে পরিণত হয় প্রত্যেক মাযহাবে বিদ্যমান কিছু মতামত ও মূলনীতির সমষ্টি, যেগুলো উপস্থাপন ও পক্ষে যুক্তি প্রদানের জন্য কিছু মানুষ কাজ করে।'[২৩৩] হাদীসের ব্যাপারে সংশয়মূলক পদ্ধতি প্রয়োগে শাখ্‌তের যে নীতি, সেটার বিরোধিতা করে তিনি কিছু হাদীসের পক্ষাবলম্বন করেন। তবুও তিনি বলেন,

---

২৩১. জেসি রবিন্সন, আল-বিলাত্ব ওয়াল-মুজতামা' ওয়া-ইলমুত তারীখ, আল-মারকাযুল আকাদীমী লিল-আবহাস, ২০১৪, অনুবাদ: আব্দুল জব্বার নাজী, পৃ. ২৮৬।

২৩২. Adis Duderija (ed.) The Sunna and its Status in Islamic Law: The Search for a Sound Hadith, New York: Palgrave Macmillan, 2015, p.17.

২৩৩. এন.জে. কুলসন, ফী তারীখিত তাশরী'ঈল ইসলামী, আল-মুআস্‌সাসাতুল জামিঈয়্যাহ লি-দ্দিরাসাতি ওয়ান-নাশ্‌র, ১৯৯২, অনুবাদ: মুহাম্মাদ আহমদ সিরাজ, পৃ. ৬৫।

'আমরা জোসেফ শাখ্তের দৃষ্টিভঙ্গিকে মৌলিকভাবে প্রত্যাখ্যাত মনে করি না। নবীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা শরীয়তের অধিকাংশ বিষয় জাল; আর সেগুলো পরবর্তীতে উদ্ভূত কিছু ফিকহী মতামতের পক্ষে যুক্তি প্রদানের জন্য বানানো হয়েছে।'[২৩৪] ফিকহের প্রাথমিক বিবর্তনের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আছার তথা পূর্ববর্তীদের বক্তব্য অনুসরণের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফিকহী মতকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে, সেটার শেকড় অতীতে পাওয়া যাবে। পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহের দিকে পরবর্তী সময়ের ফকীহদের মুখে আসা বিভিন্ন মূলনীতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। হ্যাঁ, এই মূলনীতিগুলো প্রথমে সবার অবহেলায় সনদ ছাড়া উল্লেখ করা হতো। কিন্তু খুব শীঘ্রই ফিকহী মতের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শৈল্পিক বিবেচ্য বিষয়ের কারণে অতীতের জ্ঞানীদের মধ্য থেকে থেকে নির্দিষ্ট কিছু নামকে বাছাই করে আনা হয়। এভাবে পরবর্তী ফিকহী মতগুলোকে কিছু বর্ণনাকারীর মাধ্যমে মুসলিমদের পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ উমারকে মদীনার সুন্নাহর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রায়শ উপস্থাপন করা হয়। আবার ইবন মাসউদকে কুফায় অনুরূপ অবস্থান দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ফিকহী মতকে সরাসরি নবীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। এই আছারসমূহের একটা অংশ ইসলামের প্রথম যুগের, যেগুলোকে মৌখিক বর্ণনা কিংবা উমাইয়াদের যুগে শরয়ী প্রয়োগ সংরক্ষিত করে রেখেছে। তবুও এ বর্ণনাগুলোর বড় একটা অংশ ঐতিহাসিকভাবে ভুল।'[২৩৫] শাখ্তের অনুসরণে ইয়াম্বুল মনে করেন যে, শাফেয়ীর প্রভাবে সুন্নাহ হয়ে পড়ে 'নবীর সুন্নাহ'।[২৩৬]

ড্যানিয়েল ব্রাউন আধুনিক যুগে শাখ্তের বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। তিনি মনে করেন সুন্নাহ হলো কিছু সামাজিক চর্চার সমষ্টি, যেগুলোর ব্যাপারে সকলে একমত। ব্রাউন এর নাম দেন 'স্বীকৃত নিয়মনীতি'। তিনি যদিও গবেষণার ফলাফলের আলোকে -দ্বিধা নিয়ে- স্বীকার করেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীন এমনকি নবীজীর জীবনেও সুন্নাহ ছিল, তবুও তিনি বিশ্বাস করেন যে, সুন্নাহ মৌলিকভাবে শরীয়ত প্রণয়ন করত না। তিনি বলেন, 'নবীজীর সুন্নাহর ধারণা হয়তো ইসলামের প্রথম

২৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

২৩৬. Adis Duderija (ed.), 2015, p.17.

যুগে ছিল। তবে ধর্মীয় কর্তৃত্বের মৌলিক উৎস হিসেবে এর সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।'[২৩৭] শাখতের মত ব্রাউনও মনে করেন শাফেয়ীর আগে সুন্নাহ ও হাদীস দুটি পুরোপুরি ভিন্ন বিষয় ছিল।[২৩৮]

এমনকি যে ওয়ায়েল হাল্লাক অনেক সময় শাখতসহ প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদদের বিরোধিতা করেন, তিনিও বলেন, 'নিঃসন্দেহে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর থেকে তার নামটা সুন্নাহর সাথে জড়িয়ে গেছে। তবে যে বিষয়টা প্রশ্ন হওয়ার সুযোগ রাখে সেটা হলো, তার সুন্নাহ কি আদর্শ নমুনার একমাত্র উৎস নাকি কমপক্ষে ব্যতিক্রমী উৎস। উত্তর হলো তৃতীয় হিজরী শতকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত সুন্নাহ এমনটা ছিল না। কিন্তু অন্য সব সুন্নাহর বদলে রাসূলের সুন্নাহ প্রসিদ্ধি অর্জনের পথটা লম্বা ছিল। বেশ কিছু ধাপ পেরিয়ে এই অবস্থায় উপনীত হয়। অবশেষে এটা কুরআনের পর শরীয়ত প্রণয়নের দ্বিতীয় উৎসে পরিণত হয়। রাসূলের মৃত্যুর পর স্বল্প কয়েক দশক জুড়ে রাসূলের সুন্নাহ ছিল অন্য সব সুন্নাহর পাশাপাশি একটা সুন্নাহ। কিন্তু পরবর্তীতে তার সুন্নাহ ক্রমবর্ধমান মর্যাদা অর্জন করে। লক্ষণীয় বিষয় হলো মুসলিম ইতিহাসবিদদের উল্লিখিত প্রথম যুগের একশ ফকীহদের মাঝে খুব সামান্য পরিমাণে রাসূলের সুন্নাহ পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে সেগুলো আবু বকর ও উমার ইবনুল খাত্তাবের সুন্নাহ থেকে সংখ্যার বিবেচনায় বেশি নয়। বিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপ ষাট হিজরীর শুরুর দিকে হয়, যখন একদল বিচারক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য বর্ণনা করতে শুরু করে। পরবর্তী উৎসগুলোতে এটা হাদীসের পরিভাষা নাম অর্জন করে। হাদীস বর্ণনার গুরুত্ব শুধু এর মাঝে সীমিত নয় যে, এটা রাসূলের সুন্নাহকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে; বরং হাদীস বর্ণনার প্রক্রিয়া গুরুত্বের দাবিদার এ কারণে যে, (ইতঃপূর্বে) নবীজীর সুন্নাহ ছিল একমাত্র উৎস যেটা অন্য সব সুন্নাহ থেকে পৃথক হয়েছে এবং ধীরে ধীরে নিজের একটা স্বতন্ত্র অবস্থানে পৌঁছেছে।'[২৩৯] তিনি আরো বলেন, 'প্রথম হিজরী শতকের ষাট বছরে

২৩৭. Brown, Daniel W. Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought. Cambridge Middle East Studies, Cambridge University Press, 1996, p. 10.

২৩৮. প্রাগুক্ত. পৃ.১১।

২৩৯. ওয়ায়েল হাল্লাক, নাশআতুল ফিকহিল ইসলামী ওয়া-তাতাউউরুহু, দারুল মাদার আল-ইসলামী, ২০০৭, অনুবাদ: রিয়াদ আল-মীলাদী, পৃ. ৮৪-৮৫।

রাসূলের একটা আদর্শিক নমুনা ফুটে উঠতে থাকে। ... নবীজীর সুন্নাহ অন্যান্য সুন্নাহর মত মুসলিমদের কাছে আদর্শ নমুনা ও চালচলনের একটা কেন্দ্রীয় উপকরণে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি মানুষের মাঝে ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, সুন্নাহর অতিরিক্ত মর্যাদা আছে, যেহেতু এটা কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআনের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্ক এবং ব্যাখ্যার উপযুক্ত পদ্ধতি জানার জন্য রাসূলের হাদীস ও কর্ম বোঝা খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, যে হাদীস ও কর্মের অনুসরণ করত সাহাবীরা।'[২৪০] সম্ভবত হাল্লাক সুন্নাহর ব্যাপারে শাখ্‌তের তত্ত্বের স্বীকৃতি দেন। তবে শাফেয়ীর অনেক আগে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। সেটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মাথায়। সে সময় 'সুন্নাহ' ছিল কয়েক ধরনের সুন্নাহর মাঝে একটি। 'সে ধরণগুলো ফকীহ-বিচারকদের কাছে শরীয়তের নির্ভরযোগ্য উৎস ছিল। যদিও এ সময়টাতে রাসূলের সুন্নাহর মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবুও শরীয়ত প্রণয়নে সেটার স্বতন্ত্র অবস্থান ছিল না। সুন্নাহ ছিল ফিকহী আচরণের একটা উৎস। আর এটাই পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়। আমরা এ সময় অন্য সুন্নাহসমূহ থেকে রাসূলের সুন্নাহর পৃথক অবস্থান দেখতে পাই না। যদিও রাসূলের সুন্নাহ এ সময় বেশ উচ্চ মর্যাদা পেত।' তারপর নবীর সুন্নাহ ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র অবস্থান অর্জন করে যখন 'অনেক বিচারক ও আলেম ষাট হিজরী থেকে রাসূলের জীবনীকে মৌখিক স্বতন্ত্র বর্ণনা হিসেবে উপস্থাপন করেন যেটা কিনা আবু বকর, উমার প্রমুখের সুন্নাহ থেকে পৃথক।' এর সমাপ্তি ঘটে 'বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পর, যখন সুন্নাহকে শরীয়তের উৎসে পরিণত করা হয়; আর সেটা কেবল রাসূলের সুন্নাহ, অন্যদের না। এ সময় (ষাট হিজরী থেকে আশি হিজরীর মাঝে) নবীর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতার মধ্য দিয়ে বড় পরিবর্তন ঘটে। যদিও অন্যান্য উৎস (খলীফার কর্তৃত্ব, অ-নববী সুন্নাহ এবং ফকীহদের মত) কিছু বিচারক এবং ফিকহে পারদর্শী আলেমের মাঝে থেকে যায়।'[২৪১]

উল্লেখ্য, 'ওয়ায়েল হাল্লাক' ইসলামের কট্টর সমালোচনাকারী একজন ফিলিস্তিনী আরব খৃষ্টান। আরবী জানার সুবাদে ইসলামের উপর কলঙ্ক লেপন করার সামান্যতম সুযোগও সে হাতছাড়া করেনি। সম্পাদক।

২৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

খ. প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টি থেকে সুন্নাহর প্রদত্ত সংজ্ঞার খণ্ডন

(১) আরবদের চোখে সুন্নাহ ব্যক্তিগত, সামাজিক নয়

কুরআনের বহু স্থানে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত না মানার পক্ষে আরবের মুশরিকদের যুক্তি ছিল: পূর্বপুরুষদের অনুকরণ। সূরা বাকারায় আছে,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٧٠﴾ [البقرة: ١٧٠]

"যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের উপর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ করো; তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যার উপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব। যদি তাদের পিতৃপুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?" [সূরা আল-বাকারা: ১৭০]

সূরা আ'রাফে আছে,

﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٨﴾ [الاعراف: ٢٨]

"তারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে এর উপর পেয়েছি আর আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি বলুন, আল্লাহ অশ্লীল কোনো কিছুর নির্দেশ দেন না। নাকি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না?" [সূরা আল-আ'রাফ: ২৮]

অধিকাংশ প্রসিদ্ধ পৌত্তলিক গোষ্ঠীর যুক্তি এটাই ছিল। ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ও একই যুক্তি দিয়েছিল। ফেরাউন আর তার সতীর্থরা মুসা 'আলাইহিস সালামকে বলেছিল,

﴿قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٧٨﴾ [يونس: ٧٨]

"তুমি কি এসেছ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে যাতে পেয়েছি তা থেকে আমাদেরকে ফেরাতে এবং যেন যমীনে তোমাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়? আর আমরা তো তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই।" [সূরা ইউনুস: ৭৮]

যুক্তিটা হলো, পূর্বপুরুষের যেহেতু কর্তৃত্ব আছে, সুতরাং তাদের কাজ মাত্রই প্রমাণ। সুতরাং যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পূর্ববর্তী নবীরা তাওহীদের দাওয়াত দেন, তখন মুশরিকরা এই দাওয়াতকে পিতৃপুরুষের কর্তৃত্বের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাদের কাছে এই কর্তৃত্বই মাপকাঠি। এর আলোকেই তারা সঠিক চালচলন নির্ধারণ করবে। অথবা এক কথায় বললে এটাই 'সুন্নাহ'। আর এই সুন্নাহ স্বভাবতই অনুসরণীয়, সম্মানিত ও সমাজের সামষ্টিক কাজ। কবি লাবীদ সংক্ষেপে এর ব্যাপারে বলেন, '(আমরা) এমন সম্প্রদায়ের, যাদের জন্য তাদের পূর্বপুরুষ রীতি-নীতি প্রণয়ন করেছিল। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই আছে নির্দিষ্ট রীতি-নীতি ও নেতা।'

সুতরাং একক ব্যক্তির কর্ম (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ) দিয়ে কখনো পূর্ববর্তী বহু মানুষের সামষ্টিক কর্মকে (তাদের সুন্নাহকে) যাচাই করা যাবে না। গোল্ডযিহার বলেন, 'শুরু থেকে সুন্নাহর অর্থ ছিল ঐ সকল আরবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন শুধরানোর মাপকাঠি, যারা ইসলামের মাধ্যমে এমন জীবনাচার ও সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যা দীন-ইসলামের বিশ্বাসের সাথে খাপ খায়। **মুসলিমদের জন্য নতুন ধারণা উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না**। কারণ তারা জাহেলী যুগের পৌত্তলিকদের মাঝে বসবাস করত। তাদের কাছে সুন্নাহ অর্থ ছিল আরবদের ঐতিহ্য, রীতিনীতি, প্রথা ও অভ্যাসের সাথে মিলে যায় এমন সকল কিছু। এ অর্থে সুন্নাহ ইসলামী যুগগুলোতে অন্যান্য আরব সমাজেও ব্যবহৃত হত, যে সমাজগুলো দীন ইসলাম দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের আগমনে 'সুন্নাহ' কথাটার পুরাতন অর্থে পরিবর্তন দেখা দেয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার অনুসারীদের প্রথম প্রজন্মের কাছে সুন্নাহ ছিল নবী এবং প্রথম যুগের সাহাবীদের কাজকর্ম। মুসলিমদের দায়িত্ব ছিল নতুন সুন্নাহর আনুগত্য করা, যেমনিভাবে পৌত্তলিক আরবেরা তাদের পূর্বপুরুষদের

সুন্নাহর অনুকরণ করত। ইসলামে সুন্নাহর এই সংজ্ঞা প্রাচীন আরবের লোকজনের নানান মত থেকে ঈষৎ পরিবর্তন করে সৃষ্ট।'[২৪২]

তার কথা মৌলিকভাবে একদিক দিয়ে সঠিক[২৪৩]। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জাহেলী পৌত্তলিকতা আর ইসলামের মাঝে ধর্মীয় ও জ্ঞানগত দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা ইসলামের মৌলিক অবস্থা হলো জীবনপদ্ধতি হিসেবে তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা এবং শির্ক প্রত্যাখ্যান করা। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো ধরনের শিথিলতা করেননি। অন্যভাবে বললে 'আরব সমাজে ইসলামের প্রবেশ শুধু বর্বর অমানবিক কিছু প্রথার সমাপ্তি ঘটায়নি, বরং **পূর্বের জীবনপদ্ধতিকে পুরোপুরি বদলে দিয়ে নতুন জীবনপদ্ধতি হাজির করেছে।'** আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নতুন জীবনপদ্ধতির 'প্রতীক' হয়েছিলেন।[২৪৪] তিনি পুরাতন কোনো জীবনপদ্ধতিকে কিছুটা কাঁটছাট করেছিলেন এমনটা নয়। বরং দীন ইসলাম পূর্বপুরুষদের সুন্নাহকে তাওহীদের প্রকৃত পিতা ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালামের সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি মনে করে। এই বিচ্ছিন্নতা ও পার্থক্যের বিবেচনায় ইসলাম খ্রিষ্টধর্ম থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। খ্রিষ্টধর্ম 'ছিল খুবই শিথিল ও নমনীয়। বিভিন্ন ধর্মীয় ঝোঁক ও প্রচলিত প্রথাকে খ্রিষ্টধর্ম সাদরে গ্রহণ করে নেয়। গ্রীক-রোমান জগতের বহু রীতি-নীতি নিজের অজান্তেই সে নিজের বিশ্বাসে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।'[২৪৫] হাসান হানাফী বলেন, 'পৌত্তলিক উৎসের উপর গড়ে ওঠায় ইউরোপীয় মানসিকতা সবসময়

---

২৪২. আস-সিদ্দীক বাশীর নসর, আত-তা'লীকাতুন নাক্বদিয়্যা 'আলা কিতাবি দিরাসাত মুহাম্মাদিয়্যা, মারকাযুল আলাম আল-ইসলামী লি-দিরাসাতিল ইস্তেশরাক, ২০০৮, পৃ. ২৮-২৯। এ হচ্ছে গোল্ডযিহার এর অপবাদ। অচিরেই এর জবাব আসছে।

২৪৩. অর্থাৎ সুন্নাহ শব্দের অর্থ রীতিনীতি হওয়ার দিক দিয়ে। কিন্তু ইসলামে সুন্নাহর বাস্তবতা হিসেবে নয়। [সম্পাদক]

২৪৪. থমাস আরনল্ড, আদ-দাওয়াহ ইলাল ইসলাম: বাহসুন ফী তারীখি নাশরিল আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যা, মাকতাবাতুন নাহদ্বাহ আল-মিসরিয়াহ, ১৯৭১, অনুবাদ: হাসান ইব্রাহীম ও আব্দুল মজীদ আবেদীন, পৃ. ৬১।

২৪৫. শার্ল জেনিবার, আল-মাসীহিয়্যা নাশআতুহা ওয়া-তাতাউরুহা, মানশুরাতুল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরূত, অনুবাদ: আব্দুল হালীম মাহমুদ, পৃ. ১২১।

পৌত্তলিক ছিল; যদিও পরবর্তীতে খ্রিষ্টধর্মের উত্থান ঘটে এবং ইউরোপে তা ছড়িয়ে পড়ে।'[২৪৬]

সংক্ষেপে বললে, **নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ছিল আরবদের সুন্নাহকে সমূলে উৎপাটনকারী এবং সমালোচনামূলক।** আরবের মুশরিকদের মাঝে এই ধ্যান-ধারণা উপস্থিত ছিল, যেমনিভাবে অন্যদের মাঝেও ছিল। কুরআন কারীম (প্রাচ্যবিদদের কাছে যেটা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য) যেমনটা বলেছে।

কিন্তু কেন এই ধ্যান-ধারণা বা চিন্তা? কেন পিতৃপুরুষের সুন্নাহর ধারণা আরব-অনারব সব সমাজ প্রচলিত ছিল? এই মানবীয় ধারণা মূলত প্রাচীন জাতিসমূহের মাঝে ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবোধ-সম্বলিত চিন্তা থাকার সাথে সম্পৃক্ত। নিছক অনুকরণের প্রাচীনত্বই আদর্শিক নমুনার মাপকাঠি হওয়ার জন্য যথেষ্ট। **কিন্তু শাখ্‌ত ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদদের চোখে সুন্নাহর যে সামাজিক ধারণা, সেটার সমালোচনায় মূল পয়েন্ট হলো: সুন্নাহ সামষ্টিক নয়, এর উৎস ব্যক্তি।** প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বিভিন্ন নমুনায় (যেমন- ইলিয়াড বা ওডিসা যেটার কথা আমরা এই বইয়ের শুরুতে বলেছি) কিছু বীর বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ভক্তির সাথে স্মরণ করা হয়। আরবীতে বলতে গেলে এদেরকে 'ইমাম' বলে গণ্য করা হয়। 'বিভিন্ন জাতির মহান বীরদেরকে প্রায়শ স্রষ্টার বংশোদ্ভূত বলে মর্যাদা প্রদান করা হত। এর থেকে বোঝা যায় ইতিহাসের উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের গুরুত্ব।'[২৪৭] এ সকল বীরদের জীবনী পরবর্তীদের জন্য আদর্শ, নিছক ইতিহাস নয়। ভাষাবিদ মিল ব্রাভম্যান (M.M. Bravmann) খুব শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, আরবদের কাছে সুন্নাহ 'ব্যক্তিগত'। তিনি মনে করেন 'সুন্নাহ হলো সেই চলার পথ যেটাকে অঙ্কন করে সাজিয়ে চর্চার পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন **নির্দিষ্ট ব্যক্তি (যিনি কালের পরিক্রমায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন)** অথবা মাঝে মাঝে এটা করেছে **নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি।** আর সামাজিক প্রথা হিসেবে এর অর্থটা গৌণ।'[২৪৮] এর উপর

---

২৪৬. হাসান হানাফী, মুকাদ্দিমাতুন ফী ইলমিল ইস্তিগরাব, পৃ. ১১৭।

২৪৭. অ্যালবান জে.উইদজ্রে, আত-তারীখ ওয়া-কাইফা ইউফাস্‌সিরুনাহু, প্রাগুক্ত, ১/১১০।

২৪৮. M.M. Bravmann, 1972, p. 155.

ভিত্তি করে বলা যায় 'নবীজীর চর্চা বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত চর্চা যেটা তিনি করেছেন, সমাজের চর্চা নয়।'[২৪৯] সুন্নাহ 'স্বাভাবিকভাবে নবীজীর সুন্নাহকে বোঝায়, যদিও তার নাম না বলা হয়।'[২৫০]

আর সুন্নাহর অর্থ হিসেবে যে 'পন্থা'র কথা বলা হয়, সেটা অর্থগত দিক থেকে নেতৃত্বের সাথে সম্পৃক্ত (আর নেতৃত্ব নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়)। আল্লাহর বাণী "আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, আর তারা উভয়ে স্পষ্ট পথের উপর ছিল" এর ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেন, 'অর্থাৎ পথের উপর'। ইমাম ত্বাবারী বলেন, لبإمام 'এমন পথ যেটা তারা সফরে অনুসরণ করে' আর مبين 'যিনি সুপথে চলেন, তার সঠিক চলনের কারণে সেটা তার জন্য স্পষ্ট হয়ে যায়'। আর পথকে 'ইমাম' বলা হয়েছে, কেননা সেটা অনুসরণীয়।[২৫১] ইতিহাসের ব্যাপারে মূল্যবোধ-সম্বলিত চিন্তা আরো স্পষ্ট প্রকাশ পায় আরবের লোকেরা যখন 'সীরাহ' এবং 'সুন্নাহ' শব্দ দুটি একটি অন্যটির জায়গায় ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আলী ইবন আবী ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাওয়ার পর আবু বকর খলীফা হলেন। তিনি তার মতো কাজ করলেন। তার সীরাহ অনুসরণ করলেন। অবশেষে আল্লাহ তাকে নিয়ে গেলেন। তারপর উমর খলীফা হলেন। তিনি তাদের দুজনের মতো কাজ করলেন। তাদের সীরাহ অনুসরণ করলেন। অবশেষে আল্লাহ তাকে নিয়ে গেলেন।'[২৫২] এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সীরাহ অর্থ আমরা সীরাতের বইয়ে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনাবলি পড়ি সেগুলো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য নবীজীর যে কর্মপন্থা অনুসরণ করা আবশ্যক। মুখতারুস সিহাহ প্রণেতা 'সুন্নাহ' মূলধাতুর অধীনে বলেন, 'সুন্নাহ হলো সীরাহ। হুযাইল গোত্রের কবি খালিদ ইবন যুহাইর বলেন, فلا تجزعن من سنة أنت سرتها *** فأول راض سنة من يسيرها আপনি যে সুন্নাহর উপর চলেছেন, সেটার ব্যাপারে

২৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

২৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

২৫১. তাফসীরুত ত্বাবারী (১৭/১২৫)।

২৫২. মুসনাদ আহমদ, রিসালাহ ছাপা, পৃ. ১০৫৫। শাইখ শুয়াইব আরনাউত্ব বলেন, এর সনদ হাসান।

দুর্ভাবনায় ভুগবেন না। কেউ যখন কোনো পথে চলে, তখন সেই সুন্নাহর উপর সর্বপ্রথম সন্তুষ্ট ব্যক্তি সে-ই থাকে।'

সারকথা হলো, সুন্নাহ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব, জীবনী ও কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম প্রজন্মের লোকজন যদিও প্রতিষ্ঠিত আমলকে সুন্নাহ বলত, হোক সেটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ কিংবা তার পরবর্তী খলীফাদের, তবুও প্রথম প্রজন্মের লোকজন মনে করত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সংঘটিত বিষয় **অন্যদের থেকে পৃথক। অন্য যে কারো উপর তার অগ্রাধিকার আছে। সাহাবীদের সুন্নাহসমূহও তার দিকে ফিরে যায়।** গবেষক উইলিয়াম গ্রাহাম (William A. Graham) হাদীসে কুদসীর উপর একটা গবেষণা করেছেন যার শিরোনাম 'Divine Word and Prophetic Word in Early Islam'। গবেষণার মূল বক্তব্য ছিল সাহাবীরা কখনো কুরআন-হাদীসকে প্রমাণ বিবেচনায় ভিন্ন মনে করতেন না; সে ব্যাপারে দলীল হলো উভয়ের মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী বিষয় তথা হাদীসে কুদসীর উপস্থিতি। গ্রাহাম বলেন, 'পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমদের জন্য হাদীস বাদ দিয়ে শুধু কুরআন বোঝা এবং সেটা অনুযায়ী জীবন ধারণ করা সম্ভব না, ঠিক যেমনিভাবে সাহাবীদের পক্ষে নবীজীর মাধ্যম ছাড়া কুরআন গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তিনি তাদের কাছে কুরআন ব্যাখ্যা করে দেন এবং নতুন সমাজকে (মুসলিম সমাজ) পরিচালিত করার কাজে ব্যবহার করেন। ওহী এবং নবীজীর বার্তা উভয়টা একত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উর্ধ্বতন কার্যক্রমের মূল বলে বিবেচিত হয়। এই দুটি বিষয় একত্রিত হয়ে ইসলামের ইতিহাসের সূচনালগ্নে থাকা পবিত্র অংশে পরিণত হয়।'[২৫৩] তিনি আরো বলেন, 'বড় বড় সাহাবী-তাবেয়ীদের সমাজে জীবন্ত এই সুন্নাহ নবীজীর সুন্নাহ থেকে ভিন্ন কোনো মাপকাঠির উপর গড়ে তোলা হয়েছে এমন ধারণা করাটা ভুল। নবুওয়াত পরবর্তী সমাজ যেভাবে সুন্নাহকে চর্চা করে এসেছে, সেটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সুন্নাহর চর্চিত অবস্থারই চলমান রূপ।'[২৫৪]

---

২৫৩. William A. Graham, Divine Word and Prophetic Word in Early Islam, The Hague and Paris: Mouton, 1977, p. 10.

২৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

শাখত যে তত্ত্বীয় পরিধি টেনেছেন, সেটা যদি আমরা মেনেও নিই, তাহলে 'নবীজীর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে এমন হাদীসের সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন কিংবা ফিকহী নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হিসেবে নবীজীর সুন্নাহর ধারণায় আনুষ্ঠানিকভাবে যত বিবর্তন হোক না কেন, সমাজ বুঝতে পেরেছিল যে সমাজের কাছে নির্ভরযোগ্য উৎস আর ইলম ও হিদায়াতের উৎস ওহী এবং ওহী বাহকের চালচলনে নিহিত। হাদীসের পরবর্তী অবস্থা থেকে এটা বোঝা যায় না যে নবীজীর সুন্নাহকে শক্তিশালী করার জন্য পরবর্তীতে এর উত্থান হয়েছে।'[২৫৫]

ইয়াসিন ডুটন (Yasin Dutton) ইমাম মালেকের মুয়াত্তা গ্রন্থের উপর একটি গবেষণা করেন। সেখানে তিনি সুন্নাহর চারটি প্রকরণ আলাদা করেন। প্রথমটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শিক কর্মকাণ্ড, অথবা বলতে গেলে কুরআনের 'জীবন্ত চিত্রায়ণ'। দ্বিতীয়টা হলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কর্মকাণ্ড। তৃতীয়টা হলো মদীনার লোকজনের মাঝে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান কর্মকাণ্ড। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইয়াসিন ডুটন দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থে সুন্নাহর ব্যবহার 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমের সাথে মৌলিকভাবে জড়িত থাকার কথা বলেছেন।' তিনি মনে করেন 'মদীনাবাসীদের সুন্নাহ নবীর কর্মকাণ্ড ও চর্চা থেকে উদ্ভূত, যেটাকে সাহাবীরা এবং তার পরে মালেকের সময়কাল পর্যন্ত মদীনাবাসীরা প্রয়োগ করেন।' আর 'সুন্নাহ শুধু মদীনার আলেমরা সংরক্ষণ করত না, বরং মদীনার সমাজ সুন্নাহকে সংরক্ষণ করত।'[২৫৬]

এমনকি অনৈসলামিক উৎসসমূহও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মকাণ্ডকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণের বিষয়টা স্বীকার করে। প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'মা-ওয়ারা-আন্নাহর' অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিমে বসবাস করতেন এমন একজন সুরইয়ানী লেখক হলেন ইউহান্না ইবনুল ফানকী। তিনি মনে করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আরবদের পথপ্রদর্শক। আরবের লোকজন তার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলেছিল। তাকে 'অনুকরণ' করেছিল। রবার্ট হুইলান্ড মনে করেন এখানে 'অনুকরণ'

---

২৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

২৫৬. Adis Duderija (ed.), 2015, p.17.

বলতে উদ্দেশ্য হলো তারা 'তাকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং তাদের নবীর আদর্শিক নমুনা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।'[২৫৭]

সুন্নাহর ব্যাপারে উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি যৌক্তিক, আর এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের ব্যাপারে প্রাচীন জাতিসমূহের ধারণার সাথে মিলে যায়। শাখ্তের বক্তব্যে যে বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানের ধারণা পাওয়া যায়, সে রকম কিছু এখানে নেই। আবার এই দৃষ্টিভঙ্গি শাফেয়ীর স্পষ্ট বক্তব্যের সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছেন, "নিজেকে আলেম বলেছে অথবা লোকজন আলেম বলে অভিহিত করেছে এমন কাউকে আমি এ ব্যাপারে দ্বিমত করতে দেখিনি যে, আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের নির্দেশ মান্য করা এবং তার বিধানের সামনে নিজেকে সমর্পণ করা আবশ্যক করেছেন। সেটা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা নবীর পরবর্তী সবাইকে তার অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ছাড়া অন্য কারো বক্তব্য কোনো অবস্থাতেই অনুসরণ করা আবশ্যক হবে না; কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া সব কিছু এই দুটিরই অনুগামী হবে। আমাদের আগের ও পরের মানুষদের উপর যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা গ্রহণ করে নেওয়া আবশ্যক ছিল, তেমন বর্ণনা গ্রহণ করা আমাদের উপরও আবশ্যক।"[২৫৮] শাখ্তের সৃষ্ট এই শূন্যস্থান উদঘাটন করে কুলসন বলেন, 'শাখ্তের গবেষণা পদ্ধতিগতভাবে এগিয়ে যে ফলাফলে উপনীত হয় সেটা হলো শরয়ী বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীসগুলো সর্বোচ্চ একশত হিজরী পর্যন্ত পৌঁছায়। এভাবে সে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত সব বিধানের সত্যতা অস্বীকার করে। তার এমন সিদ্ধান্তের ফলে ইসলামের প্রথম যুগে শরয়ী বিধান প্রণয়নের বিবর্তন কল্পনা করার জায়গাটাতে একটা শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়।' তাই কুলসন এই শূন্যস্থান অস্বীকার করে বলেন, 'বাস্তবতার বিবেচনা করলে এবং তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ভেবে দেখলে এমন শূন্যস্থান সৃষ্টি হওয়ার মতো ধারণা মেনে নেয়া

---

২৫৭. Robert G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw it: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam, Studies in Late Antiquity and Early Islam, 13 (Princeton, N.J: Darwin Press, 1997). P. 196-197.

২৫৮. জিমাউল ইলম (পৃ. ৫)।

খুব কঠিন। তার মানে এটা প্রস্তাব করছি না যে, এই হাদীসের অমুক বা তমুক সনদ সহীহ। কারণ এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়টা এমন না। কিন্তু আমার প্রস্তাব হলো বহু হাদীস (বিশেষ করে যেগুলো প্রচলিত সমস্যাবলির ব্যাপারে বারংবার আসে এবং কুরআনের শরয়ী বিধান যেগুলোকে ফুটিয়ে তোলে) অন্ততপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌখিক বর্ণনার সংরক্ষিত রূপকে তুলে ধরে। আর এই ভূমিকাটা যদি গ্রহণযোগ্য হয়েই থাকে, তাহলে এটা ইতিহাসের ব্যাপারে একটা যৌক্তিক বুদ্ধিভিত্তিক ভিত প্রদান করে, যেটা অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধকৃত যেকোনো বক্তব্য গ্রহণ আবশ্যক হয়ে যায়; যদি না এমন কোনো কারণ উপস্থাপন করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সেটা বানোয়াট হওয়া আবশ্যক হয়।'[২৫৯]

ওয়ায়েল হাল্লাক বলেন, 'দলীল-প্রমাণগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, রাসূলের মৃত্যুর পরই তার সুন্নাহর প্রকাশ ঘটে। এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়, যেহেতু তার সমকক্ষ নয় এমন বহু আরব ব্যক্তিত্বও সুন্নাহ প্রণয়ন করেছে। সুতরাং ইসলামের প্রথম সমাজে সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনাচরণের আদর্শিক নমুনা হিসেবে থাকবেন না এমনটা মানা কঠিন; যেখানে কুরআন মুমিনদেরকে বহু স্থানে স্পষ্ট তার আনুগত্য করা এবং তার কর্মের অনুসরণ করতে বলেছে। কুরআনের সেই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।'[২৬০]

ফযলুর রহমান মালেক বলেন, 'বিংশ শতাব্দীতে এসে এটা দাবি করা বালখিল্য হবে যে, নবীজীর আশেপাশে থাকা মানুষেরা কুরআন এবং সুন্নাহকে পৃথক চোখে দেখত; যে কারণে একটা বাদ দিয়ে অন্যটা আঁকড়ে ধরত। অর্থাৎ একটাকে অন্যটা থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করত। সাহাবীরা কি একবারও প্রশ্ন করেনি যে, আল্লাহ কেন এই মানুষকে তার বার্তাবাহক হিসেবে নির্বাচন করেছেন? পরবর্তী যুগের বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক থেকে উৎসারিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ওহীর একজন রেকর্ডার মাত্র। এটা নবীজীর ব্যাপারে কুরআনী

২৫৯. কুলসন, ফী তারীখিত তাশরী'ঈল ইসলামী, পৃ. ৯৪।
২৬০. হাল্লাক, নাশআতুল ফিকহিল ইসলামী ওয়া-তাতাউরুহু (পৃ. ৮২-৮৩)।

দৃষ্টিভঙ্গির পুরো বিপরীত, যেখানে নবীকে স্বতন্ত্র অবস্থান দেওয়া হয়েছে এবং বৃহৎ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।'[২৬১]

কিন্তু কুলসন স্ববিরোধিতা করে বলেন, 'আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি সেটা হলো, শাখ্‌তের গবেষণার মূলভিত্তি বর্জনীয় নয়। শরীয়ত হিসেবে নবীজীর দিকে যা কিছু সম্বন্ধযুক্ত করা হয় তার বড় অংশই বানোয়াট, পরবর্তী বিভিন্ন ফিকহী মত প্রতিষ্ঠার জন্য সেগুলোকে জাল করা হয়েছে'[২৬২]। এই স্ববিরোধিতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না, যেখানে এই কুলসন স্বয়ং শাখতের বেশ শক্তপোক্ত সমালোচনা করেছেন, আবার যখন পক্ষ নিয়েছেন তখন শাখ্‌তের ভিত্তির পক্ষে কোনো দলীল প্রদান করেননি। এই শূন্যস্থানটাই নিষ্ফল মতভেদের মূল জায়গা যেটা হাদীসের উৎস নির্ণয়ে প্রাচ্যবিদদের গবেষণাকে আক্রান্ত করেছে। অর্থাৎ নিজেদের কল্পনা দিয়ে তারা যে শূন্যস্থান তৈরি করেছে।

জন ওয়ালব্রিজ বলেন, 'যাইহোক, পশ্চিমের গবেষকরা যখন ইসলামের প্রথম দুই বা তিন প্রজন্মে ধর্মীয় মতভেদের প্রসঙ্গে হাদীসের উৎপত্তির খোঁজ করতে এবং সেগুলোর মূল খুঁজতে গিয়েছেন, তখন তারা মুসলিম আলেমদের থেকে বেশি সফল হননি। কারণ হাদীসের ইতিহাস তারা কীভাবে নির্ণয় করবে, সেটার ব্যাপারে তাদের মাঝে ঐকমত্য হয়নি। নানা পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটলেও সেগুলো হাদীসের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসগত দিক অথবা হাদীসের সনদের উপর নির্ভর করেছে, আর এগুলোর কোনোটিই পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।'[২৬৩]

আমরা সুন্নাহর যে নৃতাত্ত্বিক ভিত প্রতিষ্ঠা করলাম, এটা শাখ্‌তের প্রকল্পের মূলোৎপাটন করে দেয়। কারণ এটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবে-তাবেয়ীদের সংযোগকে অন্তত‌পক্ষে সম্ভাব্যতার স্তরে রেখে দেয়। আর বাস্তবে এটা বিচ্ছিন্নতার দাবিকে পুরোপুরি নাকচ করে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ঐতিহাসিকভাবে এমন বিচ্ছিন্নতার অসম্ভাব্যতা স্পষ্ট করে। (নবীজীর

২৬১. Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History, Pakistan: Islamic Research Institute, P.9.

২৬২. কুলসন, ফী তারীখিত তাশরী'ঈল ইসলামী, পৃ. ৯৪।

২৬৩. ওয়ালব্রিজ, আল্লাহ ওয়াল-মান্তেক ফিল-ইসলাম, পৃ. ৭৪।

সাথে তাবে তাবেয়ীদের) যেকোনো প্রকার সংযোগের ধারণা শুনলেই শাখ্ত অস্বস্তি অনুভব করতেন। কারণ তিনি জানতেন এটা তার প্রকল্পের জন্য কতটা ভয়াবহ। তাই কুলসনের 'তারীখুত তাশরী'ইল ইসলামী' বইটা যখন কল্পিত শূন্যস্থানকে নাকচ করে দিল, তখন তার বিপক্ষে বিশাল খণ্ডন লিখে তিনি বলেন, 'কুলসন সাহেব প্রাচীন ইমামদের দিকে সম্বন্ধকৃত মাযহাব সাব্যস্ত করে পেছনে যেতে যেতে নবীজী পর্যন্ত সব সাব্যস্ত করে ফেলেছেন। বানোয়াট সনদগুলোকে তিনি নিঃসংকোচে মেনে নিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে তিনি বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোর সনদসমূহ বাহ্যত দ্বিতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝিতে গিয়ে উদ্ভূত মনে হলেও এগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত মাযহাবসমূহ নবীজী থেকে প্রমাণিত বিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলা যেতে পারে; যদি সেই বর্ণনাগুলো নবীজীর মাদানী সমাজের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু তখনকার অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ ও এ মর্মে বানানো সনদগুলো কোনোটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ সেগুলো বানোয়াট। তার এই কথা মূলত মাযহাবগুলোকে বিপরীত দিক থেকে নির্ভরযোগ্য বলার চেষ্টা, সাথে সাথে নিজের মতেরও সমর্থন। কুলসন সাহেব নিজেকে তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসদের চাইতেও হাস্যকর করে তুলেছেন, যারা কিনা অন্তত কিছু হাদীস বর্জন করেছিল যেগুলো তাদের মাপকাঠিতে জাল বলে বিবেচিত হয়েছিল।'[২৬৪]

উপর্যুক্ত খণ্ডন পড়লে বোঝা যায়, নবীজীর সুন্নাহর সাথে তাবে-তাবেয়ীদের কোনো ধরনের সংযোগের ইঙ্গিত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে শাখ্ত কতটা দৃঢ় অবস্থানে। এমনকি এমন একজন পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ 'যিনি ব্যক্তিগত ও একাডেমিক জায়গা থেকে শাখ্তকে এত বেশি জানতেন যে, শাখ্তও তার সমালোচনামূলক লিখনীকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন'[২৬৫] এবং যিনি সনদের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করতেন, তবুও তিনি কেবল সুন্নাহর ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হওয়ার কারণে তার কথা শাখ্ত কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

---

২৬৪. ফাহাদ আল-হামূদী, নাক্দু নাযারিয়্যাতিল মাদার, আশ-শাবাকাতুল আরাবিয়্যা লিল-আবহাসি ওয়ান-নাশর, ২০১৪, অনুবাদ: হাইফা আল-জাবরী, পৃ. ৬৮।

২৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

আর বর্ণনার দিক (নকলের) থেকে যদি আমরা প্রমাণের খোঁজ করি, তাহলে এমন বহু টেক্সট আছে যেগুলোতে 'সুন্নাহ' শব্দটা ব্যবহার করে উদ্দেশ্য করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। যেমন- সহীহ মুসলিমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার বাণী, "আবত্বাহে অবতরণ করা সুন্নাহ না। এই জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করার কারণ বের হওয়ার সময় এটা তার জন্য সহজ ছিল।"[২৬৬]

আবুত-তুফাইল বলেন, আমি ইবন আব্বাসকে বললাম, আপনার সম্প্রদায় দাবি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাঘরকে কেন্দ্র করে রমল (দ্রুতবেগে হাঁটছিলেন) করেছিলেন, আর সেটা সুন্নাহ। তিনি বললেন, 'তারা সত্য বলেছে, মিথ্যাও বলেছে।' আমি বললাম, 'তারা কী সত্য বলল আর কী মিথ্যা বলল?' তিনি বললেন, 'সত্য বলেছে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমল করেছেন। আর মিথ্যা বলেছে; এটা সুন্নাহ নয়।[২৬৭] হুদায়বিয়ার সন্ধি চলাকালীন কুরাইশ সম্প্রদায় বলেছিল, 'মুহাম্মাদ ও তার সাহাবীদের ছেড়ে দাও। তাদের নাক দিয়ে পোকা পড়তে পড়তে তারা মারা যাক।' পরবর্তী বছর এসে মক্কায় তিন দিন থাকার শর্তে তাদের সাথে সন্ধি হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আসলেন। মুশরিকরা তখন কু'আইক্বা'আনের দিকে ছিল। তিনি সাহাবীদের বললেন, "তোমরা কাবাঘরকে কেন্দ্র করে তিন বার রমল করো।" আর এটা সুন্নাহ নয়। আমি বললাম, 'আপনার সম্প্রদায় দাবি করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে চড়ে সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেছিলেন, আর এটা সুন্নাহ।' তিনি বললেন, 'তারা সত্য বলেছে, মিথ্যাও বলেছে।' আমি বললাম, 'তারা কী সত্য বলেছে আর কী মিথ্যা বলেছে?' তিনি বললেন, 'সত্য বলেছে; আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা-মারওয়ার মাঝে উটের পিঠে চড়ে তাওয়াফ করেছিলেন।

---

২৬৬. হাদীস নং ১৩১১; অনুরূপ বুখারী, হাদীস নং ১৭৬৫।

২৬৭. অর্থাৎ বর্ণনাকারী বলছেন, এটি সুন্নাহ নয়। কিন্তু তারা এটিকে সুন্নাহ মনে করেছে। [সম্পাদক]
উল্লেখ্য যে, যে কারণেই হোক না কেন, রমল করা সুন্নাহ। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে রামল করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, সুন্নাহ না বলার বিষয়টি সাহাবীর ইজতিহাদ ছিল।

আর মিথ্যা বলেছে; এটা সুন্নাহ নয়।[২৬৮] মানুষজন তার থেকে দূরে সরত না, তাদেরকে দূরে সরানো যেত না। তাই তিনি উটের পিঠে চড়েছিলেন, যেন তারা তার কথা শুনতে পায়, তার জায়গা দেখতে পায় এবং তাদের হাত তার শরীর স্পর্শ না করে।'[২৬৯]

আরো কিছু শরয়ী টেক্সট আছে যেগুলো প্রমাণ করে শাফেয়ীর আগে সাহাবীদের সুন্নাহ (যার কেন্দ্রবিন্দু নবীজীর সুন্নাহ) থেকে স্বতন্ত্র নববী সুন্নাহর ধারণা ছিল। সেই টেক্সটগুলো শাখ্তের চিন্তাধারা অনুযায়ী বোঝা সম্ভব নয়। শামের এক লোক ইবন উমারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, উমরাহ থেকে হজ্জ পর্যন্ত তামাত্তু' (ইহরাম থেকে মুক্ত থাকা) করা যাবে কিনা। তখন আব্দুল্লাহ ইবন উমার বলেছিলেন, 'এটা হালাল।' শামের লোকটা উত্তর দিয়েছিল, 'আপনার বাবা তো নিষেধ করেছেন।' আব্দুল্লাহ ইবন উমার বলেছিলেন, 'যদি আমার বাবা কোনো কিছু করতে নিষেধ করে যেটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন, তাহলে কি আমার বাবার নির্দেশ অনুসরণ করব? নাকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ?' লোকটা বলল, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ।' ইবন উমার বললেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটা করেছেন।'[২৭০] সালেহ ইবন কাইসান (১৩০ হি.) বলেন, আমি আর ইবন শিহাব ইলম অর্জনের জন্য একত্র হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা সুন্নাহ লিখব। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে আমরা যা যা শুনলাম তার সবই লিখলাম। তারপর তার সাহাবীদের থেকে শ্রুত বিষয়গুলো লিখলাম। আমি বললাম, 'না, এটা সুন্নাহ নয়।' তিনি বললেন, 'বরং এটা সুন্নাহ।' তিনি লিখলেন, আমি লিখলাম না। সে সফল হলো, আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হারিয়ে ফেললাম।[২৭১] শেষ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, শাফেয়ী যে সুন্নাহ বলতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মনে করতেন সেটা তার আবিষ্কার নয়, বরং তার আগেও ছিল। আবার সুন্নাহ বলতে তিন প্রজন্ম একটা ব্যাপক বিষয়কে বুঝত, যেটা সাহাবীদের

২৬৮. অর্থাৎ বর্ণনাকারী বলছেন, এটি সুন্নাহ নয়। কিন্তু তারা এটিকে সুন্নাহ মনে করেছে। -সম্পাদক।

২৬৯. সুনান আবু দাউদ, হা. ১৮৮৫, হাদীসটির সনদ সহীহ।

২৭০. সুনান আবু দাউদ, হা. ৮২৪, হাদীসটির সনদ সহীহ।

২৭১. মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক (১১/২৫৮), মা'মার ইবন রাশেদের সূত্রে।

মতো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করত। এই বিষয়টা শাখ্‌ত বুঝতে পারেননি, তাই তিনি এই টেক্সট পড়ে ধারণা করেছেন যে, 'মদীনাবাসীরা নবীজীর বর্ণনার উপর সাহাবীদের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিত'![২৭২]

(নবীজীর) সুন্নাহ ছিল জাহেলী পূর্বপুরুষের সুন্নাহর সমালোচনার একটা উপকরণ, পাশাপাশি এর ছিল এক বৃহৎ সামাজিক কর্তৃত্ব, যার বাহক সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেয়ীরা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতায় 'সংরক্ষিত দীর্ঘতম সামাজিক বিবরণী, যেটাকে আজ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদরা জেনেছে।'[২৭৩]

প্রথম যুগ থেকেই সমালোচনার বিশেষত্ব থাকায় দীন ইসলাম হয়ে পড়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জড়িত সকল কিছুর নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর উচ্চতর অবস্থানের দিক থেকে, যেটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। যখন 'ইসলাম এল, আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল এবং রাসূলে আরাবীর জীবনী বিস্তারিত জানার প্রয়োজন দেখা দিল যার থেকে তার সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে, তখনই কিছু মানুষ সুন্নাহ সংকলন ও লিখনীতে মনোযোগ দিলেন। এভাবে ইসলামে আরবদের ইতিহাসচর্চার সূচনা ঘটল।'[২৭৪]

এখানে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইসলামের ইতিহাসে সমালোচনা আর ইউরোপের রেনেসাঁর যুগে ইতিহাসে সমালোচনার সূচনার ক্ষেত্রে পার্থক্য। 'আমরা যদি ইউরোপীয়দের সমালোচনাকে আরব মুসলিমদের প্রথম যুগের সমালোচনার সাথে তুলনা করি, তাহলে দেখতে পাব দ্বিতীয়টা তার উপাদান, গবেষণার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে রেনেসাঁর যুগে সূচিত ইউরোপীয় ইতিহাসভিত্তিক সমালোচনার চাইতে ভিন্ন ছিল। কারণ আরবদের কাছে ইতিহাস গড়ে ওঠে হাদীসশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে। আর হাদীসশাস্ত্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞান। অর্থাৎ ইতিহাস ঐ সকল (ধর্মীয়) শাস্ত্রের

২৭২. Joseph Schacht, 1950, p.24.

২৭৩. লেখকবৃন্দ, আত-তারীখুশ শাফাওয়ী, পৃ. ১২৫।

২৭৪. একসি হার্নশো, ইলমুত তারীখ, নাকলাহুত তা'রীব ওয়াত-তা'লীক ওয়ান্-নাশর, ১৯৩৭, অনুবাদ: আব্দুল হামীদ আল-আব্বাদী, পৃ.৫৩।

সাথে মিশে গিয়ে নিজের উদ্দেশ্যকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে; যাতে সেগুলোর লক্ষ্যের সাথে মিলে যায়। আর এটা ইসলামের ইতিহাসশাস্ত্র গড়ে ওঠার সূচনালগ্নের কথা। এছাড়া ইতিহাস হাদীসশাস্ত্র থেকে ধর্মীয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপকরণ গ্রহণ করেছে, যেটা হলো জারহ-তা'দীল তথা মুহাদ্দিসদের দ্বারা চর্চিত হাদীসের সনদের সমালোচনা। ইতিহাসের সমালোচনাও একইভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ যাচাইয়ের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। সময়ের পরিক্রমায় আধুনিক ইতিহাসের সংহতি দুর্বল হওয়া এবং ইতিহাসের সমালোচনার প্রক্রিয়া জটিল হয়ে যাওয়ার পরও আরব মুসলিমরা যে ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক সমালোচনা সে সময়ে জেনেছিল সেটা খুব দুর্বলভাবে হলেও ধর্মীয় দিক এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত রয়ে গিয়েছে। আমরা দেখতে পাই রেনেসাঁর যুগে ইউরোপীয় ইতিহাসের সমালোচনা এমন পরিবেশে গড়ে ওঠে যার সাথে ধর্মের বিরোধ থাকুক কিংবা না থাকুক, কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। এর লক্ষ্য ছিল ইউরোপীয় বিবেক-বুদ্ধিকে গীর্জার প্রভাব ও চিন্তার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আনা। ফলে ইউরোপীয়রা (বিশেষ করে ইতালির লোকজন) তাদের ঐতিহাসিক গবেষণায় রেনেসাঁর যুগের আগ পর্যন্ত সকল ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ঐতিহ্যকে সমালোচনার চোখে দেখে, তন্মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং গীর্জার ধর্মীয় ও সময়-নির্ভর কর্তৃত্বের স্থিত ভিতসমূহ।'[২৭৫] উদাহরণস্বরূপ আপনি তুলনা করে দেখতে পারেন পৌত্তলিক নানান টেক্সটের উপর রেনেসাঁর যুগের 'তত্ত্বীয় গবেষণা', যা কিনা খ্রিষ্টধর্মের ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল; আর প্রাচীন ব্যক্তিদের বর্ণনার ক্ষেত্রে মুসলিম আলেমদের জ্ঞানগত মূল্যবোধ-নির্ভর গবেষণা 'যার মাধ্যমে তারা কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত প্রাচীন জাতিসমূহের দিকে কৃত ইঙ্গিত বোঝার চেষ্টা করেছিল।'[২৭৬]

সাহাবীদের সমালোচনার পদ্ধতি ছিল **প্রয়োজনের অনুসরণে, সংশয় থেকে উদ্ভূত নয়।** একজন মানুষের ভুল-ত্রুটি হবে কিংবা সংশয়-কল্পনা আসবে এটা স্বাভাবিক। সে কারণে আমরা দেখি বেশ কিছু সাহাবী নির্দিষ্ট কিছু

২৭৫. জামীল আন-নাজ্জার, দিরাসাত ফী ফালসাফাতিত তারীখ আন-নাকদিয়্যাহ, পৃ. ১২৫-১২৬।

২৭৬. হার্নশো, ইলমুত তারীখ, পৃ. ৫৫।

হাদীস যাচাই-বাছাই করে দেখেছে। আবার আমরা দেখতে পাই কিছু সাহাবী একজন সাহাবীর একটা বর্ণনার সমালোচনা করেছে, যখন সেটা সমালোচক সাহাবীর কাছে থাকা মূলনীতি বা প্রমাণিত জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়েছে। যেমনটা আমরা কিছু সাহাবীর ব্যাপারে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার প্রতিবিধানমূলক মন্তব্যে দেখতে পাই। তবে এ ধরনের সমালোচনার প্রয়োজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। শীঘ্রই ভুলের সাথে যুক্ত হয় মিথ্যাচারের মতো উপাদানও, আর এটা দেখা দেয় যখন ফিতনা শুরু হয়। ইবন সীরীন (১১০ হি.) বলেন, 'তারা সনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করত না। তারপর যখন ফিতনা দেখা দিল তখন বলল, আমাদেরকে তোমাদের বর্ণনাকারীদের নাম দাও। আহলুস সুন্নাহর হাদীস গ্রহণ করা হবে আর বিদাতীদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।'[২৭৭] এখানে ফিতনা বলতে উদ্দেশ্য হলো তৃতীয় খলীফা উসমান ইবন আফ্‌ফান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু শহীদ হওয়ার কারণে সাহাবীদের মাঝে সংঘটিত ফিতনা এবং খারেজীদের উত্থানের ফিতনা। এটা দ্বারা ১২৬ হিজরীতে ওয়ালীদ ইবন ইয়াযীদের মৃত্যু উদ্দেশ্য না, যেমনটা দাবি করেছে শাখ্‌ত। ইবন সীরীন যেহেতু এর আগে মারা গিয়েছেন, সেহেতু শাখ্‌তের দাবি হলো এই আছার তার নামে বানানো হয়েছে। এই আছারের সাথে এমন অদ্ভুত আচরণের কারণ শাখ্‌ত মনে করেন 'প্রথম প্রজন্মে সনদের উপস্থিতি যৌক্তিক নয়', এক্ষেত্রে তিনি সুন্নাহর ব্যাপারে তার নিজস্ব তত্ত্বের উপর নির্ভর করেছেন। 'এমনকি যুক্তিসঙ্গত একটা সম্ভাবনার দিকে তিনি ফিরেও তাকাননি যেটা হলো, ইবন সীরীন হয়তো আসলে এমন কথা বলেছেন; আর ফিতনা বলতে হয়তো ওয়ালীদের নিহত হওয়ার ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু বোঝাতে পারে (যেমন প্রথম শতকে সংঘটিত অন্য যেকোনো বড় ফিতনা), তাহলে তার ব্যাখ্যাটা আরো স্বাভাবিক হতো।'[২৭৮] কারণ বর্ণনার উৎসে (সাহাবীতে) না পৌঁছালে এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় যে, একজন তাবেয়ী (প্রয়োজন মনে করলে কিংবা মাঝে মাঝে হলেও) যে তাবেয়ীর সূত্রে বর্ণনা করছে তার সনদের খোঁজ করবে। এই ফলাফলে পরবর্তী বেশ কিছু প্রাচ্যবিদ পৌঁছে যান, তন্মধ্যে ছিলেন জে. ইয়াম্বুল; যিনি মনে করেন সনদ (সমালোচনার স্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে রিজাল শাস্ত্র নয়) প্রথম হিজরী শতকের

২৭৭. সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমাহ।

২৭৮. H. Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, Meccan Fiqh before the Classical Schools, Transl. by M. Katz, Leiden 2002, p.23.

সত্তরের দশকে দেখা দেয়। এমনকি জোসেফ ভান এস মনে করেন, এই ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর ফিতনা।'[২৭৯]

সাধারণভাবে বোঝা যায়, প্রথম দিকের বর্ণনাগুলোতে তীব্র প্রয়োজনের কারণে সবসময় ধারাবাহিক সমালোচনামূলক কাজ অব্যাহত ছিল। মুসলিম উম্মাহর প্রথম প্রজন্মসমূহের মাঝে হাদীসের সমালোচনার এই ধারাবাহিকতার বিবরণ একজন ইমামের বক্তব্যে বিদ্যমান। তিনি হলেন ইমাম ইবন হিব্বান। তার ভাষায়, 'সাহাবীরা বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করতেন, তেমনটা গ্রহণ করেন মদীনার কিছু তাবেয়ী, তন্মধ্যে ছিলেন: সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (৯৩ হি.), কাসেম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর (১০৬ হি.), সালেম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমার (১০৬ হি.), আলী ইবনুল হোসাইন ইবন আলী (৯৩ হি.), আবু সালামাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আউফ (৯৪ হি.), উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উতবাহ ইবন মাসঊদ (৯৮ হি.), খারেজা ইবন যাইদ ইবন সাবেত (৯৯ হি.), উরওয়া ইবনুয যুবাইর ইবনুল আওয়াম (৯৪ হি.), আবু বকর ইবন আব্দুর রহমান ইবনুল হারেস ইবন হিশাম (৯৪ হি.), সুলাইমান ইবন ইয়াসার (১০০ হিজরীর পরে মারা যান)। তারা সুন্নাহ সংরক্ষণ করেন, সুন্নাহর অন্বেষণে সফর করেন, সুন্নাহর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন, দীনকে আঁকড়ে ধরেন এবং মুসলিমদেরকে দীনের দাওয়াত দেন। এরপর তাদের থেকে ইলম গ্রহণ করে হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার অনুসন্ধান এবং বর্ণনাকারী বাছাইয়ের কাজ করার পাশাপাশি সুন্নাহ সংকলনে আরো একদল লোক সচেষ্ট হন। তন্মধ্যে ছিলেন: যুহরী (১২৪ হি.), ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (১৪৪ হি.), হিশাম ইবন উরওয়া ইবনুয যুবাইর (১৪৫ হি.), সাদ ইবন ইব্রাহীম (১২৫ হি.) এরা সহ মদীনার একটা দল। তবে তাদের

---

২৭৯. 'ফিতনা' পরিভাষার ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের মতামত জানতে পড়ুন Shaukat, Jamila, "Isnad in Hadith Literature", Islamic Studies 24/4 (1985), p. 445-454.
ইবন সীরীন অন্যান্য যে সকল জায়গায় 'ফিতনা' শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে শাখ্‌তে
র মতের খণ্ডন জানতে দেখুন— খালেদ আদ-দুরাইসের 'আল-উয়ুবুল মানহাজিয়্যাহ ফী-কিতাবাতিল মুস্তাশরিক শাখ্‌ত আল-মুতায়াল্লিকাহ বিস-সুন্নাহ আন-নাবাউইয়্যাহ', মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ, পৃ. ৫৫-৫৬।

মধ্যে সবচেয়ে সচেতন, মুখস্থে অগ্রগামী, বেশি ভ্রমণকারী এবং উঁচু হিম্মতের অধিকারী ছিলেন যুহরী রাহমাতুল্লাহ 'আলাইহি। এরপর তাদের থেকে হাদীস সংকলন, বর্ণনাকারীদের সমালোচনা, সুন্নাহ সংরক্ষণ এবং দুর্বল বর্ণনাকারীদের অভিযুক্ত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন একদল ইমাম ও ফকীহ, তারা হলেন: সুফইয়ান ইবন সাঈদ আস-সাওরী (১৬১ হি.), মালেক ইবন আনাস (১৭৯ হি.), শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০ হি.), আব্দুর রহমান ইবন আমর আল-আওযা'ঈ (১৫৬ হি.), হাম্মাদ ইবন সালামাহ (১৬৭ হি.), লাইস ইবন সা'দ (১৭৫ হি.), হাম্মাদ ইবন যাইদ (১৭৯ হি.)-সহ আরো বেশ কয়েকজন। তবে এদের মাঝে সুন্নাহ নির্বাচনে সবচেয়ে সতর্ক ও অধ্যবসায়ী এমন তিনজন ছিলেন, যারা তাদের এই কাজে কোনো ভুলের সংমিশ্রণ ঘটাননি। তারা হলেন: মালেক, সাওরী ও শু'বাহ। এরপর এদের থেকে হাদীস অন্বেষণ, বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে অনুসন্ধান, দুর্বল বর্ণনাকারী নির্ণয় এবং বর্ণনার কারণ খোঁজ করার বিষয়টা একদল লোক গ্রহণ করেন। তারা হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১৮১ হি.), ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান (১৯৮ হি.), ওয়াকী' ইবনুর জার্‌রাহ (১৯৭ হি.), আব্দুর রহমান ইবন মাহদী (১৯৮ হি.), মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফেয়ী (২০৪ হি.) প্রমুখ। তবে এদের মাঝে মুহাদ্দিসদের কাজে সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং দুর্বল বর্ণনাকারীদের পরিত্যাগে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন দুজন, যারা এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেদের দীনদারিতা, পরহেজগারিতা ও সুন্নাহর ব্যাপারে গভীর জ্ঞান ধরে রেখেছিলেন। তারা দুজন হলেন: ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান ও আব্দুর রহমান ইবন মাহদী। এরপর একদল লোক এদের থেকে শেখেন হাদীস নির্বাচন এবং বর্ণনার বর্ণনাকারী বাছাই। তারা বিভিন্ন শহরে গিয়ে সুন্নাহ সংকলন করেন, নগরীতে-নগরীতে অনুসন্ধান চালিয়ে দুর্বল বর্ণনাকারীদের অভিযুক্ত করেন এবং নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেন। সবশেষে তারা আছার ও বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ইমামে পরিণত হন। তাদের মাঝে রয়েছেন: ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (২৪১ হি.), ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন (২৩৩ হি.), আলী ইবনুল মাদীনী (২৩৪ হি.), আবু বকর ইবন আবী শাইবাহ (২৩৫ হি.), ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানযালী (২৩৮ হি.), উবাইদুল্লাহ ইবন উমার আল-কাওয়ারীরী (২৩৫ হি.), যুহাইর ইবন হারব আবু খাইসামা (২৩৪ হি.)। তবে এদের মাঝে দীনদারিতায় সবচেয়ে পরহেজগার, দুর্বল বর্ণনাকারী

অন্বেষণে সবচেয়ে অগ্রসর এবং সর্বদা এই শাস্ত্রের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখা ব্যক্তি হলেন: আহমদ ইবন হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, আলী ইবনুল মাদীনী রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহিম আজমাঈন। এরপর এদের থেকে বর্ণনার সমালোচনা এবং বর্ণনাকারী নির্বাচনের কর্মপন্থা গ্রহণ করেন একদল লোক। তাদের মাঝে ছিলেন: মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আয-যুহালী (২৫৮ হি.), আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী (২৫৫ হি.), আবু যুর'আ উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দুল কারীম আর-রাযী (২৬৪ হি.), মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬ হি.), মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস (২৭৫ হি.) প্রমুখ। তারা মুখস্থে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বেশি বেশি লিখেছিলেন, অনেক ভ্রমণ করেছিলেন এবং সুন্নাহ সংরক্ষণে পরস্পর আলোচনা, বই রচনা ও পড়ালেখা করেছিলেন।'[২৮০]

এই বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, 'হাদীসের হাফেযরা পূর্ববর্তী স্তরের হাফেযদের ছাত্র। কোনো স্তরের ছাত্রের জন্য বড় আলেম হওয়া সম্ভব না যদি সে পূর্ববর্তী হাফেযদের কারো থেকে ইলম অর্জন না করে। **বর্ণনার প্রতিটি জাল[২৮১], হোক সেটা ইলমী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কিংবা নয়, আনুভূমিক নয়, ধারাবাহিক।**'[২৮২] হাফেযরা এই ধর্মীয়-সামাজিক কর্তৃত্ব তথা বর্ণনার ধারাবাহিকতা গ্রহণ করেন সাহাবীদের যুগ শেষ হওয়ার পর। তারা বর্ণনাকারীদের সরাসরি যাচাই এবং পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করেন। যেমন আমরা দেখতে পাই ইমাম শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০ হি.) একজন দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে সতর্ক করেন। বর্ণনাকারীদের জীবনী সংকলনের বইয়ে আমরা দেখি, শু'বাহ একদিন মসজিদে বর্ণনার দুটি মজলিস দেখে বলেন, 'মানুষদের দেখে অবাক হতে হয়! তারা সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদীকে (জাফর ইবনুয যুবাইর) কেন্দ্র করে একত্র হয়েছে আর সবচেয়ে বড় সত্যবাদীকে (ইমরান ইবন হুদাইর) ছেড়ে দিয়েছে।' ঘটনার বর্ণনাকারী

---

২৮০. ইবন হিব্বান, আল-মাজরূহীন (১/৩৮-৫৮)।

২৮১. জাল বলতে বোঝানো হয়েছে যে বর্ণনাগুলো জালের মত বিস্তৃত, শৃঙ্খলের মত নয়। এক ছাত্র বহু শিক্ষকের সাথে সংযুক্ত, একজন শিক্ষকের সাথে নয়। এভাবে পূর্ববর্তী স্তরের হাদীসের হাফেযদের সাথে পরবর্তী স্তরের হাদীসের হাফেযদের সম্পর্ক একটা জালের মত বিস্তার লাভ করেছে। [অনুবাদক]

২৮২. লেখকবৃন্দ, আত-তারীখুশ শাফাওয়ী, (১/১৩৮-১৩৯)।

ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম যার নাম ইয়াযীদ ইবন হারুন। তিনি বলেন, 'স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম ভীড়ে থাকা লোকজন জাফরকে ছেড়ে ইমরানের কাছে সবাই চলে গিয়েছে। জাফরের কাছে আর কেউ নেই।'[২৮৩] শু'বাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যাচারকারীদের মুখোশ উন্মোচনে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি তার সঙ্গীদের বলতেন, 'চলো, আমরা আল্লাহর জন্য গীবত করি।'[২৮৪] এমনকি চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তিনি 'মানুষের কাছে গিয়ে বলতেন, তুমি হাদীস বর্ণনা করবে না; করলে তোমার বিরুদ্ধে শাসককে লেলিয়ে দিব।'[২৮৫] প্রকাশ্যে গীবত করার মাধ্যমে সমাজে হক-বাতিলের মিশ্রণ তিনি রোধ করেছিলেন।

ইমাম মুসলিম তার সহীহ বইয়ের ভূমিকায় বর্ণনাকারীদের সমালোচনার প্রসঙ্গে বলেন, 'তারা নিজেদের উপর হাদীসের বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি উদঘাটন আবশ্যক করে নেয় এবং এই বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ফতোয়া দেয়। কারণ দীনী বিবিধ বিষয়ের বর্ণনাগুলো কোনো কিছু হালাল-হারাম বলে, আদেশ-নিষেধ বলে গণ্য করে এবং উৎসাহিত-নিরুৎসাহিত করে থাকে। এমন অবস্থায় বর্ণনাকারী যদি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত না হয়, তারপর তার থেকে এমন কেউ বর্ণনা করতে শুরু করে যে তাকে চিনে, কিন্তু তার মাঝে বিদ্যমান সমস্যা জানে না এমন কারো কাছে যদি সে বিষয়টা না জানায়, তাহলে উক্ত কাজের জন্য সে পাপী হবে এবং আম মুসলিমদের সাথে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত হবে। কারণ যারা এই বর্ণনাগুলো শুনেছে, তাদের কেউ কেউ এগুলো বা এগুলোর কিছু অংশ ব্যবহার করে বসবে।' এভাবেই ইসলামের প্রথম যুগ থেকে লিখনীর যুগ পর্যন্ত ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে পণ্ডিত লোকজন বর্ণনাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করে গিয়েছেন, শক্তিশালী ও দুর্বলদের অবস্থা জানিয়েছেন। জারহ-তা'দীল শাস্ত্রের পূর্ণতা এভাবে এসেছে। বর্ণনাকারী এবং তাদের ব্যাপারে সমালোচকদের মন্তব্য নিয়ে বিরাট বই রচিত হয়েছে। এমনকি মিথ্যুকরা কোনোভাবেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে মিশে যেতে পারত না। আবার দুর্বল বর্ণনাকারীদের নিয়ে স্বতন্ত্র অভিধান রচিত হয়েছে। ফলে হাদীসশাস্ত্রবিদদের

---

২৮৩. ইবন আবী হাতেম, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল (২/৪৭৯)।

২৮৪. আল-কিফায়াহ ফী-ইলমির রিওয়ায়াহ (পৃ. ৪৫)।

২৮৫. আল-জামে' লি-আখলাকির-রাওয়ী ওয়া-আদাবিস সামি' (২/১৭০)।

জন্য প্রতি যুগে দুর্বল থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা আলাদা করা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে।[২৮৬]

প্রাচীন সমাজগুলোতে বর্ণনাকারীদের উঁচু সামাজিক মর্যাদা ছিল। ফলে তারা সবসময় জনগণের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। 'মৌখিক বিবরণের ধারাবাহিক জালে তারাই ছিল শক্তি'। কারণ 'পরবর্তী সময়ে একটা ঘটনাকে তৈরি করা এমন বহু বর্ণনার উপর নির্ভর করে যেগুলো প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা প্রদান করবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ছাড়া সে রকম কর্তৃত্ব অর্জন সম্ভব না।'[২৮৭]

এখানে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, বর্ণনাকারীর ব্যাপারে 'ন্যায়পরায়ণতা'র যে শর্ত দেওয়া হয় সেটা নিছক ধর্মীয় ধারণা নয়। অর্থাৎ এটা এমন ধারণা নয় যেটা কেবল একজন মুসলিম স্বীকার করে। বরং এটা নৃতাত্ত্বিক ধারণাও বটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মন্টেগোমারি ওয়াট এই প্রাচ্যবিদদের প্রাচীন অভিযোগ উপস্থাপন করেন যায় মূল বক্তব্য হলো— 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরের কোনো উৎস থেকে ওহী গ্রহণ করেননি। বরং নিজ থেকে আয়াত রচনা করে মানুষের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, তারা প্রতারিত হয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে।' তারপর তিনি এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। তার প্রত্যাখ্যানের অর্থ এটা নয় যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তে বিশ্বাস রাখতেন। বরং এই ঠুনকো অভিযোগ বহু প্রাচ্যবিদ প্রত্যাখ্যান করেছে, কেননা এটা 'অযৌক্তিক। এটা আমাদের কাছে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা দেয় না কেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কী জীবনে সব ধরনের বঞ্চনা সয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন? কেন তিনি সচ্চরিত্রের বুদ্ধিমান মানুষগুলোর সম্মান অর্জন করেছিলেন? এছাড়া আমরা বুঝতে পারি না কীভাবে তিনি এক বৈশ্বিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন যেটা স্পষ্টভাবে বহু পবিত্র মানুষের জন্ম দিয়েছে। এ সব কিছু যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা কেবল তখনই সম্ভব, যখন আমরা মুহাম্মাদের সত্যতা অনুমিত ধরে নিই। অর্থাৎ আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, তিনি আসলেই দৃঢ় বিশ্বাস

---

২৮৬. মুহাম্মাদ আজ্জাজ আল-খত্বীব, আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদওয়ীন, দারুল-ফিকর লিত-ত্বিবায়াহ, বৈরূত, পৃ. ২৩৭-২৩৮।

২৮৭. লেখকবৃন্দ, আত-তারীখ আশ-শাফাওয়ী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪০।

রাখতেন এই কুরআন তার কল্পনার ফলাফল না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর অবতীর্ণ সবকিছু হক।'[২৮৮]

এই ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক খণ্ডন দিয়েই আমরা 'ন্যায়পরায়ণতা'র (আদালত) 'পার্থিব' দিকটা বুঝতে পারি। মুহাদ্দিসদের কষ্টকর ভ্রমণের কথা পশ্চিমারাও স্বীকার করে। আর এ সকল ভ্রমণের পক্ষে একটাই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, সেটা হলো তারা ধর্মীয় তাড়নার জায়গা থেকে তারা এই যাত্রা করেছিলেন। সুতরাং এর উপর নির্ভর করাটা জ্ঞানগত দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নির্ভরতা, যেহেতু এটা (নির্ভরতা) নির্দিষ্ট একটা কাজের সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ বোঝার লক্ষ্যে।

চূড়ান্ত সূক্ষ্মতা নিয়ে হাদীসশাস্ত্রের এমন উত্থান অভূতপূর্ব এবং ব্যতিক্রমী ঘটনা। আমরা যদি বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে গিয়ে ইতিহাসের সমালোচনার দিকে তাকাই, তাহলে ইসলামের আগে 'আমরা জাহেলী যুগে অনেক খুঁজলেও ইতিহাস লিখে রাখার কোনো নমুনা পাব না। এমনকি যে সকল জাতিকে আমরা উন্নত ও সভ্য মনে করতাম এবং ধারণা করতাম তারা তাদের উন্নতির ইতিহাস লিখে রেখেছিল, যেমন: ইয়েমেন, হীরা, গাস্‌সান, এদের কারো ইতিহাসের কোনো বিবরণী আমাদের কাছে পৌঁছেনি।'[২৮৯]

পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি সাধারণত মানুষজন ভুলে যায়। সময়ের পরিক্রমায় সমাজের প্রভাবশালী লোকদের প্রয়োগে গিয়ে বিকৃতির শিকার হয়। আমরা যদি মধ্যযুগে মুসলিম এবং ইউরোপীয়দের ইতিহাস রচনার তুলনা করি, তাহলে দেখতে পাব ইউরোপে যে সময়টাতে ইতিহাস রচনার উপর ধর্মীয় বা ঐশ্বরিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, 'ঠিক সে সময় ইসলামী ও আরব সভ্যতায় জ্ঞানের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। মুসলিম চিন্তাবিদরা চিন্তার পদ্ধতি ও উপকরণে ব্যাপক উন্নতি সাধন করে। মানবীয় বিদ্যাসমূহেরও অগ্রগতি সাধিত হয়। যদিও সেগুলো পবিত্র ধর্মীয় টেক্সটের উপর ভিত্তি করে বেড়ে ওঠা সভ্যতা। ইসলামী বিশ্বে সর্বপ্রথম ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু

২৮৮. মন্টেগোমারি ওয়াট, মুহাম্মাদ ফিল-মাদীনাহ, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরূত, অনুবাদ: শা'বান বারাকাত, পৃ. ৪৯৫।

২৮৯. হুসাইন নাস্‌সার, নাশআতুত তাদওয়ীনিত তারীখি ইন্দাল আরাব, মানশূরাত ইকরা, ১৯৮০, পৃ. ১১।

হয় কুরআন কারীম এবং পবিত্র সুন্নাহ এই দুই উৎস লেখার মাধ্যমে। সুন্নাহ সংকলনের ক্ষেত্রে সংকলন ও ইতিহাস রচয়িতারা জারহ-তা'দীল নামক শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণের পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন। আর এই পদ্ধতি চূড়ান্ত সূক্ষতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।'[২৯০]

(২) মালেক ও পূর্ববর্তীদের অনুকরণের অগ্রাধিকার, অতঃপর শাফেয়ী ও মৌখিক ইতিহাসের অগ্রাধিকার:

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সুন্নাহ যে ওহী তা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ছিল। কারণ সেটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বে বিদ্যমান শরীয়ত প্রণয়নের দিকটির প্রতিনিধিত্ব করত। এই সুন্নাহ সাহাবী-তাবেয়ী প্রজন্ম পেরিয়ে ইমাম মালেকসহ বড় লেখকদের প্রজন্ম অতিক্রম করে ইমাম শাফেয়ীতে এসে পৌঁছায়। যাহাবী বলেন, '১৪৩ হিজরী সনে এ যুগের আলেমরা হাদীস, ফিকহ ও তাফসীর লিখনীর কাজ শুরু করেন। ইবন জুরাইজ মক্কায়, মালেক মদীনায় মুয়াত্তা, আওযা'ঈ শামে, ইবন আবী 'আরূবা ও হাম্মাদ ইবন সালামাহ প্রমুখ বসরায়, মা'মার ইয়েমেনে, সুফিয়ান সাওরী কুফায় গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন ইসহাক মাগাযী তথা যুদ্ধের বিবরণ আর আবু হানীফা ফিকহ ও রায়ের উপর লেখেন। এর কিছু সময় পরে হুশাইম, লাইস, ইবন লাহী'আ, ইবনুল মুবারক, আবু ইউসুফ, ইবন ওয়াহ্‌ব বই লেখেন। এরপর জ্ঞান লিপিবদ্ধ ও অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হতে থাকে। আরবী, ভাষা, ইতিহাস ও যুদ্ধের বিবরণের উপর বই রচিত হয়।'[২৯১] কিন্তু তার অর্থ কি ইমাম মালেক আর ইমাম শাফেয়ীর কর্মপদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য নেই? মৌলিকভাবে তাদের মাঝে পার্থক্য আছে। কিন্তু সেটা সুন্নাহকে ওহী বা প্রমাণ হিসেবে মেনে নেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত না যেমনটা শাখ্‌ত দাবি করেছেন, অথবা কুলসন যেমনটা বলেছেন, 'প্রথম বারের মত শাফেয়ী একটা চিন্তার উপর জোর দেন। চিন্তাটা আগে অনেকের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট ছিল। সেটা হলো নবীজীর শরয়ী বিধি-বিধান আল্লাহ প্রদত্ত ওহী।'[২৯২]

২৯০. আব্দুল হালীম মাহ্‌বাশা, ফালসাফাতুত তারীখ, পৃ. ২৬।
২৯১. আস-সুয়ূত্বী, তারীখুল খুলাফা (৪১৬-৪১৭)।
২৯২. কুলসন, ফী তারীখিত তাশরী'ইল ইসলামী, পৃ. ৮৩।

এছাড়াও কুলসন বলেন, 'তবে শাফেয়ীর মাহাত্ম্য নতুন ধারণা প্রদানের মাঝে সীমিত না। বরং তিনি প্রতিষ্ঠিত চিন্তার সাথে নিজের চিন্তাকে মিলিয়ে উভয়ের মাঝে ভারসাম্য করে উসূলুল ফিকহের এক পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি উপস্থাপন করেন, যেমনটা আগে কখনো ঘটেনি।'[২৯৩] পরের বক্তব্যটা সঠিক, আর প্রথম বক্তব্যটা শাখ্‌তের এঁকে দেওয়া গণ্ডির প্রতি আনুগত্য টিকিয়ে রাখা ছাড়া ভিন্ন কিছু বোঝায় না। মালেক আর শাফেয়ীর পদ্ধতিগত পার্থক্য আগে থেকেই ছিল। কিন্তু একটা পরিবর্তনমূলক স্তরের কারণে এটার নবায়ন হয়। সেটা হলো জীবন্ত মৌখিক বক্তব্যের অনুসরণের যুগের সমাপ্তি টেনে নির্ভরযোগ্য মৌখিক বর্ণনার সূচনা। আমরা নিচে এটাই ব্যাখ্যা করব।

ইমাম মালেক একজন বড় মাপের তাবে-তাবেয়ী। নবুওয়তের যুগের কাছাকাছি সময়ে থাকার কারণে তিনি মদীনাবাসী তাবেয়ীদের কথা ও কাজ থেকে জীবন্ত সুন্নাহর সংস্পর্শ লাভ করতে সক্ষম হন। 'মদীনার ফকীহদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন, যে বিষয়ের উপর আমল চলে আসছে, সেটা নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও অভিজ্ঞতার যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক স্থায়িত্ব নির্দেশ করে। এখান থেকেই তারা বিষয়টার বৈধতা সাব্যস্ত করে। মদীনাবাসীর এমন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রচলিত হাদীসগুলো যদি চলে আসা আমলকে জোরদার করে, তাহলে সেটাকে সবচেয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখলে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বলে গণ্য করতে হবে। আর যদি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে নবীজীর অভিজ্ঞতার সাথে না মেলা পর্যন্ত মিথ্যা বলে গণ্য হবে, যে অভিজ্ঞতাকে মদীনাবাসী তাদের আমলের মাধ্যমে জীবিত রেখেছে।'[২৯৪] এমন দৃষ্টিভঙ্গি যৌক্তিক; কেননা 'যে লক্ষ্যে হাদীস সংকলন করা হয়েছে, বা যে লক্ষ্যে ইসলামী জ্ঞান অগ্রসর হয়, সেটা হলো একজন ব্যক্তি তার বিবিধ অবস্থায় কী কী করবে সেটা জানা। অন্যভাবে বললে, এর উদ্দেশ্য থাকে নির্দিষ্ট ও বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং নব-উদ্ভূত অবস্থায় ওহী হিসেবে প্রাপ্ত শরীয়ত বাস্তবায়নের পদ্ধতি জানা। শরীয়ত কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেটার জন্য হাদীসকে একমাত্র উপকরণ হিসেবে ধরে নিতে হবে এমন কোনো আবশ্যকতা নেই। মুসলিম সমাজে প্রচলিত উরফ বা প্রথাও দলীলে পরিণত

---

২৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

২৯৪. হাল্লাক, নাশআতুল ফিকহিল ইসলামী ওয়া-তাতাউরুহু, পৃ. ১৫৫।

হতে পারে যেটার শক্তিমত্তা স্বল্প সংখ্যক সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসের চাইতে শক্তিশালী হবে।'[২৯৫] নৃতাত্ত্বিকদের ভাষায় এই স্তরের নাম 'মৌখিক বর্ণনার অনুকরণ'। এগুলো মূলত এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মুখে মুখে স্থানান্তরিত হওয়া চিন্তাসমূহ (সাময়িকভাবে পাঠককে অনুরোধ করব তিনি যেন মেনে নেন যে, প্রথম শতাব্দীতে কেবল মৌখিকভাবে হয়েছে, আমরা লিখনীর সংজ্ঞায়নে গিয়ে এটার খণ্ডন করব)। এই মৌখিক বর্ণনার অনুকরণ মূলত জীবন্ত বিষয় অনুসরণের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে শাফেয়ী যেহেতু কালের বিবেচনায় জীবন্ত নমুনা অনুসরণের দিক থেকে মালেকের পরে ছিলেন, অধিকন্তু তার সময়ে হাদীস গ্রন্থগুলো দেখা গিয়েছিল আর হাদীসের সমালোচনার ধারাও পূর্ণতা লাভ করেছিল, সেহেতু শাফেয়ী মৌখিক বর্ণনাকে এমন আমলের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন যেটা তার দৃষ্টিতে যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিক ছিল না। মৌখিক বর্ণনার ইতিহাসের চাইতে মৌখিক জীবন্ত অনুকরণের ভিন্নতার জায়গা হলো মৌখিক বর্ণনার ইতিহাস ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দিয়েছে। যে বর্ণনাকারী থেকে শাফেয়ী বা অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ শুনছেন, তিনি তার উপরের বর্ণনাকারীর থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সরাসরি শুনছেন। এভাবে বর্ণনা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর মৌখিক বর্ণনার অনুকরণ হলো জীবন্ত সুন্নাহর সাথে জীবনযাপন, যেখানে সুন্নাহ হিসেবে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ফকীহদের কর্মেরও ভূমিকা থাকবে। কারণ তাদের কাজগুলো পূর্ববর্তীদের থেকে প্রাপ্ত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাদের মাত্র দুই প্রজন্মের ব্যবধান। ইমাম মালেক এবং তার পূর্ববর্তী মদীনার ইমামরা মাদানী আমল ও সহীহ বর্ণনার মাঝে তুলনা করেন। 'শাফেয়ী নিছক সুন্নাহর দলীলকে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মালেক গবেষণা চালিয়ে যাচাই-বাছাই করে তুলনার মাধ্যমে কোনো দলীল গ্রহণ করেন; এমনকি যদি তিনি ঐ দলীল নিজে বর্ণনা করে থাকেন এবং মুয়াত্তা বইয়ে লিখে থাকেন।'[২৯৬] অন্যভাবে বললে, **শাফেয়ী প্রথমেই নির্ভর করেছেন জীবন্ত স্মৃতির সংরক্ষিত আর্কাইভের উপর, অন্যদিকে মালেক প্রথমেই নির্ভর করেছেন যাপিত জীবন্ত স্মৃতির উপর**। এখানে দুটি কর্মপদ্ধতির মাঝে তুলনা

২৯৫. ওয়ালব্রিজ, আল্লাহ ওয়াল-মানত্বেক ফিল-ইসলাম, পৃ. ৮০।

২৯৬. মুহাম্মাদ আবু যাহরা, মালেক: হায়াতুহু ওয়া-আসরুহু ওয়া-আরাউহুল ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ৩৪২।

করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ তুলনার জন্য বিশেষজ্ঞরা আছেন। আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হলো:

(১) মালেক ও শাফেয়ীর যে মতভেদ, সেটা সুন্নাহর সংজ্ঞায়নে নয়, বরং সুন্নাহ কীসের দিকে নির্দেশ করে সেটার ব্যাপারে। শাফেয়ীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিস-ফকীহদের কাছে সুন্নাহ প্রথমেই সহীহ হাদীসকে বুঝায়। তাই তারা সহীহ হাদীস দিয়েই সুন্নাহকে বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে মালেকের কাছে সুন্নাহ প্রথমেই আমলকে বুঝায়। তাই সুন্নাহ এখানে সহীহ হাদীস থেকে ব্যাপক। এই বিষয়ের আলোকেই আমরা সুন্নাহ ও হাদীসকে পৃথকভাবে দেখা প্রাচীন বক্তব্যগুলো বুঝব।

(২) মালেক ও শাফেয়ীর মাঝে মতভেদ নতুন নয়। মালেকের জন্মের আগেও এটা ছিল। ইমাম আহমদ সহীহ সনদে ইবন আবী মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উরওয়া একবার ইবন আব্বাসকে বললেন, 'ইবন আব্বাস, আর কত আপনি মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন?' ইবন আব্বাস বললেন, 'কী হলো উরওয়াহ?' উরওয়া বললেন, 'আপনি আমাদেরকে হজ্জের মাসে উমরাহ করতে নির্দেশ দেন, অথচ আবু বকর-উমার এটা করতে নিষেধ করেছেন।' ইবন আব্বাস বললেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং করেছেন।' উরওয়াহ বললেন, 'তারা দুজন আপনার চাইতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি অনুসরণ করতেন, তার ব্যাপারে তারা আপনার চাইতে বেশি জানতেন।'[২৯৭]

তাই 'জোসেফ শাখ্ত বা অন্যরা যখন দাবি করেছে যে, শাফেয়ী ইসলামী ফিকহকে পরিপক্বতার স্তরে নিয়ে এসেছে, তখন তারা স্পষ্ট ভুল বলেছে। কারণ এই প্রক্রিয়ায় যত ফকীহ ভূমিকা রেখেছেন, তিনি তাদের একজন ছিলেন মাত্র।'[২৯৮] ফকীহরা সকলে কুরআন-সুন্নাহকে গ্রহণ করতেন। তারা

---

২৯৭. মুসনাদ আহমদ (২২৭৭)।

২৯৮. হাল্লাক, নাশআতুল ফিকহিল ইসলামী ওয়া-তাতাউরুহু, পৃ. ১৬৯।
বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আমাদের মতের সাথে সামঞ্জস্যশীল মত জানতে পড়ুন, N. Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, ১৯৯৩).

দলীলের বিবেচনায় দুইটাকে ভিন্নভাবে দেখতেন না। 'শাফেয়ীর আগে বা পরে কোনো মুসলিম কল্পনাও করেনি যে, সাহাবী বা তৎপরবর্তীদের আমল অথবা জামা'আতের আমল তথা উরফ (প্রথা) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধকৃত সুন্নাহর সমকক্ষ। আর নবীজীর সুন্নাহকে সাহাবীদের সম্মিলিত আমলের বা একক আমলের চাইতে নিচের স্তরে ভাবা তো বহু দূরের বিষয়। সর্বোচ্চ যেটা ঘটেছে সেটা হলো কিছু ফকীহ সুন্নাহর নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিছু মাপকাঠি নির্ধারণ করেছিলেন, যেগুলোর কারণে ইমাম শাফেয়ী তাদেরকে সুন্নাহ পরিত্যাগ করা এবং সনদের বিবেচনায় সহীহ না বলার দায়ে অভিযুক্ত করেন। শাফেয়ী এর মাধ্যমে নতুন কিছু বলেননি। বরং তার আগে-পরে অনেক মুহাদ্দিস ছিলেন যারা এই মাপকাঠিগুলো পরিত্যাগ করে কেবল সনদের বিশুদ্ধতার মাঝে সীমিত থাকতে বলতেন, বিপরীত মতাদর্শীদেরকে সুন্নাহ পরিত্যাগ ও এর থেকে দূরে সরে যাওয়ার দোষে দুষ্ট বলতেন। এই অভিযোগ শুনে প্রতিপক্ষ হতচকিত হয়ে যেত। তারা এর থেকে নিজেদের মুক্ত দাবি করতে জোর প্রচেষ্টা চালাত। শাখ্‌ত বা তার অনুসারীরা যেমনটা দাবি করছে, তেমনটা যদি হয়ে থাকত, তাহলে তারা তো এসব অভিযোগের কোনো পরোয়াই করত না। তাদের এবং সমাজের চোখে অভিযোগগুলো নিন্দনীয়ও হতো না; যদি নবীজীর সুন্নাহ গ্রহণ করাটা 'বিচ্ছিন্ন' (শায) মত-ই হয়ে থাকত।'[২৯৯]

এতদসত্ত্বেও হাদীসের বর্ণনাসমূহ কতটুকু সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করে সেটা নিয়ে ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর পদ্ধতির মাঝে আপেক্ষিক অবিচ্ছিন্নতা ছিল, বিচ্ছিন্নতা ছিল না। মুরসাল বর্ণনার ক্ষেত্রে এসে এটা স্পষ্ট দেখা যায়। মুরসাল হাদীসের বিষয়টাই 'জীবন্ত ঐতিহ্যের অনুকরণ' (যেখানে মুরসাল এবং সনদ ছাড়াই কারো থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা দিয়ে অনেক সময় দলীল পেশ করা হয়)-এর ধারা এবং মৌখিক নিয়মতান্ত্রিক বর্ণনার ধারাকে পৃথক করে। কিছু ইমামের বক্তব্য অনুযায়ী মুরসাল হাদীসের সাথে আচরণের পদ্ধতিতে ইমাম শাফেয়ীর সাথে তার পূর্ববর্তীদের পদ্ধতির পূর্ণ বৈপরিত্য বা বিচ্ছিন্নতা ছিল: যেমনটা আবু দাউদ তার 'রিসালাহ লি-আহলি মাক্কাহ'-তে বলেন— 'মুরসাল হাদীস দিয়ে পূর্ববর্তী আলেমরা দলীল দিতেন, যেমন: সুফিয়ান

২৯৯. রিফ'আত ফাওযী আব্দুল মুত্তালিব, তাওসিকুস-সুন্নাহ ফিল-কারনিস সানী আল-হিজরী: উসুসুহু ওয়া-ইত্তিজাহাতুহু, মাকতাবাতুল খানানজী, মিশর, পৃ. ১৬।

সাওরী, মালেক ইবন আনাস, আওযাঈ; অবশেষে শাফেয়ী এসে মুরসাল বর্ণনার ব্যাপারে কথা বললেন'। তবে সে সকল ইমামের বক্তব্যে উত্থাপিত বিচ্ছিন্নতার এই দাবি সূক্ষ্ম নয়। শাফেয়ী সহীহ সনদে বর্ণিত মুরসালকে প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং কিছু নির্দিষ্ট শর্ত তাতে জুড়ে দিয়েছেন। যেমন- অন্য কোনো সূত্র থেকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হবে, মুরসালের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল এমন সাহাবীর কথা বা কাজ থাকতে হবে, মুরসাল অনুযায়ী অধিকাংশ আলেম ফতোয়া দিবে প্রভৃতি।[৩০০] অবিচ্ছিন্নতা বুঝায় এমন আরো একটা বিষয় হলো ইমাম শাফেয়ী ইজমাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইজমাকে দলীল হিসেবে মানার ক্ষেত্রে তার যুক্তি আর মালেকের মদীনাবাসীর আমলকে দলীল হিসেবে মানার যুক্তি একই। যুক্তিটা হলো বিভিন্ন শহরে একটা ফিকহী ঐতিহ্য প্রচলিত থাকলে সেটা 'সুন্নাহ' হওয়ার পক্ষে জোর প্রমাণ। এমনকি শাফেয়ী যখন বললেন: আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহগুলো আম মুসলিমদের জীবন থেকে উঠে যেতে পারে না, তখন তার বক্তব্যের উপর মন্তব্য করে নসর হামেদ আবু যাইদ দাবি করল, 'তার এই বক্তব্যে সে তার উস্তায ইমাম মালেকের যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেছে, যে যুক্তি ইমাম মালেক মদীনাবাসীর আমলকে ফিকহের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পেশ করেছিলেন।' ইজমা এবং মুসনাদ হাদীসের মাঝে পার্থক্য হলো 'ইজমা সরাসরি শ্রুত নয় এমন বিবরণ, এটা শ্রুত বিবরণের চাইতে দালীলিক বিবেচনায় কোনো অংশে কম না।'[৩০১] শাফেয়ী যদি মুসলিমদের মাঝে সুন্নাহর নতুন ভিত স্থাপনকারী ফকীহ হতেন কিংবা অস্পষ্টতার পর নতুনভাবে স্পষ্টতা প্রদানকারী হতেন (যেমনটা প্রাচ্যবিদরা বলে) তাহলে আমরা এই আপেক্ষিক অবিচ্ছিন্নতা পেতাম না, বরং পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাই পেতাম।

(৩) শাফেয়ীর সাথে তার প্রতিপক্ষের মতবিরোধের বিষয় কি সুন্নাহর প্রামাণ্যতা ছিল?

৩০০. আর-রিসালাহ (পৃ. ৪৬১-৪৬৫)।

৩০১. নসর হামেদ আবু যাইদ, আল-ইমাম আশ-শাফেয়ী ওয়া তাসীসুল আইদিউলুজিয়্যা আল-ওয়াসাত্বিয়্যাহ, মাকতাবাতু মাদবুলী, ১৯৯৬, পৃ. ১২২।

আমরা প্রমাণ করেছি যে, জীবনাচরণের মাপকাঠি হিসেবে নববী সুন্নাহর ধারণা সাহাবী-তাবেয়ীদের মাঝে ছিল। এখানে আমরা প্রমাণ করব যে, এই ধারণা শাফেয়ীর সময়কাল পর্যন্ত চলমান ছিল। অর্থাৎ সুন্নাহর ব্যাপারে শাখ্‌তের ধারণার বাকি অংশ এখানে খণ্ডন করব। শাখ্‌তের দাবি অনুযায়ী শাফেয়ীর যুগে সুন্নাহকে প্রমাণ হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রাচ্যবিদদের গবেষণার সারকথা হলো শাফেয়ী সুন্নাহ অস্বীকারকারী মুতাযিলাদের সমালোচনা করতেন। আমি আমাদের ইমামদের কোনো বইয়ে সুন্নাহকে ঐশী উৎস হিসেবে মেনে নেওয়ার বিষয়টা অস্বীকার করার মতো কিছু দেখিনি। শাফেয়ীর বই পড়ে 'মুতাযিলা সম্প্রদায় সুন্নাহ অস্বীকার করত' এমন ধারণা দিতে সর্বপ্রথম দেখেছি শাইখ মুহাম্মাদ আল-খুদ্বারী (১৯২৭ খ্রি.)-কে। তিনি তার বই 'তারীখুত তাশরী'ইল ইসলামী'তে বলেন, 'শাফেয়ী আমাদের কাছে স্পষ্ট করেননি কারা এই মত অনুসরণ করত। ইতিহাস থেকেও আমরা সেটা জানতে পারি না। তবে শাফেয়ী পরবর্তী মতের (বিশেষ ব্যক্তিদের থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যানের মতো) অনুসারীদের সাথে তর্ক করতে গিয়ে স্পষ্ট বলেছেন যে, এই মতের (সকল বর্ণনা প্রত্যাখ্যানের মতো) অনুসারীরা বসরার অধিবাসী। আর বসরা সে সময় কালামী মতাদর্শের কেন্দ্র ছিল। এখান থেকে মুতাযিলাদের উত্থান ঘটে। এখানে মুতাযিলাদের বড় ব্যক্তিবর্গ এবং বই রচিত হয়। তারা আহলুল হাদীসের বিরোধিতা করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত এই মতের অনুসারী তাদের কেউ হবে। আমার কাছে বিষয়টা আরো শক্তিশালী হলো যখন আমি আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন কুতাইবাহর 'তাওয়ীলু মুখতালাফিল হাদীস' বইটি পড়লাম। তিনি সেখানে সুন্নাহর ব্যাপারে মুতাযিলা শাইখ ও তাদের বড় মুফতীদের অবস্থান আর সাহাবীদের ব্যাপারে তাদের নিন্দাবাদ উপস্থাপন করেছেন।'[৩০২] খুদ্বারী এখান থেকে উদঘাটন করেন যে, শাফেয়ীর যুগে বা তার কিছু সময় আগে আহলুস সুন্নাহর উপর কালামবিদরা আক্রমণ করত। অধিকাংশ কালামবিদ বসরায় ছিলেন। সুতরাং শাফেয়ীর সাথে যারা তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন, তারা নিশ্চয় কালামবিদ।[৩০৩] কিন্তু শাফেয়ীর বই বা তিনি যাদের খণ্ডন করেছেন তাদের কারো বক্তব্য থেকে এমনটা জানা যায়

৩০২. আল-খুদ্বারী, তারীখুত তাশরী'ইল ইসলামী (পৃ. ১৯৭)। মূল সূত্র: মুস্তফা সিবা'ঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া-মাকানাতুহা ফিত-তাশরী'ইল ইসলামী (পৃ. ১৭১)।

৩০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

না যে, তারা সুন্নাহকে প্রমাণ হিসেবে মানার বিষয়টা অস্বীকার করত। অর্থাৎ এটাকে ঐশী মাপকাঠি হিসেবে মেনে নিতে তাদের কোনো আপত্তি ছিল। বরং তাদের আপত্তি ছিল যে, 'কুরআনের মতো করে সমগ্র সুন্নাহকে প্রমাণ করা সম্ভব না।' যিনি সুন্নাহ অস্বীকার করেন তিনি 'খবরে ওয়াহেদ এবং (খবরে) মুতাওয়াত্তির প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ এই দুটির কোনোটিই তার দৃষ্টিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত না।' সুতরাং প্রত্যাখ্যানের কারণ 'ভুল-ত্রুটি ও বর্ণনাকারীদের মিথ্যা বলার সম্ভাবনা; যদিও তাদের সংখ্যা তাওয়াতুরের পর্যায়ে যায়। ... সুন্নাহকে প্রমাণ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে না; তাই এই প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি যদি নবীজীর যুগে থাকতেন, তার কথা শুনতেন এবং তার কাজকর্ম দেখতেন, তাহলে প্রত্যাখ্যান করতেন না, বরং এই সুন্নাহ দিয়ে দলীল দিতেন।'[৩০৪] অন্যভাবে বললে, 'মতভেদের জায়গা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাসমূহের উপর আমল করার আবশ্যকতা; আর সেটা বর্ণনাগত বিশুদ্ধতার বিবেচনায়, সুন্নাহ হিসেবে নয়।'[৩০৫] খুদ্বারী (এবং শাখ্‌ত) শাফেয়ীর বক্তব্যকে যেভাবে পাঠ করেছেন, উপর্যুক্ত আলোচনা হলো আব্দুল গনী আব্দুল খালেক কর্তৃক সেই পাঠের সূক্ষ্ম সমালোচনার মূল বক্তব্য। শাফেয়ী সুন্নাহকে প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কুরআনের যে সকল আয়াত ব্যবহার করেছেন, সেগুলো আব্দুল গনী আব্দুল খালেকের মতে গবেষণার ভূমিকা ছিল, প্রতিপক্ষকে বোঝানোর লক্ষ্যে সুন্নাহকে প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আয়াতগুলো ব্যবহৃত হয়নি। তিনি শাফেয়ীর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণ করেন যে, শাফেয়ীর বিরোধী ব্যক্তি রাসূলের সুন্নাহকে ওহী হিসেবে মানতেন এবং সেটাকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করতেন। নাহলে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শাফেয়ীর উপস্থাপিত প্রমাণ যথাযথ হবে না।[৩০৬]

এটা মুতাযিলাদের রক্ষা করার জন্য বলা হচ্ছে না। বরং সাহাবীদের ব্যাপারে মুতাযিলাদের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীস গ্রহণের

---

৩০৪. আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ, দারুল ওয়াফা- আস-মা'হাদুল 'আলামী লিল-ফিকরিল ইসলামী, পৃ. ২৬০-২৬১।

৩০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩-২৬৪।

৩০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-২৭৭।

ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল। তবে তার মানে এই না যে, মুতাযিলারা সুন্নাহ অস্বীকার করত, যেমনটা প্রাচ্যবিদরা তুলে ধরার চেষ্টা করে। বরং তারা বর্ণনাসমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছিল, মুহাদ্দিসদের কর্মপদ্ধতি থেকে সরে গিয়েছিল। প্রাসঙ্গিক আলামত থাকলে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের বড় ব্যক্তিত্বদের যে বক্তব্যসমূহ আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেগুলো মুতাযিলাদের বাইরে অন্যান্য কালামবিদদের মতের চাইতে সত্যের বেশি কাছাকাছি। মুতাযিলারা যে সুন্নাহকে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করত, সেটার পক্ষে ঐ বক্তব্যগুলো প্রমাণ। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো 'সুন্নাহকে প্রমাণ হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানানো এবং ইসলাম শুধু কুরআনে সীমিত করে দেওয়ার বিষয়টা এমন কোনো মুসলিম বলতে পারে না, যিনি আল্লাহর দীন ও শরয়ী বিধান ঠিকভাবে জানেন। তার বক্তব্য বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। শরয়ী বিধি-বিধানের অধিকাংশ বিষয় সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে যত বিধি-বিধান আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো সংক্ষিপ্ত এবং সামগ্রিক মূলনীতি।'[৩০৭]

২. ইসলামপূর্ব যুগ থেকে প্রথম শতক পর্যন্ত লিখনীর ধারণা:

ক) 'বর্ণনার আদি ও স্বাভাবিক পদ্ধতি হলো মৌখিক বর্ণনা। এর মাধ্যমেই সকল সভ্যতায় ইতিহাস রচনা শুরু হয়। তন্মধ্যে একটি হলো আরব ইসলামী সভ্যতা।'[৩০৮] ইসলামের আগে আরবের লোকেরা কবিতা, বক্তৃতা, যুদ্ধের ইতিহাস, কীর্তি ও বংশধারা মুখস্থ করার ক্ষেত্রে লেখার উপর নির্ভর করেনি, বরং তারা স্মৃতির উপর নির্ভর করেছিল। তাদের মাঝে মুখস্থশক্তি প্রখর ছিল। খুব দ্রুত কোনো কিছু স্মৃতিতে ধারণ করার মাধ্যমে তারা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের মাঝে লেখার যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ ছিল না। কারণ মক্কার ব্যবসায়িক সমাজে লেখালেখি ও হিসাব-কিতাব জানার প্রয়োজন হত। কিন্তু লেখকের সংখ্যা সামান্য ছিল।[৩০৯] গ্রেগর শোলের বলেন,

৩০৭. সিবা'ঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া-মাকানাতুহা ফিত-তাশরী'ইল ইসলামী, পৃ. ১৬৫।

৩০৮. লেখকবৃন্দ, আত-তারীখুশ শাফাওয়ী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০।

৩০৯. আকরম দ্বিয়া উমরী, বুহূস ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, বিসাত্ব-বৈরূত, পৃ. ২২১।

'কুরআন ছিল যুগপৎভাবে ইসলাম ও আরবী সাহিত্যের প্রথম বই। তবে তার মানে এটা না যে, ইসলামী যুগের আগে লেখালেখি অজানা ছিল। সে সময় চুক্তিপত্র ও চিঠি আদানপ্রদানের মতো বিষয়ে লেখালেখি ব্যবহৃত হতো। এটা ইসলামপূর্ব যুগ তথা জাহেলী যুগ পর্যন্ত ছিল। নিঃসন্দেহে চুক্তিপত্রসহ অন্যান্য নথিপত্র ইসলামের সূচনার যুগেও ছিল। কুরআনও লেখকের মাধ্যমে ঋণপত্র লিখে রাখার তাগিদ দিয়েছে যেমনটা আমরা সূরা আল-বাকারাতে দেখি, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত পরস্পর ঋণের লেনদেন করো, তাহলে লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্য থেকে একজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্য যেন লিখে রাখে।" [আয়াত: ২৮২] যেহেতু এমন উপলক্ষে লেখালেখি করা হতো, সেহেতু আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, ইসলামের উত্থানের এক-দুই প্রজন্ম আগ থেকে লিখিত নথিপত্রের বিষয়টা ছিল। অন্তত্পক্ষে সভ্যতার কেন্দ্র মক্কা-মদীনার মতো জায়গায়।'[৩১০] আমরা এখানে দাবি করছি না যে, আরবের লোকেরা সকল জাতির মধ্যে মুখস্থে সবচেয়ে পারদর্শী। আমরা এটাও দাবি করছি না যে, লেখালেখি সবার মাঝে বিস্তৃত ছিল, যেমনটা কিছু গবেষক তুলে ধরার চেষ্টা করে। আমরা শুধু দুটি বিষয় প্রমাণ করার মাঝে নিজেদেরকে সীমিত রাখছি: **প্রথমত**, মৌখিক বর্ণনার সংস্কৃতি বিদ্যমান এমন সমাজে সীমিত পর্যায়ে লিখনীর অস্তিত্ব। **দ্বিতীয়ত**, প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী স্বল্পসংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব। জর্জ সার্টনের যে বক্তব্য আমরা বইয়ের শুরুতে এনেছি সেটা আবার উল্লেখ করছি, 'যদিও আমাদের জন্য মৌখিক বর্ণনা বোঝা অনেকটাই কঠিন। কারণ আধুনিক যুগে এসে দীর্ঘ লম্বা কবিতা মুখস্থ করার সক্ষমতা মানুষজন প্রায় হারাতে বসেছে। প্রাচীন যুগে অনেক মানুষের মাঝে এই সক্ষমতা এমনভাবে ছিল যেটার পক্ষে আমাদের কাছে অসংখ্য প্রমাণ না থাকলে বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে যেত।' তবে এখানে আমরা বলব না যে, মুখস্থশক্তির অধিকারী এই মানুষগুলোর অস্তিত্বের কারণ জনমানুষের নিরক্ষরতা।

বিংশ শতাব্দীতে এসে সুন্নাহর ব্যাপারে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো নবীজীর সুন্নাহ লেখার বিষয়। মুহাম্মাদ তাওফীক সিদক্বী এই শতাব্দীর প্রথম

৩১০. লেখকবৃন্দ, আত-তারীখুশ শাফাওয়ী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯১-৯২।

দশকে তার 'আল-ইসলাম আল-কুরআনু ওয়াহদাহু' বইয়ে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মুসলিমরা একমত যে কুরআন শরীফের প্রতিটা অক্ষর অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কারণ এটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো বৃদ্ধি বা কমতি ছাড়াই বর্ণিত। তার নির্দেশে তারই সময়ে এটা লেখা হয়। অন্যদিকে নবীজীর হাদীসগুলোর কিছুই লেখা হয়নি। যা কিছু লেখা হয়েছে, সেগুলো তার মৃত্যুর বেশ কিছু সময় পরে লেখা হয়েছে। এই সময়টুকু যেকোনো ধরনের পরিবর্তন ও বিকৃতি হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমরা জানি যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিকূলকে লিখিত অবস্থায় এক কুরআন ছাড়া আর কিছু পৌঁছে দিতে চাননি, যে কুরআন আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে "নিশ্চয় আমরা স্মরণিকা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এটা সংরক্ষণ করব।" [সূরা আল-হিজর: ৯] যদি কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দীনে অত্যাবশ্যক হত, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা লিখে রাখতে বলতেন আর আল্লাহও সেটা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতেন। তখন কারো জন্য নিজের বুঝ অনুযায়ী বর্ণনা করা বৈধ হতো না।'[৩১১] এখানে আমরা দেখতে পাই সুন্নাহ লিখে রাখতে নিষেধ করার সাথে সর্বপ্রথম সুন্নাহকে প্রমাণ হিসেবে না মানার বিষয়টা সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এরপর উক্ত বিষয়ের পক্ষে বইয়ের পর বই আসতে থাকে। আমরা এর খণ্ডনে শুরুতে এ সংক্রান্ত সকল বিশুদ্ধ (আছার) বর্ণনা উল্লেখ করব।

(১) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত মারফূ' আছারসমূহ

যে সকল আছার দিয়ে লেখার নিষেধাজ্ঞার পক্ষে দলীল প্রদান করা হয়:

আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

৩১১. মাজাল্লাতুল মানার, ১৩২৪ হিজরীর রজব সংখ্যা।

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু লিখবে না। তোমাদের মাঝে কেউ যদি আমার কাছ থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখে থাকে, সে যেন সেটা মুছে ফেলে। আমার থেকে বর্ণনা করো, তাতে কোনো আপত্তি নেই। যে আমার নামে মিথ্যাচার করবে – হুমাম বলেন, সম্ভবত তিনি বলেছেন ইচ্ছাকৃত – সে যেন জাহান্নামে নিজের আবাস বানিয়ে নেয়।"[৩১২]

মুত্তালিব ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হানৃতাব বলেন, যাইদ ইবন সাবিত একবার মুয়াবিয়ার কাছে গেলে মুয়াবিয়া তাকে একটা হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। যাইদ হাদীসটা বলতে গেলে মুয়াবিয়া একজন মানুষকে সেটা লিখে রাখার নির্দেশ দিলেন। যাইদ তাকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তার কোনো হাদীস আমরা না লিখি।' মুয়াবিয়া তখন হাদীসটা মুছে ফেললেন। খত্বীব বাগদাদী এ ঘটনা বর্ণনা করেন তার 'তাক্বঈদুল ইলম' বইয়ে কাসীর ইবন যাইদ থেকে, তিনি মুত্তালিবের সূত্রে বর্ণনা করেন। শাইখ মুয়াল্লিমী ইয়ামানী বলেন, কাসীর শক্তিশালী নয়। আর মুত্তালিব যাইদের সাক্ষাৎ পাননি।

আবু হুরাইরা বলেন, আমরা একদিন বসে বসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত বিষয়গুলো লিখছিলাম। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, "তোমরা কী লিখছ" আমরা বললাম, 'আপনার থেকে যা শুনেছি।' তিনি বললেন, "আল্লাহর কিতাবের সাথে ভিন্ন কিছু লিখছ?" আমরা বললাম, 'আমরা যা শুনি (তাই লিখেছি)।' তিনি বললেন, "আল্লাহর কিতাব ছাড়া ভিন্ন কিছু? তোমরা আল্লাহর কিতাব লেখার ব্যাপারে একনিষ্ঠ থাকো।" আমরা যা লিখেছিলাম তা এক জায়গায় জমিয়ে তারপর আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম। এরপর বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার থেকে বর্ণনা করব?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তোমরা বর্ণনা করো, এতে সমস্যা নেই। যে আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান বানিয়ে নেয়।"

৩১২. সহীহ মুসলিম: ৩০০৪।

আহমদ তার মুসনাদে হাদীসটি বর্ণনা করেন, আর শাইখ শুয়াইব আরনাউত্ব হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

যে সকল বর্ণনা দিয়ে বৈধতার পক্ষে দলীল প্রদান করা হয়:

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত সবকিছু লিখে রাখতাম; কারণ আমি মুখস্থ করতে চাইতাম। কুরাইশ আমাকে এটা করতে নিষেধ করল। তারা বলল, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা যা শুনেছ, তার সবই লিখে রাখছ? অথচ তিনি তো মানুষ, তিনি কখনো খুশি হয়ে আবার কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বলেন।' আমি লেখা থামিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বললাম। তিনি আঙুল দিয়ে নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, "তুমি লিখবে; যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি এই মুখ থেকে সত্য ছাড়া কিছু বের হয় না।"

সহীহ বুখারীতে আছে, আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লমের সাহাবীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন আমর থেকে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন কেউ নেই। কারণ তিনি লিখতেন, আমি লিখতাম না।'

সহীহ বুখারীতে আছে, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। এ সময় আবু শাহ নামে ইয়েমেনের একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য লিখুন।' তিনি বললেন, "তার জন্য লিখে দাও।"

সহীহ বুখারীতে আছে, ইবন আব্বাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেদনা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন,

«ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ» قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا. فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: «قُومُوا عَنِّي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ»

"তোমরা আমার কাছে লেখার জিনিস নিয়ে আসো। আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব, যাতে পরে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না।" উমার বললেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ-যন্ত্রণা প্রবল হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব আছে, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এটা নিয়ে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য ও শোরগোল বেড়ে গেল। আল্লাহর রাসূল বললেন, "তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ করা অনুচিত।"[৩১৩] এমন আরো অনেক আছার।

(২) মাওকুফ ও মাক্বতু' কিছু বর্ণনা

এ ধরনের বর্ণনাগুলো সংকলন করেছে খত্বীব বাগদাদীর 'তাক্বঈদুল ইলম' বই এবং সুনান দারেমীতে লিখনী সংক্রান্ত দুটি অধ্যায়। লিখনীর পক্ষে-বিপক্ষে সঠিক বর্ণনা এখানে আমি উল্লেখ করব।

প্রথমত: লিখনী নিষিদ্ধ করে এমন বর্ণনাসমূহ

আবু নাদ্বরা বলেন, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে আমি বললাম, আপনি কি আমাদেরকে লিখাবেন না? আমরা তো মুখস্থ করি না। তিনি বললেন, 'না, আমরা তোমাদেরকে লিখাব না। আমরা এটাকে কুরআন বানাবো না। তোমরা আমাদের থেকে এগুলো মুখস্থ করে নাও, যেমনটা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুখস্থ করেছিলাম।'

আব্দুল্লাহ ইবনুল 'আলা বলেন, আমি ক্বাসেমকে বললাম তিনি যেন আমাকে কিছু হাদীস লিখে দেন। ক্বাসেম বললেন, উমার ইবনুল খাত্তাবের আমলে হাদীস অনেক বেড়ে যায়। তিনি মানুষদেরকে হাদীস নিয়ে আসতে বলেন। হাদীস নিয়ে আসলে তিনি সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'আহলে কিতাবদের মতো মুসান্নাত (মিশনাহ) তোমরা জড়ো করছ।' তারপর থেকে আমাকে ক্বাসেম কোনো হাদীস লিখতে নিষেধ করে দেন।

আবুশ শা'সা আল-মুহারিবী বলেন, ইবন মাসউদ ইলম লিখে রাখা অপছন্দ করতেন।

---

৩১৩. সহীহ বুখারী: ১১৪।

আবু বুরদা বলেন, আবু মুসা আশ'আরী আমাদেরকে হাদীস বলতেন, আমি আর আমার এক মুক্ত দাস এগুলো লিখে রাখতাম। একদিন তিনি কিছু হাদীস বললে আমরা সেগুলো লিখে রাখার জন্য উঠে গেলাম। তিনি ধারণা করলেন আমরা লিখব। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা আমার থেকে যা শুনেছ তা লিখছ?' দুজন বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'লেখা শেষ করলে নিয়ে আসবে।' লেখা নিয়ে আসার পর তিনি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে বললেন, 'আমরা যেমন মুখস্থ করেছি, তোমরাও তেমন মুখস্থ করো।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আবু হুরাইরা গোপন রাখেন না, আবার লেখেন না।

ইবন আবী শাইবা তার 'মুসান্নাফ' বইয়ে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'কিয়ামতের অন্যতম আলামত হলো নানা মতামত ছড়িয়ে পড়বে, সম্পদ সঞ্চিত করা হবে, নিকৃষ্ট মানুষরা সম্মানিত হবে, ভালো মানুষেরা লাঞ্ছিত হবে, আর মাসানী পড়া হলেও কেউ আপত্তি করবে না।' মাসানীর ব্যাখ্যা দেন— 'আল্লাহর কিতাব ছাড়া ভিন্ন সবকিছু'।

সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, ইবন আব্বাস ইলম লিখে রাখতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে বিভিন্ন বইপত্র বিভ্রান্ত করেছে।'

সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, কুফাবাসী আমাকে কিছু মাসআলা লিখে পাঠায় যেগুলো নিয়ে তারা ইবন উমরের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলে। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে ঐ লিখিত মাসআলাগুলো জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি যদি জানতেন আমার কাছে সেগুলো লিখিত অবস্থায় ছিল, তাহলে আমার আর তার মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত।

আব্দুর রহমান ইবন হুরমুলাহ বলেন, আমার মুখস্থশক্তি দুর্বল ছিল। তাই সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আমাকে লেখার ব্যাপারে ছাড় দেন (অর্থাৎ অন্যদের ক্ষেত্রে ছাড় ছিল না)।

আওযা'ঈ বলেন, ইলম অর্জন সবসময় কঠিন ছিল। মানুষজন সেগুলো ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করত। কিন্তু যখন থেকে কাগজে ইলম লেখা হলো, তখন থেকে ইলমের সাথে সম্পৃক্ততা নেই এমন মানুষও সেটা বহন করল।

দ্বিতীয়ত: লিখনীর ব্যাপারে ছাড় দেয় এমন বর্ণনাসমূহ

আমর ইবন আবু সাবরা বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে বলতে শুনেছি, তোমরা ইলম লিখে রাখার মাধ্যমে সংরক্ষণ করো।

হাসান ইবন জাবের বলেন, তিনি আবু উমামা আস-বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইলম লিখে রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আবু উমামা উত্তর দেন, 'এতে কোনো আপত্তি নেই।'

আনাস ইবন মালেকের কাছে একটা হাদীস পছন্দ হওয়ার পর তিনি তার ছেলেকে সেটা লিখে রাখতে বলেন।

বাশীর ইবন নুহাইক বলেন, আমি আবু হুরাইরা থেকে যা শুনতাম তা লিখে রাখতাম। তার থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হতে গেলাম, তখন তার থেকে লিখিত বিষয়গুলো সংকলন এনে তার সামনে পড়লাম। তাকে বললাম, 'আমি এগুলো আপনার থেকে শুনেছিলাম?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, আমি ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে একটা কাগজে লিখতাম আবার জুতায় লিখতাম। হারুন ইবন আনতারা বলেন, তার বাবা বলেন, ইবন আব্বাস আমাকে একটা হাদীস বললে আমি তাকে বললাম, আমি কি এটা আপনার থেকে লিখব? তিনি আমাকে অনুমতি দিতে না চাইলেও পরে দিলেন।

সুলাইমান ইবন মুসা থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন উমারের মাওলা নাফে'কে ইলম লিখে রাখতে দেখেন।

আব্দুল্লাহ ইবন হানাশ বলেন, আমি তাদেরকে তাদের কলমের প্রান্ত দিয়ে হাতের তালুতে লিখতে দেখেছি।

ইব্রাহীম বলেন, আবীদাহ আস-সালমানী আমাকে বলেন, আমার কোনো লিখনীকে স্থায়ী করবে না (অর্থাৎ তিনি লিখতেন)।

উবাইদ আস-মাকতাব বলেন, আমি লোকজনকে মুজাহিদের কাছে তাফসীর লিখতে দেখেছি।

আব্দুল্লাহ ইবন দীনার বলেন, উমার ইবন আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ আবু বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযমকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হাদীসগুলো লিখে পাঠাও। আমার আশঙ্কা হচ্ছে ইলম উঠে যাবে।'

মুবারক ইবন সাঈদ বলেন, সুফইয়ান রাতের বেলা দেওয়ালে হাদীস লিখতেন। সকাল হলে সেটার অনুলিপি লিখে দেয়াল থেকে মুছে ফেলতেন।

লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো কেউ পড়লে সে বলবে যে, সাহাবীদের মাঝে (এ ব্যাপারে ইজমা না থাকলেও) একটা ধারা ছিল যারা কুরআন ছাড়া অন্য সবকিছু লিখে রাখতে নিষেধ করত। সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছারগুলো পড়লে কেউ বলতে বাধ্য হবে যে, লেখার বৈধতার ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তাহলে এই দুইয়ের মাঝে সমন্বয় কীভাবে হবে? হাফেয ইবন হাজার এ ব্যাপারে আলেমদের বিরোধ নিরসন করে বলেন, 'এই দুই মতের মাঝে সমন্বয় হলো, নিষেধাজ্ঞা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। কারণ সে সময় কুরআনের সাথে অন্য কিছু মিশে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর লিখে রাখার অনুমতি অন্যান্য সময়ের জন্য। অথবা নিষেধাজ্ঞা কুরআনের সাথে অন্য কিছু একত্রে লেখার ক্ষেত্রে, আর অনুমতি ভিন্নভাবে লেখার ক্ষেত্রে। অথবা নিষেধাজ্ঞা প্রথমে ছিল, পরবর্তীতে যখন কুরআন-হাদীস মিশে যাওয়ার আশঙ্কা দূর হয় তখন অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়। আর এটাই সঠিক মতের সবচেয়ে কাছাকাছি। বলা হয়, নিষেধাজ্ঞা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে লিখনীর উপর নির্ভর করে মুখস্থ ছেড়ে দিবে। আর অনুমতি তার জন্য, যে এমন কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখবে। কেউ কেউ আবু সাঈদের হাদীসে ত্রুটি আছে বলে মনে করেন, সেক্ষেত্রে সঠিক মত হলো হাদীসটা আবু সাঈদের থেকে মাওকূফ (নবীজী থেকে বর্ণিত না)। এটা বুখারীসহ অন্যদের মত।'[৩১৪] আর অনুমতির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বলতে হয়, নিষেধাজ্ঞার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস। আমরা দেখেছি হাদীসটা মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারী আপত্তি করেছেন এবং এটাকে মাওকূফ বলেছেন। তারপরও মুসলিম যেহেতু এটাকে

৩১৪. ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী (১/২০৮)।

সহীহ বলেছেন আর সাহাবীদেরকে লেখার ব্যাপারে নিষেধ করার অন্যান্য বর্ণনাও রয়েছে, সেহেতু আমরা একটাকে মারফূ' ধরে নিব। মতামতের মাঝে সমন্বয় এবং কোনো একটা মতকে রহিত বলার যে সমাধান ইবন হাজার দিয়েছেন, সেটাও আমরা দেখব। ইমাম রামহুরমুযী মনে করেন, লেখার নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়েছে এবং অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি এটা হিজরতের পর প্রথম সময়ে ছিল; যে সময় কুরআন ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হওয়াকে আশঙ্কাজনক মনে করা হত।'[৩১৫] খাত্তাবীসহ বেশ কিছু আলেম তার মতের প্রতি সায় দেন। খাত্তাবী বলেন, 'সম্ভবত নিষেধাজ্ঞা প্রথম যুগে ছিল। আর শেষ পর্যায়ে লিখে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আবার এটাও বলা হয়, কুরআনের সাথে হাদীসকে একত্রে লিখতে নিষেধ করার কারণ যাতে একজন পাঠক এই দুটির মাঝে মিশিয়ে না ফেলেন। কিন্তু লেখা পুরোপুরি নিষেধ করা হয়েছে এমনটা যথাযথ নয়।'[৩১৬] 'তবে আমরা দেখতে পাই, রহিত হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। কারণ লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা যদি ব্যাপকভাবে রহিত হয়ে যেত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবীদের মাঝে লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার মতের কোনো অস্তিত্বই থাকত না। আর যে সকল ইলম অন্বেষী সাহাবী লেখার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন, তাদের বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। সুতরাং সমস্যাটার ভিন্ন সমাধান প্রয়োজন।'[৩১৭] বরং শাইখ রশীদ রিদ্বা বিষয়টা উল্টে দিয়ে বলেন, 'আমরা যদি ধরে নিই লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আর অনুমতির হাদীসগুলোর মাঝে বৈপরিত্য আছে, যার ফলে একটা অন্যটাকে রহিত করবে; তাহলে আমরা নিষেধাজ্ঞাটা পরবর্তী সিদ্ধান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে পারব দুটি প্রমাণের মাধ্যমে। **প্রথমত,** কিছু কিছু সাহাবী লেখা থেকে বিরত থাকতেন এবং নিষেধ করতেন। আর এটা তারা করতেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর। **দ্বিতীয়ত,** সাহাবীরা হাদীস লিখতেন না বা প্রচার করতেন না। যদি তারা লিখতেন বা প্রচার করতেন, তাহলে তারা যা লিখে রেখেছেন তা বিপুল পরিমাণে বর্ণিত

---

৩১৫. আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার-রাওয়ী ওয়াল-ওয়া'ঈ (পৃ. ৩৮৬)।

৩১৬. মা'আলেমুস সুনান (৪/১৮৪)।

৩১৭. নূরুদ্দীন ইতর, মানহাজুন নাকদ ফি উলূমিল হাদীস, দারুল ফিকর, পৃ. ৪৩।

৩ প্রকাশন

হত।'[৩১৮] রহিত (নাসখ) করার প্রসঙ্গ আনা হলে সবসময় একটা বিতর্ক থেকে যাবে যে, কোন হাদীসগুলোকে একজন গবেষক মূল হিসেবে ধরবেন। যিনি হাদীস লিখে রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোকে মূল ধরবেন, তিনি দেখতে পাবেন যে কিছু সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার আছারসমূহ রহিত না হওয়ার মতকে প্রাধান্য দেয়। আর এটা বেশ শক্তিশালী প্রমাণ। বিংশ শতাব্দীতে এসে যারা সাধারণত সুন্নাহ অস্বীকার করে, তারা এই দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বীকার করে যে সুন্নাহ ওহী নয়; কেননা সুন্নাহ নির্দিষ্ট সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক, অন্যদিকে কুরআন ব্যাপক। এছাড়াও তারা এই যুক্তি দিবে সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকার করে যে, প্রথম শতকে সেটা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ইবন হাজার যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন, 'নিষেধাজ্ঞা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালের সাথে নির্দিষ্ট, যাতে কুরআন অন্য কিছুর সাথে মিশে না যায়' অথবা 'নিষেধাজ্ঞা কুরআনের সাথে অন্য কিছু একত্রে লেখার ব্যাপারে, আর ভিন্নভাবে লিখলে নিষেধ নয়'— এই সমন্বয় আধুনিক মানুষকে তুষ্ট করে না। মাহমুদ আবু রাইয়্যা তার প্রসিদ্ধ বই 'আদ্বওয়া আলাস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যা' বইয়ে বলেছে, 'এই যুক্তিতে কোনো বুদ্ধিমান জ্ঞানী মানুষ বিশ্বাস করে না। কোনো প্রকৃত গবেষক এটা গ্রহণ করে না। তবে যদি আমরা হাদীসগুলোকে বালাগাতের ক্ষেত্রে কুরআনের স্তরে মনে করি আর হাদীসের বাচনভঙ্গিতে কুরআনের মত ইজায খুঁজে পাই তাহলে বিশ্বাস করব। কিন্তু এটা কেউ স্বীকার করবে না, এমনকি যারা এই মত দিচ্ছে তারাও করবে না। কারণ এটা বলার অর্থ কুরআনের মুজিযা বাতিল করে দেওয়া, কুরআন যে মুজিযা সেই ভিত উপড়ে ফেলা। ... তারা যে যুক্তি বা কারণ দেখাচ্ছে সেটা তো আবু বকরের আমলে কুরআন লেখা আর উসমানের আমলে সংকলন ও বিতরণের মাধ্যমে দূর হয়ে গিয়েছে। এখন কুরআনে এক হরফ পরিমাণ বৃদ্ধি করাও অসম্ভব হয়ে গিয়েছে।' সুতরাং সে সময় কুরআন সংকলনের মত করে কিছু সাহাবীকে হাদীস সংকলনের জন্য নিযুক্ত করা অসম্ভব কাজ ছিল না। 'মুসলিমরা তাহলে নবীজীর কথা হিসেবে সেগুলো গ্রহণ করত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে সেটা চলে আসত। এতে কোনো পরিবর্তন হতো না বা বানোয়াট

---

৩১৮. মুহাম্মাদ রশীদ রিদ্বা, আল-মানার পত্রিকা, ১৩২৫ হিজরীর শাওয়াল সংখ্যা, 'আত-তাদওয়ীন ফিল-ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধ।

বর্ণনা প্রবেশ করত না।'[৩১৯] অধিকন্তু ইবন হাজার যে সমন্বয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন, সেটা দিয়ে কিছু সাহাবীর লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সমর্থনের কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব না।

খ) লিখনী নিষেধ করার পক্ষে মৌলিকভাবে আমরা যে যুক্তি উপস্থাপন করব সেটা হলো সুন্নাহ যেন আল্লাহর কিতাবের সমকক্ষ না হয়। এক্ষেত্রে আমরা খত্বীব বাগদাদীর বক্তব্য উদ্ধৃত করব। তিনি বলেন, 'কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখতে নিষেধ করার কারণ হলো আল্লাহর কিতাব যেন অন্য কিছুর সমান না হয়ে যায়। কুরআন ছাড়া অন্য কিছুতে যেন মানুষ ব্যস্ত না হয়ে যায়। পরবর্তীতে যখন এই শঙ্কা কেটে গেল, ইলমী কিতাবাদির প্রয়োজন দেখা দিল, তখন লেখা অপছন্দনীয় থাকল না।'[৩২০] নিম্নের আলোচনায় আমরা দেখাব আরবদের দৃষ্টিতে 'লিখনী' বলতে নৃতাত্ত্বিকভাবে কী বোঝাত। কেন আমরা 'আল্লাহর কিতাবের সমকক্ষ' হওয়ার মত বাক্যাংশ বেছে নিলাম। কেন আমরা 'মিশে যাওয়ার আশঙ্কা'র মত বাক্যাংশ নিলাম না।

আরবী ভাষায় 'লেখা'র দুটি অর্থ হয়। একটা হলো: স্মরণের জন্য লেখা, অন্যটা হলো আমরা লেখালেখি যে অর্থে বুঝি। একজন মানুষ সাময়িকভাবে স্মরণ রাখার জন্য যা কিছু লিখে রাখে, কিন্তু তথ্যসূত্র বা উৎস হিসেবে লেখে না, সেটাকে আরবী ভাষায় 'কিতাব' বলে। অন্যদিকে প্রকাশের জন্য মানুষ যা লেখে সেটাকেও আরবীতে 'কিতাব' বলে। গ্রিক ভাষায় বিষয়টা বিপরীত। গ্রিক ভাষায় hypomnema শব্দটা বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যেটা আমরা দৈনন্দিন স্মরণের জন্য লিখে রাখি। আর syngramma বলতে লিখিত 'বই'কে বোঝায়। আরবী ভাষায় একটা শব্দেই অর্থের আধিক্য থাকায় আমরা দুই প্রকার লিখনীর মাঝে পার্থক্য করতে পারিনি। ফলে একই সাহাবীর দুই প্রকার বর্ণনা আমাদের কাছে বিপরীতমুখী মনে হয়েছে। এক বর্ণনায় তিনি লিখতে নিষেধ করছেন, আবার অন্য বর্ণনায় তিনি অনুমতি দিচ্ছেন। আমরা যখন দেখি সাঈদ ইবন জুবাইর জুতায় লিখছেন, তখন আমাদেরকে বুঝতে

৩১৯. মাহমুদ আবু রাইয়্যা, আদ্বওয়া আলাস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, দারুল মা'আরিফ, পৃ. ২৩-২৪।

৩২০. তাকঈদুল ইলম, পৃ. ৯৩।

হবে এখানে লেখার অর্থ স্মরণের জন্য লেখা। আমরা চাইলে এর নাম দিতে পারি 'অস্থায়ী' লিখনী। (এতে অন্তর্ভুক্ত হবে মানুষের মাঝে ঋণপত্র ও দিয়তসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী বিষয় লিপিবদ্ধ করা। এখানে ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক স্মৃতিশক্তিই হবে মূল আর লিখিত বই হবে স্মরণিকা মাত্র।) অন্যদিকে আবীদাহ আস-সালমানী যখন 'আমার কোনো বই স্থায়ী করবে না' বলে দেন, তখন এর অর্থ ভিন্ন। আমরা এর নাম দিতে পারি 'স্থায়ী' লিখনী। তাই কোনো সাহাবী যখন লিখনীর ব্যাপারে নিষেধ করেন, আবার একই সময়ে আমরা দেখতে পাই তিনি ছাত্রদের হাদীস বলছেন আর তারাও লিখছে, তখন আমরা বুঝব তিনি লেখার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন, সেটা স্থায়ীভাবে লেখার ক্ষেত্রে, অস্থায়ী লেখার ব্যাপারে নয়।

তত্ত্বীয় দিক থেকে দেখলে লিখতে নিষেধ করার বিষয়টা দুটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে: ১) শুধু স্থায়ী লেখা নিষেধ করা, ২) স্থায়ী-অস্থায়ী উভয় প্রকার লেখা নিষেধ করা। কারণ অস্থায়ী লেখা হয়তো কোনো ছাত্র স্থায়ী করে রেখে দিতে পারে। কিন্তু কোনো সাহাবীর কাছ থেকে যদি লেখার অনুমতি প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে তার নিষেধাজ্ঞা স্থায়ীভাবে লেখার নিষেধাজ্ঞাই বোঝাবে। পক্ষান্তরে কোনো সাহাবী থেকে যদি নিছক লেখার ব্যাপারেই নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তার নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী লেখার ক্ষেত্রেও হতে পারে, আবার যেকোনো ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও হতে পারে।

প্রায়োগিক দিক থেকে দেখলে আমরা দেখি বড় বড় সাহাবীদের থেকে নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতি উভয়টা পাওয়া যায়। সুতরাং এই মত প্রাধান্য পায় যে, সাহাবীরা স্থায়ীভাবে লিখতে নিষেধ করতেন, অস্থায়ীভাবে নয়। এটা অনুধাবন করলে আমরা খুব সহজে বুঝব আরবরা স্থায়ী লিখনী বলতে কী বুঝতেন আর কেনইবা সাহাবীরা তাদের সূত্রে লিখিত কোনো কিছু বর্ণিত হওয়া ভয় পেতেন, মৌখিকভাবে বর্ণিত হওয়াকে ভয় পেতেন না।

আরবদের কাছে স্থায়ীভাবে লেখার বিষয়টা যদি কোনো মহান ব্যক্তির ক্ষেত্রে (জাহেলী যুগের মর্যাদাবান পূর্বপুরুষ, নবী এবং ইসলাম আসার পরে সাহাবীরা) হয়ে থাকে **তাহলে সেটা তার প্রতি সম্মান প্রকাশের জন্য হয়ে থাকে**। নিজ সম্প্রদায়ে সম্মানিত কোনো ব্যক্তির বর্ণনাগুলো পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে পবিত্র ও মর্যাদার বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। তাই বহু

জাতির মাঝে নেককারদের ইবাদত তথা উপাসনার মাধ্যমে শির্ক ছড়িয়ে পড়ে। আরবদের কাছে লেখার বিষয়টা ওহীর সাথে বেশ শক্তিশালীভাবে জড়িত। এর পক্ষে প্রমাণ হলো লাবীদ ইবন রাবীয়ার মুয়াল্লাকায় তার পংক্তি,

فمدافع الريان عرى رسمها *** خلقا كما ضمن الوحى سلامها

'রাইয়্যান পর্বতের জলধারাগুলো বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং এর চিহ্নসমূহ জীর্ণশীর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; (তবুও তার স্মারকচিহ্ন বিলুপ্ত হয়নি, বরং অক্ষুণ্ন রয়েছে) যেমনটি প্রস্তর গায়ে অঙ্কিত (লিখিত) লিপি সুরক্ষিত থাকে।'

আযহারী তার মু'জামু তাহযীবিল লুগাহ বইয়ে বলেন, 'ওয়াহাইতুল কিতাব আহীহি ওয়াহইয়ান' অর্থাৎ আমি সেটা লিখলাম, সুতরাং সেটা ওহী হলো। ইবনুল আ'রাবী বলেন, আরবদের কাছে লেখক (কাতেব) হলেন আলেম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝﴾ [الطور: ٤١]

"নাকি তাদের কাছে গায়েবের সংবাদ আছে, তাই তারা লেখে।" [সূরা আত-তূর: ৪১]

হামদানী তার 'আল-ইকলীল' বইয়ে উল্লেখ করেন যে, আরবের লোকেরা বই পাঠক বা লেখককে 'সাবে' (صابى) বলত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় মানুষদের ডাকতেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন লোকজন তাকে 'সাবে' বলত। হামদানীর তাফসীর অনুযায়ী যারা লেখে এবং লিখিত বই পড়ে, তারা সাবে। সুতরাং হানীফ (একত্ববাদে বিশ্বাসী) সম্প্রদায় সাবে।[৩২১] বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে যদি আমরা লিখনীর বিপরীত তথা নিরক্ষরতার দিকে তাকাই। আরবের লোকজন নিরক্ষরতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হলে এর অর্থ দুটি হওয়ার সম্ভাবনা রাখে: স্থায়ী নিরক্ষরতা অর্থাৎ আসমানী কিতাবের অনুপস্থিতি। আর স্বাভাবিক নিরক্ষরতা অর্থাৎ

৩২১. জাওয়াদ আলী, আল-মুফাস্সাল ফী তারীখিল আরাবি কাবলাল ইসলাম, দারুস সাকী, ২০০৪, (১৫/১০৮)।

অধিকাংশ মানুষের লেখাপড়ার সক্ষমতার অনুপস্থিতি। আবার দুটি অর্থই বোঝাতে পারে, যেমনটা ইসলামপূর্ব আরবের লোকজনের ছিল। তারা সবাই সাধারণ ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকে উম্মী তথা নিরক্ষর ছিল। প্রসঙ্গ থেকে আমরা অর্থটা নির্ধারণ করব। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ﴾ [ال عمران: ٢٠]

"যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং যারা নিরক্ষর, তাদেরকে বলুন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারা সুপথপ্রাপ্ত। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আপনার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আলে ইমরান: ২০] এখানে নিরক্ষর বলতে উদ্দেশ্য 'আরবের সে সকল মুশরিক যারা কোনো আসমানী কিতাব লাভ করেনি।'[৩২২] কারণ প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় এই আয়াতে লেখার যোগ্যতা নাকচ করার বিষয়টা মানানসই নয়। আয়াতে আলোচ্য বিষয় হলো আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত জাতি। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে আরবদেরকে সর্বশেষ আসমানী কিতাব দিয়ে অনুগ্রহ করেন। অন্যদিকে হাদীসে আছে, "আমরা উম্মী (নিরক্ষর) জাতি, হিসাব-কিতাব করতে জানি না।" এই হাদীসে নিরক্ষরতা বলতে স্বাভাবিক নিরক্ষরতা উদ্দেশ্য।

যেহেতু মুসলিমদের সালাত আদায়ের জন্য কুরআন জানা আবশ্যক, সেহেতু নিছক হাদীসকেও স্থায়ীভাবে লেখা কুরআনের সমকক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত করার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া বলে গণ্য করা হয়। নিচের বক্তব্যগুলো পড়লে সেটা স্পষ্ট হবে। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর এক অনুসারী বলেন, আমি এক লোকের হাতে একটা কাগজে 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর' লেখা দেখলাম। তাকে বললাম, আপনি এটা আমাকে লিখে দিন। তিনি সেটা দিতে চাইলেন না। পরে অবশ্য দেওয়ার ওয়াদা দিলেন। আমি আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে এসে দেখলাম এটা তার সামনে। তিনি বললেন, 'লেখা বিদ'আত,

---

৩২২. তাফসীরুত ত্বাবারী (৬/২৮১)।

ফিতনা ও বিভ্রান্তি। তোমাদের পূর্বের জাতিগুলো এ সকল বিষয় বা এগুলোর অনুরূপ জিনিসের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। **তারা এগুলো লিখে রাখত, ফলে তাদের জিহ্বায় এগুলো সুস্বাদু হয়ে যায়, তাদের অন্তর এগুলোকে গ্রহণ করে নেয়।**' তারপর তিনি উপস্থিত সকল থেকে দৃঢ় ওয়াদা নিলেন যেন লিখিত সব ধরনের কাগজের স্থান দেখিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে তিনি শপথও নিলেন। শু'বাহ বললেন, 'তিনি কি আল্লাহর নামে শপথ করেছিলেন?' বর্ণনাকারী বলেন, 'আমার যদ্দুর ধারণা তিনি শপথ করেছিলেন। এমনকি বলেছিলেন যে, আমরা যদি দীরে হিন্দ (কুফা থেকে দূরের একটা জায়গা) এমন কিছুর অস্তিত্ব শুনতে পাই তাহলে হেঁটে হলেও সেখানে যাবো।'[৩২৩] ইবন আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, 'শয়তানরা আসমানে কান পেতে শুনত। কেউ সত্য কোনো কথা শুনলে এর সাথে এক হাজার মিথ্যা মিশিয়ে বলত। **মানুষের হৃদয় এগুলোকে গ্রহণ করে নেয়। তারা এ সব কিছু লিখে রাখতে থাকে।** সুলাইমান তা দেখে নিজের কুরসীর নিচে দাফন করেন। সুলাইমানের মৃত্যুর পর শয়তানরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, 'আমরা কি সুলাইমানের গুপ্তধনের সন্ধান দিব যার মতো কোনো গুপ্তধন নেই? তারপর তারা সেটি বের করে আনে।'[৩২৪]

আমরা উপর্যুক্ত দুটি বক্তব্যে দেখতে পাই লিখনীর ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া কতটা তীব্র। ইবন মাসউদের হাদীসে অন্তর কোনো কিছুকে গ্রহণ করার বিষয়টা লিখনীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর ইবন আব্বাসের হাদীসেও লিখনীর সাথে অন্তর কোনো কিছু ধারণ করাকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সাহাবীদেরকে স্বচ্ছ তাওহীদের উপর বড় করেছেন, সেহেতু তারা চূড়ান্ত সতর্ক ছিলেন যেন আল্লাহর বাণী দিয়ে ব্যক্তি যতটা প্রভাবিত হয় ততটা অন্য কিছু দিয়ে কেউ যেন না হয়। আর সালাতে কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে ইবাদত করা হয় না তা আমরা জানি। সব কথার সারকথা হলো, 'আমরা এটাকে কুরআন বানাতে চাই না'। অধিকন্তু ইহুদীরা যে তাদের আলেমদের ব্যাখ্যাগুলো আল্লাহর অবতীর্ণ তাওরাতের সাথে মিশিয়ে ফেলেছিল, সেটা সাহাবীদের অন্তরে সবসময় ছিল,

৩২৩. সুনান দারেমী, তাহকীক: হুসাইন সেলিম আসাদ, (১/২৪৬), সহীহ সনদে।
৩২৪. সুনান সাঈদ ইবন মনসুরের 'আত-তাফসীর', তাহকীক: সাদ আল-হামীদ, দারুস সুমাই'ই, (২/৫৯৫)।

যেটা কিছু সাহাবীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। তারা বলেছেন যে, এই বইগুলো আমাদের পূর্ববর্তীদের বিভ্রান্ত করেছে। আব্দুল্লাহ ইবন আমর তো সরাসরি 'মুসান্নাফ' থেকে সতর্ক করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কিছু লেখা থেকে সাবধান করে দেন। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই সাহাবীরা সুন্নাহকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে লিখতে পারেন না যেমনটা আবু রাইয়্যা (এবং তার কাছাকাছি চিন্তার অধিকারী লোকজন) দাবি করেন। কারণ সাহাবীরা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহর খাতার মাঝে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে যতই আলাদা করুক না কেন, স্থায়ীভাবে লেখার ফলে একটা আশঙ্কা থেকে যায়। সে আশঙ্কাটা হল, এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মগুলো এই লিখনীকে পবিত্র-জ্ঞান করতে শুরু করবে। সুতরাং সুন্নাহ লেখার ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক সাহাবীর এই নিষেধাজ্ঞা বিচক্ষণতার পরিচায়ক ছিল। অধিকন্তু ইসলাম পরবর্তী সময়ে অস্থায়ীভাবে লেখার প্রবণতা খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু ইসলাম ছিল আসমানী-কিতাব নির্ভর একটা দীন, অধিকন্তু ইসলামের প্রাথমিক বড় বিজয়সমূহের ফলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। সুতরাং সুন্নাহ লিখতে নিষেধ করার ব্যাপারে সাহাবীদের প্রধান কারণ ছিল (যদিও তাদের কারো কারো কাছে কিছু লিখনী ছিল এবং তাদের ছাত্রদের মাঝেও ছিল) তাওহীদ সংরক্ষণ, যাতে আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে কেউ পবিত্র-জ্ঞান না করে। তবে অন্যান্য দুনিয়াবী কারণ থাকতে পারে যেগুলো নাকচ করা হবে না। যেমন: সরাসরি গ্রহণের গুরুত্ব, মনের উপর মুখস্থ বিষয়ের প্রভাব, মৌখিক বর্ণনার অগ্রাধিকার প্রভৃতি যে সকল কারণ সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম তথা তাবেয়ীদের মাঝে ছিল। এখান থেকে স্পষ্ট হয় কেন তাবেয়ীদের মাঝেও হাদীস লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা চলমান থাকে, যদিও ততদিনে আল্লাহর কিতাব সংকলিত হয়ে গিয়েছে। উরওয়া ইবনুয যুবাইরের ভাষায়, '(কিতাবুল্লাহর) প্রভাব চলমান হয়েছে।'

হাদীস লেখার ব্যাপারে নিষেধ করার কিছু মৌলিক ও কিছু শাখাগত কারণ সাহাবীদের কাছে ছিল। আল্লাহর কিতাব স্থায়িত্ব পাওয়ার পর মৌলিক কারণ দূর হয়ে যায়। কিন্তু শাখাগত কারণ এবং সাহাবীদের আমল তাবেয়ীরা ধরে রাখে।

আবু রাইয়্যার অন্য আরেকটি ভুল হলো তিনি মনে করতেন লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাই সাহাবী এবং তৎপরবর্তীদের না লেখার একমাত্র কারণ। কিন্তু আমরা যেমনটা বর্ণনা করেছি এর দুটি পর্যায় রয়েছে:

(১) মানুষের হৃদয়ে একক ও অনন্য গ্রন্থ হিসেবে কুরআনের পবিত্র অবস্থান তৈরির পূর্বাবস্থা।

(২) আর কুরআনের এমন পবিত্র অবস্থান সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা।

প্রথম পর্যায়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে (স্থায়ী) লিখনী বিস্তারের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং সাহাবীদের বক্তব্য স্থায়ী করা সম্ভব ছিল। কারণ এ পর্যায়ে এসে নিছক লেখাই ছিল কোনো কিছুকে পবিত্র হিসেবে সাব্যস্ত করার প্রক্রিয়া। ইহুদীদের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছিল, তেমনিভাবে পরবর্তী প্রজন্ম 'আল্লাহর কিতাব' আর 'সুন্নাহর কিতাব' মিশিয়ে ফেলবে এমনটা তারা মনে করতেন। কারণ ঐ প্রজন্মের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদা ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে স্থায়ী লিখনী কোনোভাবে পবিত্রতার ধারণা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা থাকেনি। আল্লাহর কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা মুসলিমদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তবে মৌখিক বর্ণনার অগ্রাধিকারের বিষয়টা থেকে যায়, যদিও সেটা ধর্মীয় বিবেচনায় নয়। সেটা হলো লিখনী স্মরণের উদ্দেশ্যে হবে, আর মূল অবস্থা হলো সরাসরি মৌখিকভাবে গ্রহণ করা। লিখনীর অর্থ যিনি আলেম নন, তিনি এমন হাদীস পড়তে পারছেন যেগুলোর বুঝ অবশ্যই তাকে কোনো এক আলেম থেকে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও স্মরণশক্তির উপর সামগ্রিক বা প্রায় সামগ্রিক নির্ভরতার কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। এ সব কিছু ছিল পরিস্থিতি-নির্ভর প্রায়োগিক কর্ম (কোনো ইবাদত নয়), যেখানে লিখনীর উপর মুখস্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তারপর 'মানুষজন ইলমের কিতাবপত্র বেশি পরিমাণে লিখতে থাকে। কাগজে লেখার উপর তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কারণ বর্ণনা অনেক ছড়িয়ে পড়ে, সনদ লম্বা হয়ে যায়, বর্ণনাকারীদের নাম, উপনাম ও বংশনামা বেশি হয়ে যায়, একই কথা বিভিন্ন বাক্যে বর্ণিত হতে থাকে; ফলে মানুষের হৃদয় এত কিছু মুখস্থ

করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।'৩২৫

লিখনীর উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট যে বর্ণনাকে 'মৌখিক' ও 'লিখিত' এই দুই ভাগে বিভক্ত করা কৃত্রিমতায় পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর (আর এটা আরো গভীর ও বিস্তৃত একটা বিষয়ের শাখা, যে বিষয়টা হলো— সমাজকে মৌখিক ও লিখিত এই দুটি মূল ভাগে বিভক্ত করার সমালোচনা[৩২৬]), প্রথম শতকে মৌখিক বর্ণনার সাথে স্মরণিকা হিসেবে কিছু লিখনী সহযোগী ভূমিকা পালন করছিল যেমনটা আমরা দেখেছি। অর্থাৎ স্মরণশক্তির উপর অনবরত সংশয় উত্থাপন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমাদের এটা দাবি করার প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি ভালো (যদিও ঐতিহাসিকভাবে প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী বর্ণনাকারীর অস্তিত্ব প্রমাণিত), আবার এটাও দাবি করার প্রয়োজন নেই যে, নিরক্ষরতা প্রখর স্মৃতিশক্তি তৈরিতে ভূমিকা রাখে। কারণ পূর্বের বক্তব্যসমূহ এবং অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, লিখিত বিষয়গুলো স্মৃতিকে ধারণ করতে সহায়তা করেছে। তাই মূল উৎস হিসেবে মৌখিক বর্ণনা থাকার অর্থ কখনো এটা বোঝায় না যে, প্রথম শতকে স্মরণের সহায়ক হিসেবে লিখনী ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে আমরা এই লিখনীকে বিশ্বস্ত ব্যক্তির থেকে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র মনে করছি, স্মরণের ক্ষেত্রে সহায়ক মনে করছি না। কারণ আমরা লিখিত টেক্সটকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। অর্থাৎ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— যিনি অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন (বাস্তবে প্রথম যুগের অনেক হাফেয এমনই ছিলেন), তিনি আসলেই লিখনীর উপর নির্ভর করতেন, মৌখিক বর্ণনার উপর নয়; যেমনটা প্রসিদ্ধ সাহাবী-তাবেয়ীর ক্ষেত্রে প্রমাণিত। আর এটা দীর্ঘ হাদীসের ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রযোজ্য। সুতরাং আমার দৃষ্টিতে প্রথম প্রজন্মের লোকদের বর্ণনা হলো 'শ্রবণ', মৌখিক বর্ণনা নয়। কারণ মৌখিক বর্ণনা বোঝায় যে, স্মরণের সহায়ক হিসেবে লিখনী ছিল না। কিন্তু 'শ্রবণ' বললে এমনটা বোঝায় না। 'শ্রবণ' কথাটা লিখিত বিষয়ের উপর মৌখিক বর্ণনা বা সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়। **'শ্রবণ' স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, প্রথম হিজরী শতকে সুন্নাহ না লেখার দাবি নৃতাত্ত্বিকভাবে সঠিক না।**

৩২৫. তাকঈদুল ইলম (পৃ. ৬৪)।

৩২৬. Rosalind Thomas, 1989, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge, University Press.

এখানে ইঙ্গিত দেওয়া জরুরী যে, সুন্নাহ যদি প্রথম হিজরী শতকে পুরোটা শুধু মৌখিক হতো, লিখিত কিছু না থাকত; তবুও সনদ প্রত্যাখ্যান করার মতটা যৌক্তিকতা পেত না। 'মৌখিক বর্ণনা যার, তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং তার বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব নয়— এই দাবি তুলে সেটাকে তুচ্ছ চোখে দেখার পরিবর্তে আমাদের করণীয় হলো মৌখিক বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিক বয়ানের মাঝে ইতিহাসের ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট ধ্যান-ধারণার পক্ষে সাক্ষ্য বের করা এবং ইতিহাস নিয়ে গবেষণায় একটা নতুন দিক প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টা আঁচ করা। টেক্সট লিখিত বা মৌখিক হোক, সেটাকে একইভাবে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিশুদ্ধতা উদঘাটন করতে হবে। আমরা আবার বলি, ইউরোপীয়রা মৌখিক বর্ণনার ব্যাপারে যে হীন দৃষ্টিতে তাকায়, কেবল সেটার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এই দুই প্রকারকে (লিখিত ও মৌখিক) আলাদা করে দেখার কল্পনা মানুষের মনে সৃষ্টি হয়।'[৩২৭] আর আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করে দেখিয়েছি হাদীসের সমালোচকদের তাহকীক কতটা যৌক্তিক, ব্যবহারিক ও কার্যকরী ছিল।

৩. জ্ঞানের সংজ্ঞা

আরবদের চোখে জ্ঞান যেকোনো জানা-শোনাকে অন্তর্ভুক্ত করে, হোক সেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, দলীল থেকে অর্জিত, অভিজ্ঞতালব্ধ কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। কোন প্রকার জানা কতটা শক্তিশালী আর কতটা সম্ভাবনাময়, সেই আলোচনাকে এক পাশে রেখেই আরবদের কাছে জ্ঞানের উপর্যুক্ত সংজ্ঞা। প্রাচীন জাতিসমূহের কাছেও জ্ঞানের সংজ্ঞা এটাই ছিল। কারণ জ্ঞান সবসময় কর্মের বা প্রয়োগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, নিছক তত্ত্বীয় আলোচনায় সীমিত ছিল না। আর কালামশাস্ত্রবিদদের সংজ্ঞা অনুযায়ী জ্ঞান হলো দৃঢ় বিশ্বাস প্রদান করে এমন দলীল থেকে অর্জিত জানা বিষয়, যেটাতে সম্ভাবনার কোনো সুযোগ নেই। আমরা দেখব কীভাবে শাফেয়ী ও আহমদের বক্তব্যই জ্ঞান (ইলম) ও সম্ভাবনার (যন্ন) ক্ষেত্রে আরবদের আসল অর্থটা ধারণ করে।

---

৩২৭. লুই জ্যাঁ ক্যালভি, আত-তাক্কালীদ আশ-শাফাহিয়্যা, হাইআতু আবী যাবী লিস-সাক্বাফা ওয়াত-তুরাস, ২০১২, অনুবাদ: রশীদ বারহুন, পৃ. ১৪৬।

কুরআন কারীমে জ্ঞান বলতে জোরালো সম্ভাবনার অধিকারী জানাশোনার যেকোনো প্রকারকে বোঝায়, শুধু মাত্র অকাট্য জ্ঞানকে বোঝায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾﴾ [النساء: ٨٣]

"যখন তাদের নিকট নিরাপত্তার কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ আসে তখন তারা তা রটিয়ে দেয়। যদি তারা তা রসূলের কিংবা তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্য হতে তথ্যানুসন্ধানীগণ প্রকৃত তথ্য জেনে নিত। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা না থাকত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই শায়ত্বনের অনুসরণ করত।" [সূরা আন-নিসা: ৮৩]

তথ্য ও খবরের অনুসন্ধান ও বিশুদ্ধতা যাচাইকে আল্লাহ 'ইলম' তথা জ্ঞান নাম দিয়েছেন। ইবন যাইদ বলেন, '(তথ্যানুসন্ধানীরা) এরা হলেন যুদ্ধে তাদের নিযুক্ত নেতৃবর্গ। তারা যাচাই করে দেখে তাদের কাছে আগত বর্ণনা কি সত্য নাকি মিথ্যা? মিথ্যা বা বাতিল হলে তারা পরিত্যাগ করবে, আর সত্য হলে তারা গ্রহণ করবে।'[৩২৮]

স্বাভাবিকভাবেই কোনো বর্ণনার সত্যতা যদি উদঘাটন করা হয়, তাহলে সেটা আধুনিক তত্ত্বীয় সংশয়বাদী চিন্তা অনুযায়ী অকাট্য কিছু নয়। তবুও আরবদের চোখে সেটা জ্ঞান। এটা উসূলবিদদেরও অজানা নয়। জাস্‌সাস বলেন, 'ইলম তথা জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথমটা বাস্তবিক, আর দ্বিতীয়টা হলো প্রবল ধারণা বা বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে বলা। দ্বিতীয়টাও যে ইলম তথা জ্ঞান বলে গণ্য হয় সেটার পক্ষে প্রমাণ আল্লাহর বাণী "তোমরা যদি তাদেরকে মুমিন নারী হিসেবে জানতে পারো" [সূরা আল-মুমতাহানাহ: ১০] আর আমরা নিশ্চয় সে সকল নারীর অন্তরে কী আছে তা জানি না। তাদের যে বিষয়টা আমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে, আল্লাহ সেটার নাম

---

৩২৮. তাফসীরুত ত্বাবারী (৮/৫৭৩)।

দিয়েছেন ইলম। ইউসুফের ভাইদের বক্তব্য আল্লাহ কুরআনে উদ্ধৃত করেন, "আপনার ছেলে চুরি করেছে; আমরা যা জেনেছি, সেটা অনুযায়ী সাক্ষ্য দিয়েছি আর আমরা গায়েবের খবর রাখি না।" [সূরা ইউসুফ: ৮১] তারা প্রকৃত অবস্থা না জেনে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত বক্তব্যকে 'ইলম' তথা জ্ঞান নাম দিয়েছে; কেননা ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম আসলে চুরি করতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় বলেন, "তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদে একটা হক আবশ্যক করেছেন, সেটা তাদের মধ্যকার ধনীদের থেকে নিয়ে দরিদ্রদের ফেরত দেওয়া হবে।" তাদের কাছে পৌঁছানোর নাম দিয়েছেন 'জানানো' (إعلام); যদিও তারা প্রকৃত রূপে পুরোপুরি জ্ঞান হাসিল করেনি। অনুরূপভাবে সাক্ষীরা যখন সত্য সাক্ষ্য দেয়, তখন আমরা বাহ্যিকভাবে তাদের জ্ঞান অর্জিত হওয়ার হুকুম প্রদান করি, আর সেটা তাদের সত্যতার ব্যাপারে আমাদের প্রবল ধারণা অনুযায়ী। যেহেতু প্রবল ধারণা ও এর দাবি অনুযায়ী কোনো কিছুকে 'ইলম' তথা জ্ঞান বলা হয়, আর আমাদের দৃষ্টিতে খবরে ওয়াহেদ কেবল বাহ্যিক জ্ঞানের ফায়দা দেয়, বাস্তবিক জ্ঞান নয়, সেহেতু প্রশ্নকর্তা যে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন সেগুলোতে এমন কিছু নেই যার কারণে সেটার গ্রহণযোগ্যতা প্রত্যাখ্যাত হবে; যদি সে যা আবশ্যক করেছে তা এই আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী 'ইলম' তথা জ্ঞান হয়ে থাকে; যাতে করে সেটার ব্যাপারে প্রদত্ত হুকুম সেটাকে আবশ্যক করে। আয়াতটা যদি প্রশ্নকর্তার দাবিকৃত বিষয়কে আবশ্যক করে দিত, তাহলে উপহারের বিষয়ে রাসূলের কথা গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হত, আর মুয়ামালাত তথা লেনদেনের সকল বর্ণনা বাতিল হয়ে যেত; কেননা সেগুলো বাস্তব (হাকীকী) জ্ঞানকে আবশ্যক করে না।"[৩২৯]

কিছু উসূলবিদ এটা বাস্তবেই বলেছেন, যেমন: সারাখসী। তিনি বলেছেন, 'খবরে ওয়াহেদ অনুযায়ী আমল করা আমাদের দৃষ্টিতে এমন ইলম বা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা যেটা বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত তবে অকাট্য নয়। আল্লাহ তা'আলা এর নাম দিয়েছেন ইলম, তিনি বলেছেন ﴿وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ "আমরা যা জেনেছি, কেবল তার সাক্ষ্যই দিয়েছি" তারা এমনটা বলেছেন কোনো এক সংবাদদাতা থেকে শ্রুত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে।

৩২৯. আল-ফুসুল ফিল-উসুল (৩/৯১)।

অনুরূপভাবে আল্লাহ বলেন, ﴿فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٍ﴾ "তোমরা যদি তাদেরকে মুমিন নারী হিসেবে জানো" আর এটা তিনি বলেছেন এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে যেখানে বাহ্যিকতার উপর কিছুটা নির্ভর করা হলেও নিরংকুশ নির্ভরতা ছিল মতামতের উপর। সুতরাং প্রমাণিত হলো এমন (মতামত নির্ভর) জিনিসকে জ্ঞান বলা হয়, সংশয় বলা হয় না। সংশয় হলো পাপীর প্রদত্ত সংবাদ। তাই আল্লাহ পাপীর সংবাদ গ্রহণের ব্যাপারে থামতে বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন, "যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করো" এর থেকে বোঝা যার যে ন্যায়পরায়ণ (আদ্‌ল) ব্যক্তির বর্ণনার উপর কেউ যদি আমলের ক্ষেত্রে নির্ভর করে, সে অজ্ঞতার পথে অগ্রসর হয়নি, বরং জ্ঞান অনুযায়ী নিজেকে এগিয়ে নিয়েছে। তবে এই জ্ঞান (ইলম) বাহ্যিক বিবেচনায়, কারণ ন্যায়পরায়ণতা থাকায় তার বর্ণনায় সত্যতার দিকটা প্রাধান্যপ্রাপ্ত।'[৩৩০] কিন্তু কালামী অঙ্গনে প্রচলিত চিন্তাধারার কারণে তারা এই ব্যবহারটা রূপক হিসেবে নিয়েছেন। কারণ তাদের চোখে 'ইলম' তথা জ্ঞানের সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ।

কালামী গবেষণা 'ইলম'-এর সংজ্ঞাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমিত করে দিয়েছে। আবার 'যন্ন' তথা ধারণার অর্থসমূহের মাঝে মাত্র একটা অর্থকে বাছাই করেছে, সেটা হলো প্রাধান্যপ্রাপ্ত সম্ভাবনা বা নিছক সম্ভাবনা। আর এভাবেই 'ইলম' (জ্ঞান) ও 'যন্ন' (সম্ভাবনা)—এর দ্বৈততা কালামীরা হাজির করেছে।

শাইখ আব্দুল হামীদ ফারাহী 'যন্ন' শব্দের অর্থসমূহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'যন্ন হচ্ছে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ না করে যা ধারণা করে। আর প্রত্যক্ষ না করা বিষয়টা যেহেতু অনেক সময় দৃঢ় বিশ্বাসের নিশ্চয়তা দেয় না, সেহেতু এই ধারণা সংশয়ের অর্থ দেয়। আর এ অর্থে আরবদের বক্তব্যে ও কুরআনের ভাষায় ব্যাপকভাবে বিষয়টা ব্যবহৃত হয়েছে যেমনটা ত্বারাফা বলেন,

وأعلم علما ليس بالظن أنه *** إذا ذل مولى المرء فهو ذليل

---

৩৩০. উসূলুস সারাখসী (১/৩২৭)।

'আমি সম্ভাবনা নয় বরং আসলেই জানি যে ব্যক্তির দাস লাঞ্ছিত হলে সেও লাঞ্ছিত।' আর কুরআনে আছে, ﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ "আমরা তো কেবল ধারণা করি, আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী নই।" [সূরা আল-জাছিয়া: ৩২] কিন্তু প্রত্যক্ষ না করা বিষয়টাও দৃঢ় বিশ্বাসের বস্তু হতে পারে। তখন ব্যাপক অর্থে সেটাকে 'যন্ন' বলা হয়, সংশয়ের অর্থ তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। যেমনটা আউস ইবন হাজার বলেন,

الألمعى الذى يظن بك ال *** الظن كأن قد رأى وقد سمعا

'বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার ব্যাপারে এমন ধারণা করে যেন সে দেখেছে এবং শুনেছে।'

দুরাইদ ইবনুস সিম্মাহ বলেন,

فقلت لهم ظنوا بألفى مدجج *** سراتهم فى الفارسى المسرد

'আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা দুই হাজার অস্ত্রসজ্জিত সৈনিকের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো, যাদের মাঝে উত্তম ব্যক্তিরা ঢাল পরিহিত অবস্থায় থাকবে।'

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন মুমিনদের চিত্র তুলে ধরেন,

﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ۝﴾ [الحاقة: ٢٠]

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হব।" [সূরা আল-হাক্কাহ: ২০]"[৩৩১]

এভাবে আমরা দেখতে পাই 'যন্ন' শব্দটা অর্থের দিক থেকে গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত, হোক সেটা স্থায়ী গায়েবী বিষয় অথবা সাময়িক গায়েবী বিষয় যেটা অনুমান করা সম্ভব। আর যেহেতু এই অনুমান মাঝে মাঝে ভুল হয়, সেহেতু অনুমানের সাথে সংশয়কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই ব্যবহারটা (সংশয় অর্থে যন্ন) কালামবিদরা ব্যবহার করে 'ইলম' ও 'যন্ন' অথবা 'ইয়াকীন' ও

৩৩১. আব্দুল হামীদ আল-ফারাহী, মুফরাদাতুল কুরআন, দারুল গার্ব আল-ইসলামী, ২৯৬-২৯৭।

'যন্ন' এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। ব্যবহারটা সঠিক। কিন্তু এর ফলে অন্য ব্যবহারের প্রতি অবহেলা সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হলো 'গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত ইলম' অর্থে 'যন্ন'-এর ব্যবহার।

ত্বাবারী বলেন, 'আরবের লোকজন ইলমের স্থলে যন্ন ব্যবহার করেছে যখন তারা কোনো বিষয়ে সংবাদের মাধ্যমে জেনেছে কিংবা সরাসরি প্রত্যক্ষ না করে জেনেছে। আর যদি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে তারা কোনো কিছু জেনে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা যন্ন ব্যবহার করে না। তাদেরকে কখনো বলতে দেখবেন না (اظنني حيا) 'আমি নিজেকে জীবিত মনে করি' কিংবা 'আমি নিজেকে মানুষ মনে করি' (اظنني إنسانا) এই অর্থে যে, 'আমি নিজেকে মানুষ হিসেবে জানি' বা 'আমি নিজেকে জীবিত বলেই জানি'।'[৩৩২] এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো 'যন্ন' শব্দটা গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত 'দৃঢ় বিশ্বাসের জ্ঞান' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে সত্য গায়েবী ইলমের অর্থে যন্ন শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ۝٤٥ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ۝٤٦﴾ [البقرة: ٤٥، ٤٦]

"আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর নিশ্চয় তা বিনয়ীরা ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবেই এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।" [সূরা আল-বাকারা: ৪৫, ৪৬] এখানে যন্ন শব্দটা দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থে যেমনটা আবুল 'আলিয়াসহ সালাফে সালেহীনের অন্যান্য মুফাস্‌সির ব্যাখ্যা করেছেন। আপনি বিশেষভাবে ইবন যাইদের তাফসীর খেয়াল করুন, 'কারণ তারা দেখেনি, তাই তাদের ধারণাটা ছিল দৃঢ় বিশ্বাস, সংশয়ে পরিপূর্ণ ধারণা নয়।'[৩৩৩] ইলমুল গায়েবের বিপরীতে রয়েছে গায়েবের ব্যাপারে অজ্ঞতা। কুরআনে এর উদাহরণ হলো মুশরিকদের ধারণা। তারা তাদের রবের ব্যাপারে অজ্ঞতাপূর্ণ ধারণা রাখত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

৩৩২. তাফসীরুত ত্বাবারী (১৬/৩০৯)।
৩৩৩. প্রাগুক্ত (১/১৯)।

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾﴾ [النجم: ٢٧، ٢٨]

"নিশ্চয় যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নামে নামকরণ করে থাকে। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোনো কাজেই আসে না।" [সূরা আন-নাজম: ২৭, ২৮] এটা স্পষ্ট যে যন্ন তথা ধারণার নিন্দা করার কারণ সম্ভাবনার কমতি থাকা নয়, বরং এর কারণ, তাদের এই ধারণা কোনো ধর্মীয় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং খবরে আহাদের ভুলের সম্ভাবনার সাথে আয়াতে উল্লিখিত নিন্দনীয় সংশয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু উসূলবিদরা যেহেতু যন্নকে সম্ভাবনার মাঝে সীমিত আর ইলমকে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন; সে কারণে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। খবরে আহাদ অনুযায়ী আমল করা এখন তাদের কাছে নিন্দনীয় অনুমানের অন্তর্ভুক্ত।

অদেখা (গায়েবী) ও দেখা (শাহাদাহ) জগতের দ্বৈততা কালামী দৃঢ় বিশ্বাস আর সম্ভাবনার দ্বৈততা থেকে ভিন্ন। কারণ ইলমকে গায়েবী বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করার অর্থ এর থেকে দৃঢ় বিশ্বাসকে নাকচ করা নয়। ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম তার রবের কাছে চেয়েছিলেন যেন তিনি তাকে দেখিয়ে দেন কীভাবে মৃতকে জীবিত করবেন। তিনি নিঃসন্দেহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই গায়েবী (অদেখা) বিষয়ের চাইতে প্রত্যক্ষ করা বিষয় মানুষের মনে বেশি প্রভাব ফেলে। আমরা 'যন্ন' শব্দকে আরবী ভাষায় দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখেছি। 'ইয়াকীন তথা দৃঢ় বিশ্বাস অর্থে 'যন্ন' শব্দের ব্যবহার আরবী কবিতা ও কথাবার্তায় অসংখ্য।'[৩৩৪] বর্ণনার উপর এটা প্রয়োগ করলে আমরা দেখি একজন বর্ণনাকারী আমাদের কাছে অদেখা (গায়েবী) জ্ঞান বর্ণনা করেন। কারণ আমরা সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি। কিন্তু যে আরবী ভাষা অনুযায়ী ওহী নাযিল হয়েছে সেই আরবী ভাষা অনুযায়ী ঐ বর্ণনা অনুসন্ধান করা এবং বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে অন্যান্য বর্ণনার সাথে তুলনা করতে কোনো বাধা নেই; যাতে করে প্রত্যক্ষ করা বিষয়ের পর্যায়ে পৌঁছানো যায়। গবেষণা চালানোর

৩৩৪. প্রাগুক্ত (১/১৯)।

পর উক্ত বর্ণনাকে 'স্বাভাবিক দৃঢ় বিশ্বাসের' ফায়দা দেয় এমনটা বলা ভুল হবে না। কিন্তু কালামী দ্বৈততা (ইলম ও যন্ন) অনুযায়ী সবসময় দৃঢ় বিশ্বাস ও সম্ভাবনার মাঝে একটা স্তরগত (categorically) পার্থক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী তার যুগের কালামবিদদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা-অদেখা (গায়েব-শাহাদাহ) বিষয়ের দ্বৈততা মেনে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রথম যুগের মুহাদ্দিসরাও এটা মেনে নিয়েছেন। কারণ তারা কালামী পরিভাষা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। আহলুল হাদীসের ভাষার শেকড় ছিল প্রকৃত আরবদের ভাষায়। বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত ইলম বা জ্ঞানকে শাফেয়ী দুই ভাগে ভাগ করেছেন: (১) যাহের-বাত্বেনের (প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য) ব্যাপারে অর্জিত জ্ঞান, (২) যাহেরের (প্রকাশ্য) ব্যাপারে সত্যতা লাভের জ্ঞান। এই প্রকার ইলমের বিবরণ দিতে গিয়ে শাফেয়ীর কথা আপনি প্রত্যক্ষ করুন। তিনি 'যন্ন' ব্যবহার করেননি কেননা এটা বহু অর্থ প্রদান করে। এটাও লক্ষণীয় যে, শাফেয়ী 'সম্ভাবনা' ও 'দৃঢ় বিশ্বাসের' জায়গা থেকে কখনো খবরে আহাদের আলোচনা করেননি। অর্থাৎ এই বর্ণনার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার দিকটা তার কাছে আলোচ্য ছিল না, যেমনটা ছিল কালামবিদদের প্রকরণে। কিন্তু তিনি আকীদার ব্যবহারিক ফলাফল অনুযায়ী এটার খোঁজ করতেন। যেহেতু বিষয়টাতে গায়েবী (প্রত্যক্ষ নয়, বরং পরোক্ষ) বর্ণনাকারীদের ভুলের সম্ভাবনা ছিল, তাই শাফেয়ী খবরে আহাদ অস্বীকারকারী বা খবরে আহাদের হুকুমে পড়ে এমন ফিকহী বিধান অস্বীকারকারীকে কাফের বলেননি। কিন্তু তার দায়িত্ব বলে দিয়েছেন 'যে বিষয়ে সংশয়ে পড়েছে, সেটার ইলম তাকে অন্বেষণ করতে হবে।'[৩৩৫] গায়েবী (বিষয় বর্ণনার) ভুলের সম্ভাবনা যত কমবে, বর্ণনাটা ততই প্রত্যক্ষ (শাহাদাহ) হওয়ার পর্যায়ে উঠে আসবে। এক পর্যায়ে বর্ণনাটা চলে আসবে এমন বর্ণনার স্তরে যেটা বহু মানুষ থেকে বহু মানুষ বর্ণনা করেছে। যেমন: সালাতের রাকাত সংখ্যা বা অকাট্য অর্থ প্রদানকারী শরয়ী বক্তব্যসমূহ। 'এই দুটি পদ্ধতির মাধ্যমেই হালাল কোনো বিষয়কে হালাল আর হারাম কোনো বিষয়কে হারাম বলা যাবে। এটা আমাদের জন্য না জানা বা এতে সংশয় পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই।' শাফেয়ী স্পষ্ট বলেন যে, প্রত্যেকটি বর্ণনার ভুলের সম্ভাবনার স্তর এক নয়। তার ভাষ্য অনুযায়ী, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা দুই ধরনের। একটা বর্ণনা

৩৩৫. আর-রিসালাহ (৪১৯)।

বহু মানুষ থেকে বহু মানুষের মাধ্যম হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত। এই বর্ণনায় সে সকল বিষয় থাকে যেগুলো বান্দাদের জন্য কথায়-কাজে মানা আবশ্যক, যেগুলোর জন্য প্রয়োজনে তাদের জান-মাল ব্যয় করতে হবে। এমন বর্ণনা না জানা সমীচীন নয়। এর ব্যাপারে আলেম ও আমজনতা সমান। কারণ এটা জানা সবার দায়িত্ব। এর উদাহরণ হলো সালাতের সংখ্যা, রমাদানের সাওম, অশ্লীলতা হারাম হওয়া, বান্দার সম্পদে আল্লাহর হক থাকা। দ্বিতীয় প্রকার খবর হলো নির্দিষ্ট কিছু মানুষ থেকে নির্দিষ্ট কিছু বিধানের বর্ণনা যার দায়িত্ব জনগণের উপর নেই। প্রথমটা যত পরিমাণে এসেছে, দ্বিতীয়টার অধিকাংশই সেভাবে আসেনি।"[৩৩৬]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, খবরে আহাদের মাঝে কিছু আছে যেগুলো বহু মানুষ থেকে বহু মানুষের বর্ণনা। অর্থাৎ খবরে আহাদের মাঝে কিছু বর্ণনা প্রত্যক্ষ করা বিষয়ের সমান। কারণ সেটাতে ভুলের স্তর নিচে। আর এই ধরনের খবর তথা বর্ণনার ব্যাপারে শাফেয়ীর অবস্থান নিয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন। তবে এখানে আমার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তিনি মনে করেন, বাহ্যিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা দেয় এমন কিছু খবরে আহাদ প্রত্যক্ষ করা বিষয়ের স্তরে পৌঁছতে সক্ষম। তিনি নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, কিছু বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা প্রত্যক্ষ বর্ণনার হুকুমে পড়ে। তাকে আবু বকর আল-মারওয়াযী বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহকে বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুকের স্ত্রী অমুক, যদিও আমি তার বিবাহে উপস্থিত ছিলাম না। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যদি কোনো বিষয় প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে সেটার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।' এরপর আবু বকর বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'তোমার কথাটা ঐ মানুষের কথার মতো, যে বলে ফাতেমা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে। তবে আমি সাক্ষ্য দিই না যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে (কারণ আমি দেখিনি)।"[৩৩৭] জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবীর ব্যাপারে তার সাক্ষ্যকে আমরা এভাবেই বুঝব। তাদের ব্যাপারে যারা বলে 'আমরা জানি কিন্তু সাক্ষ্য দিই না' বলে, তাদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। এগুলো আহলুল হাদীসের স্বীকৃত প্রসিদ্ধ কিছু বর্ণনা। 'নির্দিষ্ট কিছু মানুষ থেকে এই বর্ণনা মুতাওয়াতির, তারা হলেন

৩৩৬. ইখতিলাফুল হাদীস (আল-উম্ম এর অন্তর্ভুক্ত) (৮/৫৮৮)।
৩৩৭. আবু বকর আল-খাল্লালের আস-সুন্নাহ (২/৩৫৭)।

ইলমুল হাদীসে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ।'[৩৩৮] তাহলে খবরে আহাদের মাঝে যেগুলো প্রসিদ্ধ নয়, সেগুলোর ব্যাপারে কী অভিমত? আবু বকর আল-আসরাম বলেন, ইমাম আহমদ বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে যদি কোনো হাদীস আসে, যেখানে কোনো বিধান বা ফরয বর্ণিত আছে, আমি সেই বিধান বা ফরযের উপর আমল করি আর আল্লাহর দিকে সেটাকে ন্যস্ত করি। তবে সাক্ষ্য দিই না যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন।'[৩৩৯] উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলব, এই বর্ণনা থেকে (যেটা দিয়ে দলীল দেওয়া হয় ইমাম আহমদ মনে করতেন খবরে আহাদ জ্ঞানের ফায়দা দয় না) এটা বোঝা যায় না যে, তিনি খবরে আহাদের মাধ্যমে জ্ঞান প্রাপ্তি নাকচ করেছেন বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কাছে খবরে আহাদ দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দিতে সক্ষম নয়। বরং সঠিক মত হলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রতিটি বস্তুকে যথাস্থানে রাখা। কারণ এটা বলা সম্ভব নয় যে, কিতাবুল্লাহর অকাট্য বিধান এবং সুন্নাহর মাঝে যেগুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য আছে আর যেগুলো প্রসিদ্ধ— এ সব কিছু একটি সহীহ বর্ণনার সমান স্তরে। প্রমাণিত হওয়ার দিক থেকেও একই স্তরে বলা ঠিক হবে না। **কেননা কিতাবুল্লাহর অকাট্য বিধান, সুন্নাহর মাঝে যেগুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য আছে ও যেগুলো প্রসিদ্ধ— এ সবই প্রত্যক্ষ করার স্তরের জ্ঞান। এগুলোর বিপরীতে রয়েছে এমন সহীহ বর্ণনা যা প্রসিদ্ধি অর্জন করেনি। ভুলের গায়েবী সম্ভাবনা মানুষের স্বভাবে বিদ্যমান, কিন্তু সেটা বিশেষজ্ঞের কাছে বর্ণনা থেকে জ্ঞান প্রাপ্তি যা বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হওয়াকে প্রভাবিত করবে না।**[৩৪০]

---

৩৩৮. মাজমুউল ফাতাওয়া (১৮/৬৯)।

৩৩৯. কাযী আবু ইয়া'লার 'আল-উদ্দাহ' (৩/৮৯৮)।

৩৪০. এই বুঝটা জোনাথন ব্রাউনের বুঝের তুলনায় সঠিক, যে মনে করে ইমাম আহমদ খবরে আহাদকে প্রত্যক্ষ বর্ণনার স্তরে না দেখার কারণ হচ্ছে বর্ণনাকারীরা সাধারণত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা পরিবর্তন করে ফেলে। তাই ইমাম আহমদ অকাট্যভাবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হাদীস নিসবত করেননি। ব্রাউনের এই বুঝ আমার মতে সঠিক নয়। তবে তিনি এটাও বলেন যে, সাক্ষ্য প্রদান না করার সাথে ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতার সম্পর্ক নেই। তার মতামত জানতে পড়ুন, Jonathan Brown, "Did the Prophet Say it Or Not?: Literal, Historical and Effective Truth

সবশেষে বলব, আমাদের কথায় কেউ এ কারণে আপত্তি তুলতে পারে যে, খবরে আহাদ কীসের ফায়দা দেয় সেটাকে এক পাশে রেখে যদি কালামবিদরা খবরে ওয়াহেদ অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক বলে আর ইমাম শাফেয়ীও খবরে ওয়াহেদে ভুলের সম্ভাবনা স্বীকার করেন, তাহলে আপনারা কেন এটা মানতে নারাজ যে, খবরে আহাদ অকাট্যতার ফায়দা দেয় না?

এর উত্তর হলো,

প্রথমত: কুরআনের ব্যবহার মেনে চলা কালামী পরিভাষা মানার চাইতে উত্তম। বিশেষত যদি সেই পরিভাষা ব্যাপক দ্বন্দ্বের কারণ হয় এবং সেই পরিভাষার কারণে উসূলের বইয়ে অস্পষ্টতা দেখা দেয়। বেশির ভাগ উসূলবিদ ইলম দ্বারা কী উদ্দেশ্য সেটা স্পষ্ট করে বলেন না। তাই আপনারা দেখবেন একই মানুষের ব্যাপারে কেউ বলছে যে, তিনি মনে করেন খবর জ্ঞানের ফায়দা দেয়, আর কেউ বলছে তিনি মনে করেন খবর জ্ঞানের ফায়দা দেয় না।

দ্বিতীয়ত: কালামী পরিভাষা জ্ঞানের ভুল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত (তৃতীয় অধ্যায় পড়ুন)।

তৃতীয়ত: কালামী পরিভাষা নিছক পরিভাষা নয়, বরং এটা বর্ণনার ব্যাপারে দার্শনিক তত্ত্বীয় অবস্থান। কালামবিদরা বর্ণনাকারী নয়। তত্ত্ব প্রদান (যদি প্রায়োগিক তথা ফিকহী প্রয়োজনের খাতিরে করতেই হয়) অবশ্যই মুহাদ্দিস ও বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে আসতে হবে, কালামবিদদের থেকে নয়। আর আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইতিহাসের দার্শনিকরা পেশাগত ইতিহাসচর্চার ধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

---

in the Sunni Hadith Tradition," Journal of the American Oreintal Sociery 129, no. 2.

আমাদের বইসমূহ

১.	জান্নাতের নি'আমত ও তা লাভের উপায়	৯৬	৯০
২.	পাপ মার্জনার যত পথ	৫৬	৭৫
৩.	বিনা ফাতিহায় জানাযা!	৩২	৪০
৪.	বিদ'আতী ইমামের পেছনে সলাত	৮০	৬০
৫.	বয়স বৃদ্ধির উপায়	১২৮	১৩০
৬.	তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত	৪৮	২৫
৭.	সলাতুন নাবী ﷺ	৬০৮	৬৩৫
৮.	সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম	৭২	৭০
৯.	বিদআতের ভয়াবহতা	৭২	৭০
১০.	সুল্লামুল কুরআন (তাজবীদ শিক্ষা)	১৮	৩০
১১.	ইমাম মাহদীর আগমন	৭২	৭০
১২.	ফেরেশতার দোআয় ধন্য যারা	৪০	৩০
১৩.	বিনম্র সলাতের মূলমন্ত্র (খুশু-খুযুর ৩৩ উপায়)	৯৬	১৩০
১৪.	পাঠক শিশু গড়তে হলে	১২০	১৬০
১৫.	হতে চাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা	৪৮	৬০
১৬.	যে দু'আ কবুল হবেই	৪৮	৭৫
১৭.	সালফে সালেহীনের মানহাজ ও মুসলিম উম্মাহর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা	৪০	৩৫
১৮.	মহিলাদের মসজিদ গমন	৬৪	৭৫
১৯.	ফিতরা: টাকা, নাকি খাদ্যদ্রব্য?	৯৬	১০৫
২০.	সলাতে হাত বাঁধার স্থান	৩২০	৩৪০
২১.	ইতিহাসের কাঠগড়ায় আহলে হাদীস	২০৮	২৭৫

	বই	পৃষ্ঠা	মূল্য
২২.	তাওহীদুল ইবাদাহ: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ	৪৬৪	৫১০
২৩.	তাওফীকুল বারী	১২৮	১৮০
২৪.	উসূলে হাদীস ও মুদাল্লিস রাবীর 'আন' সম্বলিত বর্ণনার হুকুম	৯৬	১২০
২৫.	বরকতময় শ্রেষ্ঠ আমল (পকেট সাইজ)	১১২	৪৫
২৬.	আনওয়ারে মাসাবীহ রাকআতে তারাবীহ	৩৫২	৪৪০
২৭.	মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ব্যাখ্যা	১২৮	১০৫
২৮.	কুরআন খানী ও ঈসালে সওয়াব	১২৮	১০৫
২৯.	রাসূল ﷺ-এর বহুবিবাহ: আপত্তি ও তার জবাব	৮০	৭৫
৩০.	শিয়াদের আসল চেহারা	৩২	৩৬
৩১.	পরিবারের অভিভাবকত্ব	৬৪	১০০
৩২.	তাকলীদ বিভ্রান্তি নিরসন	১৭৬	২৩০
৩৩.	আহলে হাদীস হানাফী দ্বন্দ্ব ও নিরসন	২২৪	২৯০
৩৪.	মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয় ও বর্জনীয়	৯৬	১৩০
৩৫.	সালাফদের দৃষ্টিতে রফ'উল ইয়াদাইন কি মানসুখ?	১৯২	২৫০
৩৬.	অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসূল ﷺ	২৫৬	৪৫৫
৩৭.	ইমাম আবু হানীফা ؒ [ব্যক্তিত্ব ও মাযহাব]	৩৬৮	৫৭৫
৩৮.	দাড়ি: বিধান ও মাসায়েল	৬৪	৮০
৩৯.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে কুরআন শিখি	১১২	২০০
৪০.	খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য বড়দিনের উপহার (দাওয়াহ ভার্সন)	৪৩২	৪০০
৪১.	তাওহীদ বনাম শির্ক ও সুন্নাত বনাম বিদআত	৮০	১০০
৪২.	যুক্তির নিরিখে সুন্নাহর প্রামাণ্যতা	১৮৪	২৪১
৪৩.	তিন ভাষায় বাক্যাংশ ও বাক্য গঠন	৫৫২	৮৮০
৪৪.	সিয়াম ও রমযান: করণীয় ও বর্জণীয়	৬	৫

موثوقية السُّنة عقلاً

حجية النقل الشفوي فلسفيا وأنثروبولوجيا

رضا زيدان

الترجمة

عبدالله محمو عمدار

المراجعة

الأستاذ الدكتور أبو بكر محمد زكريا

(بكالوريوس في الشريعة وماجستير ودكتوراه في العقيدة
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)
قسم الفقه والدراسات القانونية
الجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلادش

Juktir Nirikhe
Sunnahor
রিদা যাইদান
361407#958260-1
ROK-STK

978-984-35-5309-6

প্রকাশনায়

দারুল কারার
পাবলিকেশন্স

কমিউনিটি
ওয়েলফেয়ার
ইনিশিয়েটিভ